~ www.amarboi.com ~

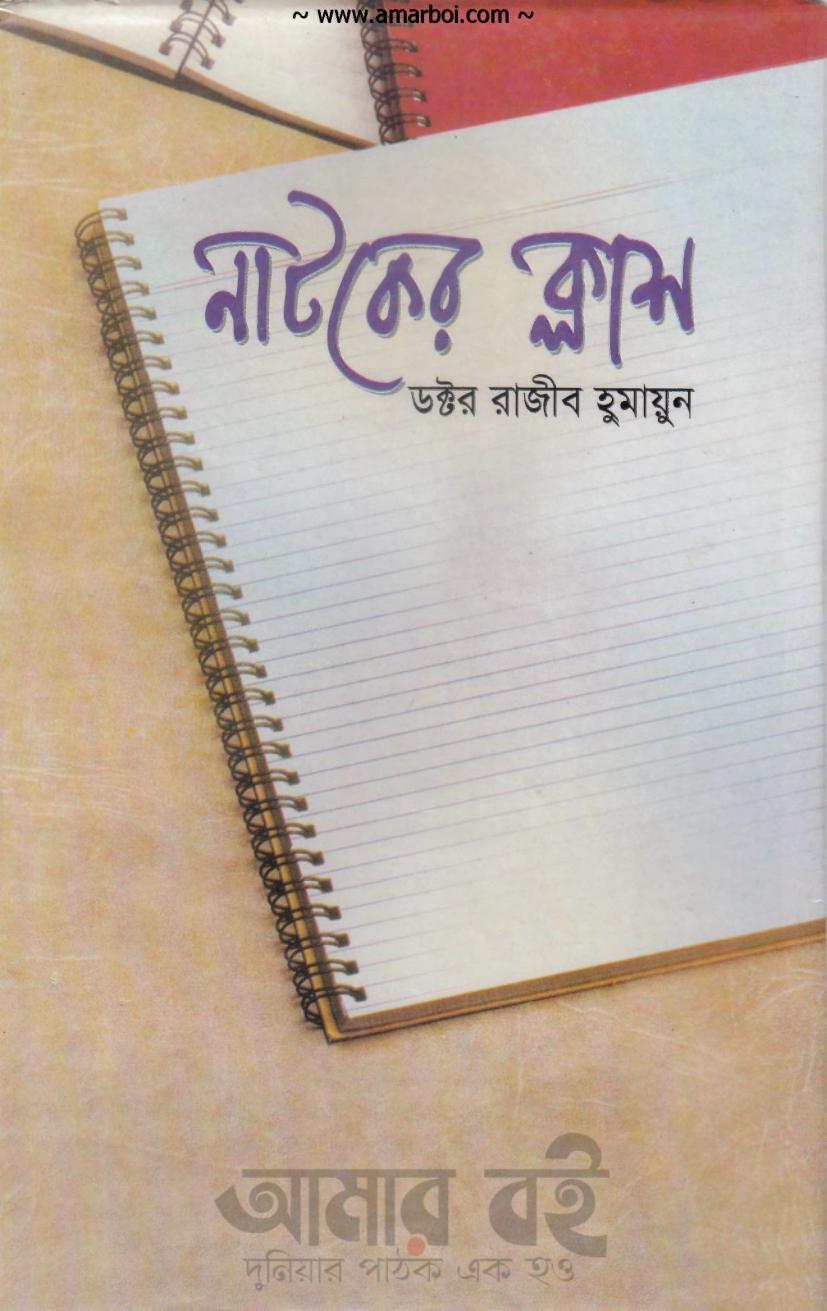

নাটকের ক্লাস

ডক্টর রাজীব হুমায়ুন

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

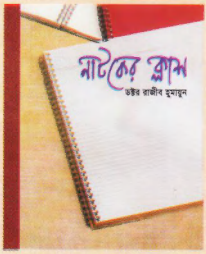

লিখতে হলে শিখতে হয়। নাটক লিখতে হলে শিখতে হবে নাটক লেখার নিয়মাবলী-কলা-কৌশলসমূহ। দ্বন্দ্ব, সংলাপ, প্লট, উৎকণ্ঠা, অ্যাকশন, অঙ্ক, দৃশ্য, চরিত্র, প্রারম্ভ, প্রবাহ, ক্লাইম্যাক্স ইত্যাদি পরিভাষার সাথে প্রাথমিক পরিচিতি নাটক রচনায় সহায়ক হতে পারে। সোফোক্লিস, শেক্সপীয়ার, ইবসেন, রবীন্দ্রনাথ অথবা মহান নাট্যকারদের শিখতে হয়েছে সংলাপ রচনার কলা-কৌশল, চরিত্রাঙ্কন পদ্ধতি অথবা অঙ্ক-দৃশ্য পরিকল্পনার নিয়মাবলী। শিখতে হয়েছে রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজতত্ত্ব, মনস্তত্ত্ব এবং আরো অনেক কিছু। সচেতন অথবা প্রত্যক্ষভাবে না শিখলেও পরোক্ষভাবে তাঁরা কলা-কৌশলসমূহ শিখেছেন, অনুধাবন করেছেন।

বিশিষ্ট টিভি-নাট্যকার ডক্টর রাজীব হুমায়ুনের এ গ্রন্থে উপস্থাপিত হয়েছে কথকতার ঢঙে নাটক লেখার কলা-কৌশল সমূহ। বিশ্লেষিত হয়েছে সোফোক্লিস, শেক্সপীয়ার, রবীন্দ্রনাথ এবং সৈয়দ শামসুল হক-এর কলাকৌশল। অন্তর্ভুক্ত হয়েছে সৈয়দ শামসুল হক, মমতাজউদ্দীন আহমদ, আবদুল্লাহ আল মামুন, মামুনুর রশীদ, সেলিম আল দীন এবং লিয়াকত আলী লাকীর দুর্লভ নাট্যভাবনাসমূহ। তাঁরা কথা বলেছেন, তাঁদের নাট্যকৌশল নিয়ে। মৌলিক বক্তব্য উপস্থাপন করেছেন, বাংলাদেশের নিজস্ব নাট্যাঙ্গিক বিষয়ে। ছয়জন নাট্যব্যক্তিত্বের শিকড়সন্ধানী কথোপকথন আপনার নাট্যচিন্তাকে নিঃসন্দেহে সমৃদ্ধ করবে।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

ডক্টর রাজীব হুমায়ুন

মহাপ্রস্থান (১৯৮৪), *নীলপানিয়া* (১৯৮৬) *মাগো তুমি কেমন আছো* (১৯৯৯) *ব্রীফকেস, একটি পরিবারের গল্প, লাঙক দোলা* ইত্যাদি টিভি নাটকের নাট্যকার। একমাত্র মঞ্চনাটক *নীলপানিয়া* গ্রন্থাকারে প্রকাশিত। বাংলাদেশ টেলিভিশনের *বাঁধনহারা* ও *ভালোবাসো মোর গান* শীর্ষক ধারাবাহিক ম্যাগাজিন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে নজরুল-গবেষক হিসেবে ব্যাপক পরিচিতি রয়েছে তাঁর। একাধারে নাট্যকার, নজরুল-গবেষক, সমাজভাষাবিজ্ঞানী ও বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক। তাঁর উল্লেখযোগ্য প্রকাশনাসমূহ *নজরুল ও বিশ্বসংস্কৃতি, নজরুল ইসলাম ও বাংলাদেশের সাহিত্য, নজরুলের লেখার কৌশল শেখার কৌশল*, আবুল মনসুর আহমদের *ব্যঙ্গরচনা ও সংস্কৃতি চিন্তা, সমাজভাষাবিজ্ঞান, সন্দ্বীপের ইতিহাস : সমাজ ও সংস্কৃতি, নীলপানিয়া, Bangla Academy English-Bengali Dictionary* (অন্যতম সঙ্কলক)। ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা উপন্যাস-সৃষ্টি।
জন্মস্থান : সন্দ্বীপ (১৯ নভেম্বর ১৯৫০)।
পিতা : বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ মৌলভী সৈয়দ আহমদ (মরহুম)।
মা : আজমতেন্নেসা বেগম (মরহুম)।

প্রচ্ছদ
মাসুদ কবির

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

নাটকের ক্লাশ

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

নাটকের ক্লাশ

ডক্টর রাজীব হুমায়ুন

সূচীপত্র
ঢাকা, বাংলাদেশ

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

সূচীপত্র

প্রকাশক ›› সাঈদ বারী
প্রধান নির্বাহী, সূচীপত্র
৩৮/২ক বাংলাবাজার ঢাকা ১১০০
ফোন ৭১১-৩৮৭১, ৮১১-০৬৮০

নাটকের ক্লাশ
ডক্টর রাজীব হুমায়ুন

প্রথম সূচীপত্র সংস্করণ ›› ফেব্রুয়ারি ২০০৫
স্বত্ব ›› লেখক
প্রচ্ছদ ›› মাসুদ কবির
কম্পোজ ›› কম্পিউটার গ্যালাক্সী
মুদ্রণ ›› সালমানী প্রিন্টিং প্রেস নয়াবাজার ঢাকা

উত্তর আমেরিকায় পরিবেশক ›› মুক্তধারা
জ্যাকসন হাইট, নিউইয়র্ক, যুক্তরাষ্ট্র
যুক্তরাজ্যে পরিবেশক ›› সঙ্গীতা লিমিটেড
২২ ব্রিক লেন, লন্ডন, যুক্তরাজ্য

Natoker Class by Dr. Rajib Humayun
Published by Saeed Bari, *Chief Executive*, Sucheepatra.
38/2 Ka Banglabazar, Dhaka 1100, Bangladesh.
Tel : 711-3871 e-mail : saeedbari@dhaka.net.
Price : BDT. 125.00 only. US$ 5.00

মূল্য ›› ৳ ১২৫.০০ মাত্র

ISBN 984-8557-11

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

উৎসর্গ

অধ্যাপক জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী

পরম শ্রদ্ধাস্পদেষু

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

বই নিয়ে কথা

নাটকের ক্লাশ গ্রন্থে আমাদের উদ্দেশ্য, নাটক রচনার প্রাথমিক কলা-কৌশল সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি করা। শিল্পসচেতন নবীন নাট্যকার নিজের সৃজন-ক্ষমতায় সফল নাট্যকারে পরিণত হবেন এবং নতুন নতুন পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাবেন এই আমাদের কামনা।

সোফোক্লিসের *ইডিপাস*, শেক্সপিয়ারের *ম্যাকবেথ*, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের *বিসর্জন* এবং সৈয়দ শামসুল হকের *যুদ্ধ এবং যুদ্ধ* নাটকসমূহ এ গ্রন্থে বারবার ব্যবহৃত হয়েছে। নাটকসমূহ পড়ে নিলে নাটক *নাটকের ক্লাশ* বুঝতে সুবিধে হবে।

বাংলাদেশ টেলিভিশন, বাংলাদেশ বেতার, মঞ্চ ইত্যাদি মাধ্যমের জন্য নাটক লিখতে গিয়ে আমি নাটক লেখার কলা-কৌশল নিয়ে ভেবেছি এবং প্রাসঙ্গিক গ্রন্থাবলি পড়েছি। বর্তমান গ্রন্থটিকে আমার ব্যক্তিগত অধ্যয়ন, অভিজ্ঞতা এবং অনুভবের ফসল বলা যেতে পারে।

পরিশিষ্ট অংশে বাংলাদেশের পাঁচজন নাট্যকার—সৈয়দ শামসুল হক, মমতাজউদ্দীন আহমদ, আবদুল্লাহ আল মামুন, মামুনুর রশীদ এবং সেলিম আল দীন-এর নাটক লেখার কলা-কৌশলকেন্দ্রিক কিছু কথা সংযোজিত হয়েছে।

বাংলাদেশ গ্রুপ থিয়েটার ফেডারেশন-এর বর্তমান সেক্রেটারী জেনারেল, অভিনেতা-নির্দেশক লিয়াকত আলী লাকী মূলত নির্দেশক-এর দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যতিক্রমী বক্তব্য উপস্থাপন করেছেন। নাট্যজনদের সুচিন্তিত বক্তব্য ও নাট্য ভাবনাসমূহ নবীন নাট্যকারদের অনুপ্রাণিত করবে বাংলাদেশের নাট্যাঙ্গিক নিয়ে ভাবতে। শিকড়সন্ধানী নাট্যকারবৃন্দ, শ্রেষ্ঠ নাট্যজনদের অভিজ্ঞতাপ্রসূত সুগভীর ও দুর্লভ আলোচনা থেকে অবশ্যই নতুন পথের সন্ধান পাবেন।

নাটক রচনা : রূপ ও রীতি শিরোনামে এ-গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছিল বাংলা একাডেমী থেকে। *নাটক লেখার কলা-কৌশল* শিরোনামে 'দিব্যপ্রকাশ' থেকে প্রকাশিত হয়েছিল দ্বিতীয় সংস্করণ। পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত নতুন সংস্করণ প্রকাশে এগিয়ে এলেন 'সূচীপত্র'-এর *প্রধান নির্বাহী* জনাব সাঈদ বারী। বাংলাদেশের নাট্যজন এবং সূচীপত্রের কাছে গ্রন্থটির নতুন সংস্করণের জন্য আমি কৃতজ্ঞ।

ডক্টর রাজীব হুমায়ুন

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

বিষয়সূচি

সৃজনশীল শিল্পকর্ম : পরিকল্পনা ও প্রস্তুতি প্রসঙ্গ	১১
নাটক লেখার কলা-কৌশল	১৫
বিষয়	১৫
সমস্যা	১৬
বক্তব্য	১৮
প্লট / বৃত্ত	২০
দ্বন্দ্ব	২৩
চরিত্র / চরিত্রসৃষ্টি	২৬
এ্যাকশন / নাট্যক্রিয়া	৩১
সাসপেন্স / টেনশন / উৎকণ্ঠা	৩৪
দৃশ্য-পরিকল্পনা : কয়েকটি কৌশল	৩৫
সংলাপ	৪০
নাটকের পরিভাষা	৫৩
সহায়ক গ্রন্থাবলি	৬৪

পরিশিষ্ট	৬৫
নাটকের করণকৌশল : পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায় ॥ সৈয়দ শামসুল হক	৬৭
আমার নাট্যভাবনা ॥ মমতাজউদ্দীন আহমদ	৭৪
নাটকের আমি ॥ আবদুল্লাহ আল মামুন	৮৭
আমার নাটকের কথা ॥ মামুনুর রশীদ	৯১
কথানাট্য, কথাগুচ্ছ ॥ সেলিম আল দীন	৯৬
নাটক লিখতে হলে ॥ লিয়াকত আলী লাকী	১১১

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

সৃজনশীল শিল্পকর্ম : পরিকল্পনা ও প্রস্তুতি প্রসঙ্গ

সকল মহান শিল্পীর শিল্পকর্ম মাত্রই পরিকল্পিত। সাহিত্য, সঙ্গীত, চিত্রকলা, চলচ্চিত্র ইত্যাকার সকল শিল্পমাধ্যমের নিদর্শনসমূহ সচেতন পরিকল্পনার সফল। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'পোস্টমাস্টার' গল্পের শেষের দিকের 'শ্মশান' প্রসঙ্গ অথবা সত্যজিৎ রায়-সৃষ্ট 'পথের পাঁচালী'র একাধিক দাঁত মাজার দৃশ্য হঠাৎ ক'রে আসে নি। বর্ষা-বিস্ফারিত নদীতে পোস্টমাস্টার যখন ভাবছিল, রতনের কাছে ফিরে যাবে কি যাবে না; এমন সময় রবীন্দ্রনাথের বর্ণনা 'গ্রাম অতিক্রম করিয়া নদীকূলের শ্মশান দেখা দিয়াছে'। এ বর্ণনা কি পরিকল্পিত? অবশ্যই। নদীকূলে বরযাত্রীও দেখা যেতে পারত। তাহলে 'শ্মশান' কেন? কারণ আর কিছুই নয়। সচেতন রবীন্দ্রনাথ তখন জীবনকে দেখছিলেন দ্বিধাদীর্ণ পোস্টমাস্টারের দৃষ্টিকোণ থেকে। সে একবার ভাবছিল, 'ফিরিয়া যাই, জগতের ক্রোড়বিচ্যুত সেই অনাথিনীকে সঙ্গে করিয়া লইয়া আসি।" কিন্তু পোস্টমাস্টারের মানসিকতা বেশি কাজ করছিল, রতনকে ছেড়ে যাওয়ার পক্ষে। সে তার চিন্তার পক্ষে সমর্থন খুঁজছিল। এমন সময় দেখতে পেল 'শ্মশান' এবং তার প্রতিক্রিয়া 'জীবনে এমন কত বিচ্ছেদ, কত মৃত্যু আছে, ফিরিয়া ফল কী! পৃথিবীতে কে কাহার?' নদীকূলে বরযাত্রী দেখা যেতে পারত কি? পারত, যদি রবীন্দ্রনাথ চাইতেন, পোস্টমাস্টারের সঙ্গে রতনের মিলন। তবে এ' ক্ষেত্রে হয়তো গল্পের মূল কাঠামোই যেত পাল্টে।

সত্যজিৎ রায়-সৃষ্ট 'পথের পাঁচালী'তে অপুকে দুবার দাঁত মাজতে দেখা যায়। প্রথবার অপু দাঁত মাজছিল দ্রুত আঙুল চালিয়ে; দ্বিতীয়বার অতি ধীরে। এ-দুটো দৃশ্যও পরিকল্পিত। দ্বিতীয়বারের ধীরে দাঁত মাজার দৃশ্য বোন দুর্গার মৃত্যুর পর ব্যথিত অপুর মনোভাব প্রকাশক। প্রথমবারের দাঁত মাজার দৃশ্য কেন? বৈপরীত্যের 'ইফেক্ট' আনবার জন্য। দ্বিতীয়বারের দাঁত মাজার দৃশ্য দেখতে-দেখতে হঠাৎ যদি দর্শকের মানসচোখে ভেসে ওঠে অপুর দাঁত মাজার দৃশ্য— তাহলে দ্বিতীয় দৃশ্যের 'ইফেক্ট' অনেক বেড়ে যায় এবং দর্শক অপুর যন্ত্রণা অনেক বেশি করে অনুভব করতে পারেন। দুর্গার মৃত্যুর পর 'পথের পাঁচালীর' একটি 'শট'-এর বর্ণনা নিম্নরূপ :

> 'মেঘলা দিন। ইন্দির ঠাকরুনের দাওয়া।
> Close Up : উনুনে বসানো হাঁড়িতে ভাত সিদ্ধ হচ্ছে। ফুটন্ত ফ্যান ফুলে ফুলে উঠে প্রায় উপচে পড়ে। হাঁড়ির ঢাক্না ওঠা-নামা করছে।
> Tilt Up : সর্বজয়ার মুখ। ডান হাতে থুৎনিটা ভর করে সে উবু হয়ে বসে আছে। দৃষ্টি শূন্য, নিস্পলক।'

এ'শট-এর সচেতন পরিকল্পনার কথা সত্যজিৎ রায়ের ভাষাতেই শোনা যাক— 'হাঁড়ির ঢাক্নার ওঠা-পড়া, সর্বজয়ার চোখের উদাস দৃষ্টি, এসব কাছ থেকে না দেখালে বোঝানো সম্ভব হবে না মনে ক'রে এখানে Close Up-এর ব্যবহার করা

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

হয়েছিল। তাছাড়া, এর আগের শট-এর খোলা মেঠো দৃশ্যের প্রসারতার পর Close Up-এর এই সঙ্কোচন একই করুণ সুরে ছন্দের বৈচিত্র্য আনতে সাহায্য করিয়াছিল। ...' এই শট-এ ঢাকনি-চাপা ফুটন্ত ভাতের সঙ্গে সর্বজয়ার রুদ্ধ শোকদগ্ধ মনের একটা সহজ উপমা দেবার সুযোগ হয়েছিল।'

ন্যূনতম পরিকল্পনা ব্যতীত সঙ্গীত রচনা সম্ভব নয়। গান লিখতে হলে ছন্দ, উপমা, প্রতীক, চিত্রকল্প ইত্যাদি ছাড়াও স্থায়ী, অন্তরা, সঞ্চারী, আভোগ ইত্যাদি পরিভাষার সাথে পরিচিতি প্রয়োজন। সুরসৃষ্টির জন্য প্রয়োজন তাল, রাগ-রাগিণী সম্পর্কে সুষ্ঠু ধারণা। উঁচু মানের সৃষ্টির জন্য এ পরিকল্পনা আরো বেশি জরুরি। উদাহরণ হিসেবে নেয় যাক একটি রবীন্দ্র-সঙ্গীত—'যখন পড়বে না মোর পায়ের চিহ্ন এই বাটে'। এ গান কি বিদায়ের গান? অভিমানের গান? নাকি চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবার অভিমান থেকে নিবৃত্ত হবার জন্য আপন চিত্তকেই পৌনঃপুনিকভাবে সতর্ক' (সনজীদা খাতুন, রবীন্দ্রসঙ্গীতের ভাবসম্পদ) করার গান? যাই হোক না কেন, বিদায়ী ব্যক্তিটি কিন্তু অত্যন্ত সচেতন। তিনি জানেন, তাঁর বিদায়ের পর তাঁর ব্যবহৃত সামগ্রী অথবা পরিবেশের কোন দাম থাকবে না। ফলে তাঁর চোখের সামনে ভেসে ওঠে এইসব চিত্র; তাঁর তানপুরাটার কেউ যত্ন নেবে না। ফলে ধুলো জমে উঠবে ['জমবে ধুলা তানপুরাটার তারগুলায়']। তাঁর ঘরের দ্বার অপরিচ্ছন্ন থাকবে। ফলে সেখান ঝোপঝাড় অথবা কাঁটালতা বেড়ে উঠবে। [কাঁটালতা—কাঁটালতা উঠবে ঘরের দ্বারগুলায়]। এ'রকম আরো অনেক চিত্র। এখানেই কিন্তু পরিকল্পনার শেষ নয়। এ'গানে একাধিক শব্দ, শব্দসমষ্টি পুনরাবৃত্ত হয়েছে। যেমন, 'আমি বাইব না—আমি বাইব না অথবা 'কাঁটালতা—কাঁটালতা' ইত্যাদি। এ পুনরাবৃত্তি কি পরিকল্পিত? সনজীদা খাতুনের চমৎকার বিশ্লেষণ উদ্ধৃত করা যাক। "পুনরাবৃত্ত কথা লক্ষ্য করলে দেখি—সে-অংশে প্রথমটা আপন মনে কথাটি ব'লে একটু উদাস হবার ভাব—প্রয়োজন অনুসারে সেখানে একটু বিরামের ব্যবস্থাও রয়েছে। দ্বিতীয়বার সুর যেন শ্রোতাকে উদ্দেশ্য ক'রে বিশেষভাবে উচ্চারিত হলো।

... 'আহা' অংশে ঔদাস্যের আবরণে দীর্ঘশ্বাসের ভাব বেশ ফুটেছে—তারপরে শ্রোতাদের উদ্দেশে বক্তব্যটি পুনরায় বলা হচ্ছে। ... 'এই বাটে' কথাটিতে নিকটবর্তী পথের প্রতি নির্দেশের ভাব ফুটিয়ে তুলতে উঁচু সুরের স্পর্শযুক্ত নিচু সুর ধ'রে আবার পূর্বে স্পর্শ ক'রে—আসা সুরে ফিরে যাওয়া হয়েছে—'গ রা-গা' সুর যত নেমে আসে—তত যেন কাছের কাছের দিককে বোঝায়। তই, 'এই বাটে' বলতে সুর 'সা'তে নেমে নৈকট্যের বোধকে প্রতিষ্ঠিত করে"।

শেক্সপিয়ারের ম্যাকবেথ নাটকে রক্তাক্ত হাত ধুয়ে ফেলার প্রসঙ্গ একাধিকবার এসেছে। নাটকের গোড়ার দিকে রাজা ডানকানকে হত্যার পর রক্তাক্ত হাত নিয়ে ম্যাকবেথের অস্বস্তি দেখে লেডি ম্যাকবেথ বলেছিল,

A little water clears us of this deed. How easy is it then!
[সামান্য পানিতেই এ'কাজের চিহ্ন মুছে ফেলা সম্ভব। কত সহজ এ কাজ!

নাটকের শেষ দিকে আবার হাত-ধোয়া প্রসঙ্গ এসেছে। বিধ্বস্ত লেডি ম্যাকবেথের মুখে উচ্চারিত হয় এ সংলাপ,

All the perfumes of Arabia will not sweeten this little hand.
[আরব দেশের সমস্ত সুগন্ধী এ'ছোট হাতের দুর্গন্ধ দূর করতে পারবে না]।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

হাত-ধোয়া প্রসঙ্গের পুনরাবৃত্তি এবং এ' সংলাপসমূহ নিঃসন্দেহে পরিকল্পিত। লেডি ম্যাকবেথের ব্যর্থতা ও হতাশাকে ব্যাপকতা দানের উদ্দেশ্যে, শেক্সপিয়ার নাটকের শুরুতে হাত-ধোয়া প্রসঙ্গটি এনেছিলেন। তিনি জানতেন, আরব দেশের সুগন্ধী সম্পর্কিত সংলাপটি শুনে দর্শকের যদি মনে পড়ে যায়, হাত-ধোয়া সম্পর্কিত প্রথম সংলাপের শব্দাবলি, তাহলে দর্শক আপন মনেই বলে উঠবেন, 'তাইতো লেডী ম্যাকবেথ, এখন তুমি এ'কথা বলছ, অথচ তুমিই বলেছিলে— 'সামান্য পানিতেই... এখন ভোগ ক'রে যাও অপরাধের শাস্তি।'

এস্কাইলাসের নাটকে 'রক্ত', রবীন্দ্র-রচনাবলিতে 'খেলা' এবং সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর উপন্যাসে 'ভয়' শব্দ বারবার ব্যবহৃত হয়েছে। এক হিসেবে দেখা গেছে, রবীন্দ্রনাথের ১৮৭৭টি গানে কমপক্ষে ১৯৩ বার 'খেলা এসেছে (নির্মলেন্দু ভৌমিক, আমার খেলা, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা, পৃ. ২৪)। 'ভয়' এবং 'ভীতি' অনুষঙ্গবাহী শব্দ সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর লালসালু-তে ব্যবহৃত হয়েছে ৭০ বার; চাঁদের অমাবস্যা-য় ১৫০ বার এবং কাঁদো নদী কাঁদো উপন্যাসে ১৭৫ বার (সৈয়দ আকরম হোসেন, বাংলাদেশের সাহিত্য ও অন্যান্য, পৃ. ৪৫)। 'রক্ত', 'খেলা' অথবা 'ভয়' বিভিন্ন লেখকের রচনাবলিতে এসেছে 'মটিফ' হিসেবে। সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর উপন্যাস থেকে সৈয়দ আকরম হোসেন প্রদত্ত উদাহরণ নেয়া যাক :

০১. শক্তিমত্তা নারীর উজ্জ্বল পরিষ্কার চোখে ঘনায়মান ভয়ের ছায়া দেখে মজিদ খুশি হয়। কাজ করতে করতে রহীমা থমকে যায়, কান পেতে শোনে। ...একটি অব্যক্ত ভীতিও ঘনিয়ে আসে মনে। সে খোদাকে ভয় পায়, মাজারকে ভয় পায়, স্বামী মজিদকে ভয় পায় (লালসালু)

০২. কাদের কিছু বলে না কেন? তার মনেও কি একটি নিদারুণ ভয় উপস্থিত হয়েছে? প্রশ্ন করতে যুবক শিক্ষকের মনে যেমন ভয়, প্রশ্ন শুনতেও তার মনে কি তেমনি ভয়? দুজনের মনেই ভয়। তবে একই ভয়; দু-ভয়ের কোন তারতম্য নাই। (চাঁদের অমাবস্যা)

০৩. তবু সবকিছুর মধ্যে কেমন দ্বিধা-সংশয়, কি একটা সদাজাগ্রত ভয়। যেন খোদাকে নয় খোদার সৃষ্টিকে তাদের ভয়, দোজখকে নয় নশ্বর জীবনকে তাদের ভয়, নশ্বর জীবকে ভয় করে তার মনে কি শান্তি থাকা সম্ভব? (কাঁদো নদী কাঁদো)

এবারে সৈয়দ আকরম হোসেনের বিশ্লেষণ শোনা যাক; "উৎকলিত বাক্যপুঞ্জে দৃষ্টিপাত করলেই সুস্পষ্ট হয় 'ভয়' ও ভীতিঅনুষঙ্গধর্মী শব্দপুঞ্জে সংলগ্ন হয়ে আছে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর জীবননীতি ও শিল্পনীতির জটিল অভিপ্রায় এবং ঐ শব্দতরঙ্গবলয়ে কল্লোলিত ও ফেনপুঞ্জিত হয়ে উঠেছে চরিত্রাবলীর অস্তিত্ববোধের অভীপ্সা।"

কবিতা, গান, উপন্যাস, নাটক, চলচ্চিত্র ইত্যাদি যে-কোন শিল্প-মাধ্যমের বিশেষ কিছু কলা-কৌশল রয়েছে। উপমা, প্রতীক, চিত্রকল্প, রূপক, ছন্দ, অঙ্ক, দ্বন্দ্ব, ক্লোজআপ, লংশট ইত্যাকার পরিভাষা এ'কলা-কৌশলের সাথে সম্পর্কিত। উঁচু মানের সৃষ্টির জন্য প্রাসঙ্গিক কলা-কৌশল জ্ঞান আবশ্যিক। প্রতিভা থাকলেই লেখা যায় এবং প্রতিভাবানদের জন্য কলা-কৌশল জ্ঞান অপ্রয়োজনীয়— এ' ধরনের ধারণা ও বিশ্বাস সুবুদ্ধির পরিচায়ক নয়। 'স্বভাব কবি' অথবা সহজাত কবিপ্রতিভার অধিকারী ব'লে

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

পরিচিত কবিয়াল/ লোককবিদেরও গুরুর কাছে শিখতে হয়। স্বপ্নে কবিত্ব লাভের কথা প্রচলিত ছিল ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগ এমন কি বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝিও। স্বপ্নে কবিত্ব লাভের দাবি ভ্রান্ত ধারণাপ্রসূত।

অনেক জনপ্রিয় লেখক কলা-কৌশল জ্ঞানকে অস্বীকার ক'রে সহজাত ক্ষমতার কথা বলেন। এ দাবি অসত্য বলে উড়িয়ে দেয়া অপ্রয়োজনীয়। তবে একথাও সত্য, বিস্তারিত পঠনপাঠন অথবা শ্রবণ-দর্শনের ফলে সচেতন প্রচেষ্টা না থাকলেও বিশেষ শিল্প-মাধ্যমের ছক জনপ্রিয় লেখকের মনে গেঁথে যায়। কবি নজরুল ইসলাম মাধ্যমিক স্কুলের গণ্ডী পার হননি বলে কেউ-কেউ প্রতিভার ওপর অতিমাত্রায় জোর দিতে চান। এঁদের অনেকেই ভুলে যান, নজরুল ইসলাম সমকালের ঠুঙরীসম্রাট ওস্তাদ জমিরুদ্দীনের কাছে সঙ্গীতের পাঠগ্রহণ করেছিলেন। তা ছাড়া, তাঁর 'ব্যথার দান' উপন্যাসের বিভিন্ন অধ্যায়ের শীর্ষে রবীন্দ্রসঙ্গীতের ব্যবহার ও পরবর্তীকালে রচিত প্রবন্ধ 'বর্তমান বিশ্বসাহিত্য' নজরুলের পঠনপাঠন ও প্রস্তুতির পরিচায়ক।

লিখতে হলে শিখতে হয়। নাটক লিখতে হলে শিখতে হবে নাটক লেখার নিয়মাবলি— কলা-কৌশলসমূহ। দ্বন্দ্ব, সংলাপ, প্লট, উৎকণ্ঠা, এ্যাকশন, অঙ্ক, দৃশ্য, প্রারম্ভ, প্রবাহ, ক্লাইম্যাক্স, চরিত্র ইত্যাদি পরিভাষার সাথে প্রাথমিক পরিচিতি নাটক রচনায় সহায়ক হতে পারে। সোফোক্লিস, শেক্সপিয়ার, ইবসেন অথবা রবীন্দ্রনাথের মতো মহান নাট্যকারদের শিখতে হয়েছে সংলাপ রচনার কলা-কৌশল, চরিত্রাঙ্কন পদ্ধতি অথবা অঙ্ক-দৃশ্য পরিকল্পনার নিয়মাবলি। শিখতে হয়েছে রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজতত্ত্ব, মনস্তত্ত্ব এবং আরো অনেক কিছু। অ্যারিস্টটলের 'পোয়েটিকস' পড়ে অথবা বিদ্যালয়ের শ্রেণীকক্ষে তাঁরা হয়তো এ' কৌশলগুলো শেখেন নি। কেউ কেউ শিখেছেন, শ্রেষ্ঠ নাটকসমূহ বারবার পড়ে। আর কেউবা হয়তো শিখেছেন, মহান নাট্যকার অথবা শিক্ষিত নাট্যদলের সাথে যুক্ত থেকে। সচেতন অথবা প্রত্যক্ষভাবে না শিখলেও অন্তত পরোক্ষভাবে তাঁরা কলা-কৌশলগুলো শিখেছেন, অনুধাবন করেছেন। এ'কথা তাঁদের নাটকসমূহ পড়লে সহজেই বোঝা যায়।

কারো কারো হয়তো ধারণা হতে পারে, এ্যাবসার্ড, অভিব্যক্তিবাদী (এক্সপ্রেশনিস্টিক), অস্তিত্ববাদী তথা আধুনিক দর্শনবাহী নাটক রচনার জন্য নাটকের কলা-কৌশলের সাথে পরিচিতি অপ্রয়োজনীয়। আমাদের বিশ্বাস, বাস্তববাদী (রিয়েলিস্টিক), এ্যাবসার্ড অথবা যে-কোন ধরনের নাটক রচনার জন্যই নাটকের প্রাথমিক কলা-কৌশল জানা প্রয়োজন। তত্ত্বের প্রয়োজনে কলা-কৌশল ব্যবহারে ভিন্নতা আসতে পারে শুধু।

কলা-কৌশলের সাথে পরিচিত হলেই কি শিল্প-সৃষ্টি সম্ভব? অস্কার ওয়াইল্ডকে এখানে স্মরণ করা যেতে পারে। তাঁর বক্তব্য— বানাতে জানলে পাঁপড়ি সাজিয়ে প্রাকৃতিক গোলাপের মতো চমৎকার কৃত্রিম গোলাপ বানানো সম্ভব। কিন্তু গোলাপের গন্ধ প্রদান কি সম্ভব? অবশ্যই না। কোন সাহিত্যিক যদি কলা-কৌশলের সাথে পরিচিত হন, তাহলে তিনি সাহিত্যের বাগানে কৃত্রিম গোলাপ ফোটাতে পারবেন; কিন্তু গন্ধ দিতে হলে চাই সহজাত সৃজন-ক্ষমতা। পক্ষান্তরে আমাদের বক্তব্য, সহজাত সৃজন-ক্ষমতা থাকলেই কেউ মহৎশিল্পী হয়ে 'গন্ধ' ছড়াতে পারেন না। এর জন্য প্রয়োজন শিল্প-সচেতনতা, কলা-কৌশলের সাথে পরিচিতি, জীবন সম্পর্কে গভীর ব্যাপক অভিজ্ঞতা— সর্বোপরি নিরন্ত

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

নাটক লেখার কলা-কৌশল

আপনি একটি নাটক লিখতে চান। দীর্ঘদিনের পরিকল্পনা নিন, আপনি যদি ভালো নাট্যকার হতে চান। কীভাবে অগ্রসর হবেন? ধরা যাক, আপনি শুনেছেন— নাটক হচ্ছে, জীবনের বিচিত্র দ্বন্দ্ব-সংঘাতের শিল্পরূপ। শুনেছেন, নাটক মূলত সংলাপ ও অভিনয়-নির্ভর শিল্প-মাধ্যম। নাটক লিখতে হলে, আপনাকে ভাবতে হবে জীবনের বিচিত্র দ্বন্দ্ব-সংঘাত নিয়ে; ভাবতে হবে নাটকের সংলাপ, প্লট, এ্যাকশন, সাসপেন্স নিয়ে; ভাবতে হবে বিষয় ও বক্তব্য নিয়ে।

০১. বিষয়

আপনি যদি বাংলাদেশের নাগরিক হন, ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধের ওপর একটি নাটক লেখার কথা ভাবতে পারেন। ভাবতে পারেন, ঝড়-জলোচ্ছ্বাস, নদী-ভাঙন, জেলে, বাওয়ালী তথা যে-কোন শ্রমজীবী মানুষের জীবন-সংগ্রাম, ব্যক্তিপ্রেম, সামরিক শাসন ইত্যাকার হাজারো বিষয়।

যে বিষয়েই নাটক লিখুন না কেন, বিষয়টি সম্পর্কে আপনাকে সুস্পষ্ট ধারণা অর্জন করতে হবে। ধারণা অর্জন সম্ভব, সংশ্লিষ্ট বিষয়ে পড়াশোনা, যোগাযোগ, ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ইত্যাদির মাধ্যমে। ধরা যাক, আপনার নাটকের বিষয় 'বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ'। আপনাকে পড়তে হবে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক প্রামাণ্য গ্রন্থাবলি, মুক্তিযোদ্ধাদের জীবনী। সম্ভব হলে গ্রহণ করতে হবে একাধিক মুক্তিযোদ্ধার সাক্ষাৎকার— শুনতে হবে একাত্তরের রণাঙ্গনের রক্তাক্ত কাহিনী। শুধু একাত্তর সালে সীমাবদ্ধ থাকলে চলবে না। আপনাকে জানতে ও বুঝতে হবে ১৯৪৮ ও ৫২-এর ভাষা-বিতর্ক ও ভাষা-আন্দোলন; ৫৪-র নির্বাচন ও যুক্তফ্রন্টের ভূমিকা; ৫৮ সালের সামরিক শাসন; ৬২ ও ৬৬-র রাজনৈতিক আন্দোলন এবং ৬৯-এর গণঅভ্যুত্থান। সম্ভব হলে, আরো পিছিয়ে জানতে হবে, গ্রেটার বেঙ্গল আন্দোলন; ৪০-এর লাহোর প্রস্তাব, এমন কি ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন পর্যন্ত। সে সঙ্গে মূল্যায়ন করতে হবে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ছাড়াও স্যার সৈয়দ আহমদ, মহাত্মা গান্ধী, নেতাজী সুভাষ বসু, মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ্, পণ্ডিত জওয়াহার লাল নেহেরু, জননেতা হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, শেরেবাংলা এ. কে. ফজলুল হক, মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী ও আরো অনেক ব্যক্তিত্বের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড।

ধরা যাক, আপনি বাংলাদেশের ঝড়-জলোচ্ছ্বাস নিয়ে নাটক লিখতে চান। আপনাকে জানতে হবে, বাংলাদেশের কোন্ কোন্ এলাকায় ঝড়-জলোচ্ছ্বাস হয়। পৃথিবীতে টর্নেডো, টাইফুন, হারিকেন ইত্যাদি কত রকমের ঝড় আছে। সম্ভব হলে উপদ্রুত অঞ্চলে গিয়ে আপনাকে বুঝতে হবে— ঝড়-জলোচ্ছ্বাসের প্রলয়ংকরী রূপ—

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

ঝড়-জলোচ্ছ্বাস সম্পর্কে বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের ধারণা। ঝড় কোথেকে আসে? ঝড়-জলোচ্ছ্বাসের সাথে উপদ্রুত অঞ্চলের জনগণ কীভাবে লড়াই করে? জলোচ্ছ্বাসে কত লোক মারা যায়? অসহায় মানুষ কীভাবে বাঁচতে চায়? সে সাথে জানতে হবে, সাগরের ভাঙন, রিলিফ ইত্যাদি সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলো।

অর্জিত অভিজ্ঞতার সবকিছু কিন্তু আপনাকে একটি নাটকে লিখতে হবে না। বেছে নিতে হবে একটি মূল সমস্যা— আপনার মূল বক্তব্যের সঙ্গে মিলিয়ে। তবে আপনি নিশ্চিত থাকতে পারেন, আপনার অভিজ্ঞতা, পঠনপাঠন কিছুই বৃথা যাবে না। সংলাপের মাধ্যমে আপনি প্রকাশ করতে পারবেন, অভিজ্ঞতার মূল্যবান ভাণ্ডার।

ভয় পেলে চলবে না। মনে রাখবেন, 'পদ্মানদীর মাঝি'-র উপাদান সংগ্রহের জন্য মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় জেলেদের সঙ্গে উত্তাল পদ্মানদীতে কাটিয়েছেন একাধিক দিনরাত।

প্রসঙ্গগত, কোন বিষয়ের সামগ্রিকতায় না গিয়েও আপনি পারেন। আপনার বিষয় 'মুক্তিযুদ্ধ' হলে, আপনি নিতে পারেন, একজন মহান মুক্তিযোদ্ধার আত্মত্যাগের কাহিনী; নিতে পারেন একজন পঙ্গু মুক্তিযোদ্ধার প্রাত্যহিক জীবনযাপন; নিতে পারেন কোন শহীদ পরিবারের '৭১-পূর্ব স্বপ্ন এবং '৭১-পরবর্তী হতাশা অথবা অন্য কিছু।

০২. সমস্যা

ধরা যাক, আপনি সিদ্ধান্ত নিয়েছেন বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ে একটি নাটক লিখবেন। বিষয়টি অত্যন্ত ব্যাপক। সব দিক সামলে, নাটক লেখা অত্যন্ত কঠিন। আপনি বিশেষ দিন অথবা বিশেষ সমস্যা চিহ্নিত করতে পারেন। ১. তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের ওপর পশ্চিম পাকিস্তানের অর্থনৈতিক শোষণ এবং তজ্জনিত সমস্যা একটি নাটকের বিষয় হতে পারে। অর্থনৈতিক শোষণ সম্পর্কে সচেতন একজন ব্যক্তি অথবা নেতা শোষণ অবসানের লক্ষ্যে আন্দোলন করতে গিয়ে মুক্তিযুদ্ধে জড়িয়ে পড়তে পারেন। ২. পাকিস্তানের সামরিক শাসন— কোন ব্যক্তি অথবা চরিত্রের 'সমস্যা' হতে পারে। সামরিক শাসনের অবসানকল্পে গণতন্ত্রের লক্ষ্যে পরিচালিত আন্দোলন মুক্তিযুদ্ধ পর্যন্ত পড়াতে পারে। ৩. বাঙালিদের ভাষা-সংস্কৃতির ওপর পাকিস্তানিদের আক্রমণ আপনার মূল সমস্যা হতে পারে। ৪. পাকিস্তানের সাথে সংহতি বজায় রাখা সম্ভব নাকি স্বাধীনতা আন্দোলন অনিবার্য— হতে পারে একাত্তর-পূর্ব কোন কেন্দ্রীয় চরিত্রের মূল সমস্যা। ৫. ৭১-এর ২৬ মার্চ স্বাধীনতা ঘোষিত হয়েছে। কিন্তু বাংলাদেশ পাকিস্তানের হানাদার বাহিনীর কবলে। সশস্ত্র-সংগ্রাম অথবা রাজনৈতিক আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে কীভাবে দেশকে শত্রুমুক্ত করা যাবে এ' চিন্তা হতে পারে আপনার একটি নাটকের মূল সমস্যা।

আপনার বিষয় যদি হয় ঝড়-জলোচ্ছ্বাস, তাহলে আপনি নিচের কোন একটি সমস্যা চিহ্নিত করতে পারেন :

০১. প্রথম সমস্যা হতে পারে, ঝড়-জলোচ্ছ্বাস থেকে বাঁচার সমস্যা। প্রাণে বাঁচার সমস্য।

০২. অন্যতম সমস্যা হতে পারে, কোন বিশেষ পরিবারের সমস্যা— যে পরিবারের একজন সদস্য ঝড়-জলোচ্ছ্বাসের কারণে এলাকা ছেড়ে চলে যেতে যায় কিন্তু অন্য সদস্যরা তা চায় না।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

০৩. একজন মহিলা। জলোচ্ছ্বাসে তার স্বামীর মৃত্যু হয়েছে। কিন্তু সে বিশ্বাস করে তার স্বামী একদিন ফিরে আসবে। ফলে সে বাপের বাড়ি ফিরে যেতে চায় না। অন্যদিকে মহিলার শ্বশুর পক্ষ চায়, সে বাপের বাড়ি ফিরে যাক— এ' সমস্যা নিয়ে আপনি চমৎকার একটি নাটক লিখতে পারেন।

আপনারা সেনাপতি ওথেলোকে চেনেন। তিনি মুর ছিলেন। বীরযোদ্ধা ছিলেন। শৈশব থেকে মৃত্যু পর্যন্ত তাঁর জীবনে অনেক ঘটনা ঘটেছে। তাঁর জীবনে ছিল বিচিত্র সমস্যা; কালো হবার সমস্য, প্রমোশনের সমস্য, শত্রুর সাথে যুদ্ধ করবার সমস্যা ও আরো কত কী! কিন্তু শেক্সপিয়ার ওথেলো নাটকে সেনাপতি ওথেলোর যুদ্ধ বিষয়ক সমস্যার দিকে না গিয়ে প্রধান্য দিলেন স্ত্রী ডেসডিমোনার যৌন-আচরণে সন্দেহের সমস্যাকে।

আপনি একটি প্রেমের নাটক লিখতে চান। নায়ক-নায়িকার জীবনে কী কী সমস্যা দেখা দিতে পারে?

০১. নায়িকা অথবা নায়কের প্রত্যাখ্যান/ বিশ্বাসঘাতকতার সমস্যা।

০২. নায়ক-নায়িকার জীবনে নতুন কারো আবির্ভাবের সমস্যা।

০৩. একদিকে নায়কের দারিদ্র্য অন্যদিকে নায়িকার প্রাচুর্য/আভিজাত্যের সমস্যা।

০৪. নায়ক অথবা নায়িকার অকালমৃত্যু ও চিরবিরহের সমস্যা ইত্যাদি ইত্যাদি। আপনার নাটকের জন্য যে-কোন একটি সমস্যাকে মূল সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত করতে পারেন।

পৃথিবীর সেরা নাটকসমূহ পড়লে আপনি দেখবেন, প্রত্যেক নাটকে আছে একটি মূল সমস্যা। যেমন,

সোফোক্লিসের ইডিপাস : সমবেত নাগরিকবৃন্দের কাছ থেকে রাজা ইডিপাস জানতে পারলেন, একজন অশুচি ব্যক্তির অবস্থানের কারণে সারাদেশে নেমে এসেছে মহামারী ও মন্বন্তর। অশুচি ব্যক্তিকে খুঁজে বের করে শাস্তি প্রদান ছিল ইডিপাস নাটকের মূল সমস্যা। বলাবাহুল্য, ইডিপাস নিজেই ছিলেন সেই অশুচি ব্যক্তি— যিনি তার অজান্তে পিতাকে হত্যা করেছিলেন এবং মাকে বিয়ে করেছিলেন। ফলে অপরাধী সন্ধানের সমস্যা হয়েছিল আরো বেশি জটিল।

শেক্সপিয়ারের হ্যামলেট : ডেনমার্কের রাজাকে হত্যা করা হয়েছে। হত্যা-চক্রান্তের সাথে সক্রিয়ভাবে জড়িত ছিলেন রাজার স্ত্রী এবং আপনভাই। যুবরাজ হ্যামলেট ঘটনাচক্রে বুঝতে পারলেন তাঁর পিতার হত্যাকারী হচ্ছেন, তাঁর আপন মা ও আপন চাচা। পিতার হত্যাকারীকে হ্যামলেট হত্যা করবেন কি করবেন না— এটাই হ্যামলেট চরিত্র তথা হ্যামলেট নাটকের মূল সমস্যা।

রবীন্দ্রনাথের বিসর্জন : ত্রিপুরার ত্রিপুরেশ্বরী মন্দিরে দেবীর পূজায় পশু-বলিদান চিরাচরিত প্রথা। একদিন ক্ষুদ্র বালিকা অপর্ণার ছাগশিশুকে বলি প্রদানের উদ্দেশ্যে নিয়ে এলে সে রাজা গোবিন্দমাণিক্যের কাছে জানাল প্রতিবাদ। বলিদান প্রথা নিষেধ করলেন রাজা। পুরোহিত রঘুপতি, রাণী গুণবতী ও অন্যান্যের প্রবল প্রতিবাদের মুখে ঐ সিদ্ধান্তে অটল থাকা ও দেশে শান্তি অক্ষুণ্ন রাখা ছিল গোবিন্দমাণিক্য তথা বিসর্জন নাটকের মূল সমস্যা।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

০৩. বক্তব্য

আপনি একটি নাটক লিখতে চান? কেন লিখতে চাচ্ছেন? কী বলতে চান আপনি নাটকের মাধ্যমে? আপনার 'বিষয়' অথবা 'সমস্যা' যদি হয় মুক্তিযুদ্ধ-কেন্দ্রিক, জাতিকে কী জানাতে চান মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে? নাটক লিখতে হলে অবশ্যই মূল বক্তব্য, লক্ষ্য অথবা প্রতিপাদ্য ঠিক করে নিতে হবে।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ-কেন্দ্রিক নাটকে আপনি নিচের কোন একটি বক্তব্য নিয়ে অগ্রসর হতে পারেন :

০১. স্বাধীনতা কোন ব্যক্তি অথবা জাতির মৌলিক অধিকার। সুতরাং পরাধীনতার বিরুদ্ধে লড়াই করা প্রত্যেকের কর্তব্য।

০২. কোন ঔপনিবেশিক শক্তির অর্থনৈতিক শোষণ (তথা যে-কোন শোষণ) থেকে মুক্তির একমাত্র পথ স্বাধীনতা।

০৩. জনগণের ঐক্য ব্যতীত সামরিক শক্তির হাত থেকে গণতন্ত্রের মুক্তি সম্ভব নয়।

০৪. কোন জাতির সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখতে হলে সর্বাগ্রে প্রয়োজন রাজনৈতিক স্বাধীনতা।

০৫. দেশকে ভালবাসা ঈমানের এক অংশ।

০৬. মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ্‌র দ্বিজাতিতত্ত্ব ছিল ভুল তত্ত্ব। সুতরাং এ তত্ত্বের ভিত্তিতে কোন দেশ টিকতে পারে না।

০৭. বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের পেছনে কাজ করেছিল পশ্চিম পাকিস্তানের (বর্তমান পাকিস্তান) অর্থনৈতিক শোষণ, বাঙালি সংস্কৃতিকে বিনষ্ট করবার অপপ্রচেষ্টা এবং রাজনীতি-ক্ষেত্রে বারবার সংখ্যাগরিষ্ঠ বাঙালির রায়কে উপেক্ষা। পাকিস্তানের সার্বিক শোষণ থেকে মুক্তির জন্য স্বাধীনতা-সংগ্রাম অনিবার্য।

অথবা ধরা যাক, আপনার নাটকের বিষয় ঝড়-জলোচ্ছ্বাস। আপনি এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় ধারণা অর্জন করেছেন এবং একটি 'সমস্যা'ও চিহ্নিত করেছেন। আপনার বক্তব্য কী কী হতে পারে? আগে পৃষ্ঠা ১৬ পড়ে একটু ভাবুন অথবা নিচের কোন একটি বক্তব্য বেছে নিতে পারেন:

০১. পৃথিবীর যে-কোন দেশেই ঝড় আসতে পারে। ঝড় না আসুক অন্য কোন বিপদ-আপদ আসতে পারে। যদি সব দেশেই কোন না কোন বিপদের সম্ভাবনা থাকে, তাহলে নিজের মাতৃভূমি ছেড়ে লাভ কী?

০২. বিপদ থেকে পালাবার চিন্তা সুবুদ্ধির পরিচায়ক নয়। না পালিয়ে বিপদের মোকাবেলা করবার চেষ্টা করা উচিত।

০৩. ইসলামের নবি হজরত মোহাম্মদ (দঃ) থেকে শুরু করে অনেক মহাপুরুষ হিজরত বা স্থানান্তর করেছেন। সুখের সম্ভাবনায় স্থানান্তরে কোন দোষ নাই।

০৪. চিরশান্তির দেশ অথবা সব পেয়েছির দেশ বলে পৃথিবীতে কিছু নেই।

ওথেলো নাটকের 'মূল বক্তব্য' কী? ইয়াগোর ঈর্ষা ও চক্রান্ত কী করে একটি সুখী পরিবারকে ধ্বংস করে দিল? অথবা অসতী নারীর অবৈধ যৌনাচরণ পরিবারে ধ্বংস ডেকে আনে? শেক্সপিয়ার পারতেন [illegible] 'মূল বক্তব্য' করতে। কিন্তু তিনি তা

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

করেন নি। অমূলক সন্দেহ ও ঈর্ষা প্রেমের অবসান ঘটিয়ে পরিণামে ধ্বংস ডেকে আনে— এটি ছিল তাঁর মূল বক্তব্য।

বিষয়/বক্তব্য— আগে কোনটি?

শেক্সপিয়ার কি আগে ওথেলো নামের মুর সেনাপতির জীবন নিয়ে একটি নাটক লেখার কথা ভেবেছিলেন? যে-কোন ব্যক্তির জীবনে অমূলক সন্দেহ ও ঈর্ষা প্রেমের অবসান ঘটিয়ে পরিণামে ধ্বংস ডেকে আনতে পারে— এ'রকম একটি বক্তব্য নিয়ে নাটক লেখার কথা ভেবেছিলেন? অর্থাৎ, আগে 'বিষয়' নিয়ে ভেবেছিলেন নাকি 'বক্তব্য' নিয়ে? এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হতে পারে। উত্তর হবে, আগে-পরের ব্যাপারটি কোন সমস্যা নয়। আপনি প্রথমে কোন 'বিষয়' নিয়ে নাটক লেখার কথা ভাবতে ভাবতে একটা 'বক্তব্য' পেয়ে যেতে পারেন। অথবা কোন একটি বক্তব্যের শিল্পরূপ প্রদানের জন্য কোন 'বিষয়', 'সমস্যা' 'চরিত্রে'র কথা ভাবতে পারেন। ধরা যাক, 'স্বামীর অমূলক সন্দেহ ও ঈর্ষা, প্রেমের অবসান ঘটিয়ে পরিণামে ধ্বংস ডেকে আনে— এ 'বক্তব্য' নিয়ে চিন্তা করলেন শেক্সপিয়ার। তাঁকে ভাবতে হয়েছে, কীভাবে এর শিল্পরূপ প্রদান করা যায়। এ নাটকের জন্য অবশ্যই দরকার একজন স্বামী, একজন স্ত্রী এবং একজন তৃতীয় পুরুষের। স্বামীর নাম রাখলেন তিনি 'ওথেলো', স্ত্রীর নাম 'ডেসডিমোনা' এবং তৃতীয় পুরুষের নাম 'ক্যাসিও'। তারপর 'ইয়াগো' চরিত্র সৃষ্টি করে ওথেলোর মনে সন্দেহের বীজ ঢুকিয়ে ধ্বংস ডেকে আনলেন।

আরো কিছু বক্তব্য/প্রতিপাদ্য

আপনি যদি নাটক লিখতে চান, তাহলে নিচের কোন একটি বক্তব্য/ প্রতিপাদ্য নিয়ে নাটক লিখতে পারেন :

০১. নিষ্ঠুর উচ্চাকাঙ্ক্ষা পরিণামে ধ্বংস ডেকে আনে (যেমন, শেক্সপিয়ারের ম্যাকবেথ নাটক)।
০২. অন্ধ বিশ্বাস পরিণামে ধ্বংস ডেকে আনে এবং অনেকের ভেতরে বাস করে অকৃতজ্ঞতা (যেমন, শেক্সপিয়ারের কিং লিয়ার নাটক)।
০৩. বিলাসিতা ধ্বংস ডেকে আনে।
০৪. লাজ, মান, ভয় এই তিনে প্রেম নয় ইত্যাদি।

প্রত্যক্ষ/পরোক্ষ বক্তব্য

আপনি কোন বক্তব্য সরাসরি উপস্থাপন করতে পারেন। অথবা একটি কাহিনীর মাধ্যমে পরোক্ষ কিছু বক্তব্য উপস্থাপন করতে পারেন। আবার কাহিনীকে এমনভাবে সাজাতে পারেন, যার ফলে একই কাহিনী থেকে একাধিক বক্তব্য বেরিয়ে আসবে।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক একটি নাটকে সরাসরি বক্তব্য আসতে পারে— পাকিস্তানিদের পরাজয় এবং বাঙালিদের জয় অনিবার্য। মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক একই কাহিনী থেকে দ্বিতীয় একটি বক্তব্য বেরিয়ে আসতে পারে— পৃথিবীর যে-কোন দেশেই ঔপনিবেশিক শাসনের অবসান অনিবার্য। তৃতীয় বক্তব্য হতে পারে কি? অশুভশক্তির পরাজয় অবশ্যম্ভাবী— এটি বেরিয়ে আসতে পারে আরো গভীর এবং সুগভীর বক্তব্য

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

হিসেবে। এখানে প্রদত্ত দ্বিতীয় ও তৃতীয় বক্তব্যকে পরোক্ষ বক্তব্য হিসেবে ধরে নেয়া যেতে পারে। আপনি অন্য ধরনের পরোক্ষ বক্তব্যের কথা ভাবতে পারেন :

০১. আপনি রাবণ, মেঘনাদ, রাম, সীতার কাহিনীর মাধ্যমে পরোক্ষে ভারতবর্ষের পরাধীনতা, ইংরেজ-শাসন, স্বাধীনতা-সংগ্রাম ইত্যাদি প্রসঙ্গ আনতে পারেন। যেমন এনেছিলেন, মাইকেল মধুসুদন দত্ত তাঁর মহাকাব্য 'মেঘনাদবধ' মহাকাব্যে।

০২. আপনি বাঘ, কুকুর, শিয়াল ও বানরের কাহিনীর মাধ্যমে ইংরেজ-শাসন, ভারতবর্ষের জনগণের স্বাধীনতা-সংগ্রাম, ইংরেজদের 'ডিভাইড অ্যান্ড রুল' ইত্যাদি প্রসঙ্গ আনতে পারেন— যেমন এনেছিলেন, আবুল মনসুর আহমদ তাঁর 'অথঃ কুত্তা শিয়াল চরিতামৃত' নামক নাট্যচিত্রে।

০৪. প্লট/বৃত্ত

ধরা যাক, আপনার নাটকের 'বিষয়', 'সমস্যা' ও বক্তব্য' নিম্নরূপ :

বিষয় : ঝড়-জলোচ্ছ্বাস।

সমস্যা : কোন একটি পরিবারের একজন সদস্য নিজের বাড়িঘর ছেড়ে তথা এলাকা ছেড়ে ঝড়-জলোচ্ছ্বাস-মুক্ত এলাকায় বসবাস করতে চায়। পরিবারের অন্যান্য সদস্য নিজের এলাকা ছেড়ে অন্যত্র যাবে কি যাবে না, এটাই সে পরিবারের সমস্যা।

বক্তব্য : পৃথিবীর যে-কোন দেশেই ঝড়-জলোচ্ছ্বাস অথবা অন্য কোন বিপদ-আপদ আসতে পারে। সুতরাং মাতৃভূমি ছেড়ে পালাবার কোন মানে নেই।

এবার আপনি কী করবেন? দর্শককে কি সরাসরি বক্তব্য শোনাবেন? না। সন্দ্বীপ-হাতিয়া-গলাচিপা তথা বাংলাদেশের জলোচ্ছ্বাস বিষয়ে একটি বক্তৃতা দেবেন? না। জলোচ্ছ্বাসে বিধ্বস্ত দ্বীপাঞ্চল ছেড়ে অন্য কোন অঞ্চলে স্থানান্তরের কথা বলবেন? ঠিক তাও না। তাহলে আপনার কাজ কী? নাট্যকারের কাজ কী? আপনাকে গল্প শোনাতে হবে— কাহিনী শোনাতে হবে। প্রয়োজনে একাধিক কাহিনী। দর্শক আপনার কাছে গল্প শুনতে চায়— কাহিনী শুনতে চায়; বক্তৃতা বা তত্ত্ব শুনতে চায় না। কীভাবে শোনাবেন? আপনার প্লট-রচনার কৌশলের ওপরই নির্ভর করছে সবকিছু।

আপনি একটি দ্বীপ বেছে নিন। আপনাকে দ্বীপের একটি পরিবারের কাহিনী শোনাতে হবে। ধরা যাক, আদম আলীর পরিবারের কাহিনী আপনি শোনাবেন। আদম আলীদের যে-কোন কাহিনী কি শোনাবেন? আদমের দাদার বিয়েতে অনেক টাকা খরচ হয়েছেল, সে কাহিনী? আদমের নানার রাজধানী সফরের অভিজ্ঞতা? আদম নিজে একবার এক বাঘের সামনে পড়েছিল। কীভাবে সে উদ্ধার পেল, সে কাহিনী শোনাবেন? মনে হয় না। কারণ? কারণ আর কিছু নয়—আপনি আদম আলীদের পরিবারের যে সমস্যা চিহ্নিত করেছেন এবং যেটা দর্শককে শোনাবেন বলে স্থির করেছেন, তার সাথে এসব কাহিনী বা ঘটনার বিশেষ কোন সম্পর্ক নেই। আদম আলীদের পরিবারে হাজারো ঘটনা ঘটেছে; তাদের পরিবারে রয়েছে হাজারো কাহিনী। কিন্তু আপনাকে বেছে নিতে হবে সেই ঘটনা, যেগুলো আপনার চিহ্নিত 'সমস্যা'র

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

সাথে কোন না কোনভাবে সম্পর্কিত—যেগুলো আপনার মূল কাহিনী এবং মূল বক্তব্যকে এগিয়ে নিয়ে যাবে। আপনাকে খুঁজে নিতে হবে পরিবারের সেই সব ঘটনা— যেগুলোর কারণে সাদম আলী এবং পরিবারের অধিকাংশ সদস্য দ্বীপ ছাড়তে চায় না। আপনার সব ঘটনা আবর্তিত হবে 'দ্বীপ ছাড়া-না-ছাড়ার সমস্যা'কে ঘিরে। আদম আলীদের পরিবারের আরো অনেক ঘটনা বা কাহিনী আপনি বলতে পারবেন। কিন্তু অবশ্যই মনে রাখতে হবে :

> সকল ঘটনা অথবা কাহিনী নাটকের মূল সমস্যা এবং বক্তব্যের সাথে কোন না কোনভাবে সম্পর্কিত হতে হবে এবং আপনার মূল কাহিনীকে কোন না কোনভাবে এগিয়ে নিতে হবে। নাটকের মূল সমস্যা এবং মূল বক্তব্যের সাথে সম্পর্কিত কাহিনী নিয়েই রচিত হয় প্লট।

আপনি যখন কোন বক্তব্যের শিল্পরূপ প্রদানের জন্য কাহিনীর আশ্রয় গ্রহণ করবেন অথবা আপনার কাহিনী যখন কোন বক্তব্যকে ধারণ করবে তখনই সেটা প্লটের অন্তর্গত হবে। প্লট নির্মাণ করতে চাইলে, আপনাকে খেয়াল রাখতে হবে— *ঘটনাবলি কোন না কোনভাবে সম্পর্কিত হতে হবে এবং ঘটনাবলি মূল কাহিনীকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে*— এ'সব শব্দ-সমষ্টি বা বাক্যাংশ।

আরেকটি উদাহরণ। আপনি মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক একটি নাটক লিখবেন। একাত্তর-পরবর্তী অনেক ঘটনা আপনাকে হতাশ করে, দুঃখ দেয়। আপনি দেখছেন, স্বাধীনতার শত্রুরা রাষ্ট্র-ক্ষমতা দখল করে বসে আছে। দুর্নীতিতে দেশ ছেয়ে গেছে। সোনার বাংলার স্বপ্ন ধুলোয় গড়াগড়ি যাচ্ছে। কিন্তু আপনাকে বেশি কষ্ট দিচ্ছে মুক্তিযোদ্ধাদের নিষ্ক্রিয়তা, দেশ-প্রেমিক জনতার পরিকল্পনাহীনতা। আপনি হতাশা থেকে উত্তরণের পথ খুঁজছেন। কীভাবে জাগানো যাবে দেশের মানুষকে? 'আর ঘুমায়ো না নয়ন মেলিয়া/ ওঠরে মুসলিম ওঠরে জাগিয়া' ইত্যাকার পঙ্‌ক্তি রচনা করে? 'মুক্তিযুদ্ধের হাতিয়ার, গর্জে উঠুক আরেকবার' এ জাতীয় শ্লোগান দিয়ে? না, আপনি ঠিক করলেন এসব পথে যাবেন না। অভিনব পথ আবিষ্কারের কথা ভাবছেন আপনি। হঠাৎ আপনার মনে একটি বক্তব্য এল : অপমানবোধ না জন্মালে এ জাতির মুক্তি আসবে না। 'মায়ের মুখে কালি না পড়লে ছেলে কেঁদে উঠবে না।' আপনি চরম সিদ্ধান্ত নিলেন, জনৈক স্বাধীনতা-বিরোধী রাজাকারের সাথে একজন মহান শহীদের বিধবা স্ত্রীর বিয়ে দিয়ে মায়ের মুখে কালি ফেলে অপমানবোধ জাগাতে চেষ্টা করবেন। কীভাবে সম্ভব? কোন শহীদের স্ত্রীর উচিত নয়, স্বাধীনতা-বিরোধী কোন রাজাকারকে বিয়ে করা— এ'মর্মে একটি জ্বালাময়ী বক্তৃতা দেবেন? তা'হলে কি মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ফিরে আসবে? না, বক্তৃতা না দিয়ে আপনাকে নাটক লিখতে হবে। গল্প শোনাতে হবে। দর্শকদের কাহিনী জানাতে হবে ঘটনার পর ঘটনা সাজিয়ে। ধরা যাক, একজন শহীদ বুদ্ধিজীবীর নাম অধ্যাপক কলিম। স্ত্রীর নাম জিনাত মহল। আপনি চাচ্ছেন, শহীদ কলিমের বিধবার স্ত্রী জিনাত রাজাকার সবুরকে বিয়ে করুক। আপনার ইচ্ছা, এ বিয়ের মাধ্যমে সকল মুক্তিযোদ্ধা তথা সকল দেশ-প্রেমিকের অপমানবোধ জাগুক। মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ফিরে আসুক।

এ নাটকে আপনি কোন্ কোন্ ঘটনা আনবেন? আপনাকে আনতে হবে সেই সব ঘটনা যেগুলো জিনাত মহলকে প্ররোচিত করেছিল সবুরকে বিয়ে করেন। ঘটনাবলি হতে পারে, রাজাকার-এর মন্ত্রী হওয়া; একাত্তরের দালালদের স্বাধীনতা-পদক প্রাপ্তি

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

ইত্যাদি। ৭১-পরবর্তীকালে জিনাতমহলের পারিবারিক ও সামাজিক অবস্থান সম্পর্কে আপনাকে লিখতে হবে। লিখতে হবে, রাজাকার সবুরের সাথে জিনাতমহলের যোগাযোগ কীভাবে ঘটল— লিখতে হবে অধ্যাপক কলিমের হরণ কাহিনী। বলতে পারেন, '৭১ -এর পঁচিশে মার্চ ও পুরো নয় মাস ধরে পাকিস্তানি নৃশংসতার কিছু ঘটনা। কেননা, আপনার উদ্দেশ্য, অপমানবোধ জাগিয়ে একাত্তরের চেতনা ফিরিয়ে আনা। আপনি কি জিনাত মহলের অর্থনৈতিক দুরবস্থার কথা তুলে ধরবেন? 'যুদ্ধ এবং যুদ্ধ' নাটকে সৈয়দ শামসুল হক সেটা করলে যুক্তিসংগত হতো কি? হতো না এবং সেকারণে তিনি তা করেন নি। কেন হতো না? হতো না এ কারণে যে, ব্যক্তিগত কোন অভাবের কারণে জিনাত মহল এ ধরনের সিদ্ধান্ত নেয় নি; নিয়েছিল ঘৃণা থেকে, অপমানের জ্বালা থেকে।

শহীদের বিধবা স্ত্রীর সাথে রাজাকারের বিয়ে নিয়ে আপনি যদি কোন নাটক লিখতে চান—আপনাকে নিতে হবে সম্পর্কিত ঘটনা—বলতে হবে মূল বক্তব্যের সাথে সম্পর্কিত কাহিনী। যখনই আপনি সম্পর্কিত কাহিনীকে মূল বক্তব্যের সাথে মিলিয়ে যুক্তি-সংগতভাবে উপস্থাপন করবেন—তখনই রচিত হবে আপনার প্লট। প্রসঙ্গত, আপনার নাটকে আপনি অনেক ঘটনার সমাবেশ ঘটাতে পারেন—যেগুলো অন্য কেউ আগে ভাবেন নি। শুধু একটি কথা আপনাকে মনে রাখতে হবে। *আপনার একটি কাহিনীকে অন্য একটি ঘটনার সাথে সম্পর্কিত করতে হবে যুক্তিসংগতভাবে।*

প্লট-নির্মাণ সম্পর্কে আরো কিছু কথা আপনার জানা প্রয়োজন। মূল কাহিনীর মতো প্রায় একই রকমের আরো একটি কাহিনী আপনি নিতে পারেন, যেমন নিয়েছিলেন শেক্সপিয়ার তাঁর *কিং লিয়ার* নাটকে। লিয়ারের তিন কন্যা। একজন সৎ ও পিতৃভক্ত, অন্য দুজন অসৎ-প্রকৃতির। অসৎ-প্রকৃতির দুজন বাবাকে বোঝাল, তারাই প্রকৃত পিতৃভক্ত। তাদের অন্যবোন অসৎ ও পিতৃভক্ত নয়। প্রায় একই রকমের আরেকটি কাহিনী আছে *কিং লিয়ার* নাটকে। আর্ল অব গ্লস্টার-এর দুই ছেলে। প্রতারক এক ছেলে বাবাকে বুঝিয়েছিল—সেই বাবার অনুগত—অন্যজন নয়। নাটকে লিয়ার এবং আর্ল দুজনেই অসৎ সন্তানের চাতুরি বুঝতে ব্যর্থ হয় এবং পরিণামে ভুলের শস্তি লাভ করে। লিয়ার রাজ্য হারায়— গ্লস্টার হারায় চোখ। লিয়ার-গ্লস্টার কাহিনীর মতো সমান্তরাল কোন কাহিনী আপনিও বানাতে পারেন। এ ধরনের কাহিনীতে লাভ কি? নিজেদের অজান্তে লিয়ার এবং গ্লস্টারের জীবনের তুলনা করবেন দর্শক মনে মনে। মানুষের অকৃতজ্ঞতা সম্পর্কে তারা আরো বেশি সচেতন হবেন। দর্শকদের এ সচেতনতাই নাটকের কাহিনীকে দ্রুত এগিয়ে নেবে।

মূল কাহিনী ছাড়া আপনার পরিবেশিত অন্যান্য কাহিনী আসলে 'শাখা কাহিনী'—যে শব্দের সঙ্গে আপনি আযৌবন পরিচিত। বলা প্রয়োজন, মূল কাহিনী ও শাখা কাহিনী প্রায় একই রকম হবে অথবা শাখা কাহিনীর চরিত্রাবলি সব সময়ে মূল কাহিনীর চরিত্রসমূহের সমর্থনে রচিত হবে—এমন কোন কথা নেই। কিং লিয়ার নাটকে এমন একটি শাখা কাহিনী থাকতে পারত, যে কাহিনীতে সকল সন্তান বাবাকে ভালবাসে এবং বাবার প্রতি কৃতজ্ঞ। এখানেও দর্শকদের মনে চলত প্রতিতুলনার একটি প্রক্রিয়া এবং তাতে নাটকের লাভ ছাড়া ক্ষতি হতো না।

প্রসঙ্গত বলা প্রয়োজন, শেক্সপিরীয় বনাম ব্রেশটীয় প্লট অথবা Climatic plot বনাম episodic/epic plot-এ আলোচনায় আমরা সচেতনভাবে যাচ্ছিনে। আমাদের

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

বিশ্বাস, নবীন নাট্যকার যদি আমাদের বর্তমান আলোচনা বুঝতে সক্ষম হন, তাহলে প্রয়োজনে উন্নততর কোন গ্রন্থ পড়ে পার্থক্যসমূহ জেনে নিতে পারবেন। উৎসাহী নাট্যকার আপাতত 'নাটকের পরিভাষা' দেখতে পারেন।

০৫. দ্বন্দ্ব

আপনি জানেন, জীবনে অনেক সমস্যা আছে— বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে বিশেষ বিশেষ সমস্যা। একটু চিন্তা করলে দেখতে পাবেন, সমস্যা সৃষ্টি হয় দুটি পক্ষের কারণে— তাদের ভিন্ন মত, ভিন্ন পথ, চিন্তা-চেতনার ভিন্নতার কারণে। শহীদ অধ্যাপক কলিমের (যুদ্ধ এবং যুদ্ধ) পরিবারের সমস্যা তলিয়ে দেখতে গেলে আপনি দেখতে পাবেন, এ সমস্যায় পরিবারের সদস্যরা কমপক্ষে দুটিভাবে বিভক্ত হয়েছে। এক পক্ষ চাচ্ছে জিনাত মহলের শহীদ পরিবার ত্যাগ এবং বিয়ের সিদ্ধান্ত ঠেকাতে; অন্য পক্ষ (বিশেষ করে জিনাত মহল) চাচ্ছে শহীদ পরিবার ছেড়ে রাজাকার সবুরকে বিয়ে করতে। পক্ষে-বিপক্ষে দুপক্ষ প্রচুর যুক্তিতর্ক উত্থাপন করেছে— এ নিয়ে দুপক্ষের মনোমালিন্য মন কষাকষি হয়েছে। দ্বন্দ্ব আর কিছুই নয়— যে-কোন নাটকে দুপক্ষের মত-বিরোধ, দ্বিমত, মন কষাকষি এবং সংঘাত-সংঘর্ষই দ্বন্দ্ব। মনে রাখতে হবে, দ্বন্দ্ব-সংঘাত মানে মারামারি নয়। দুপক্ষের মত, দর্শন, চিন্তা ইত্যাদির ভিন্নতার কারণেও দ্বন্দ্ব বাঁধতে পারে। জানা প্রয়োজন, কোন সমস্যায় তৃতীয় পক্ষও থাকতে পারে, যেমন থাকে পৃথিবীর হাজারো সমস্যায়। তবে এও সত্য, এই তৃতীয় পক্ষের মতামত শেষ পর্যন্ত প্রথম দুটি পক্ষের কোন একটির সাথে মিলে যাবে।

ত্রিপুরার রাজা গোবিন্দমাণিক্য 'বলিপ্রথা' বন্ধ করতে চেয়েছিলেন। এ নিয়ে রাজ্যে গোলমাল শুরু হলো। জন্ম হলো দুটি পক্ষের। 'বলিপ্রথা' বন্ধ করবার পক্ষে গোবিন্দমাণিক্য, অপর্ণা প্রমুখ। প্রথা চালু রাখার পক্ষে পুরোহিত রঘুপতি, রানী গুণবতী প্রমুখ। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর *বিসর্জন* নাটকে 'দ্বন্দ্ব' সৃষ্টি করেছিলেন, এ দুপক্ষের দ্বন্দ্ব-সংঘাত অবলম্বনে।

কিভাবে দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করবেন? ব্যাপারটি মোটেও কঠিন নয়। যে-সমস্যা নিয়েই নাটক লিখতে বসুন না কেন; আপনাকে বুঝতে হবে সে সমস্যায় কমপক্ষে দুটি পক্ষ রয়েছে— যে সমস্যার রয়েছে কমপক্ষে দুটি দিক। আপনি যদি বায়ান্নর ভাষা-আন্দোলন নিয়ে নাটক লিখতে চান, দুটি পক্ষ ছিল কি? নিশ্চয়ই। একটি হচ্ছে, ভাষা-আন্দোলনে নেতৃত্ব প্রদানকারী ও অংশগ্রহণকরী পক্ষ, অন্যটি ভাষা-আন্দোলন নস্যাৎ করবার চক্রান্তে নিয়োজিত পক্ষ। প্রথম পক্ষে ছিলেন পূর্ববঙ্গের বাংলা-ভাষাভাষী জনগণ; অন্যপক্ষে পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকচক্র ও তাদের সহযোগীবৃন্দ। চরিত্রের নাম উল্লেখ করে বললে বলতে হয়. একপক্ষে ছিলেন জনগণের প্রতিনিধি আবুল মতিন, মোহাম্মদ তোয়াহা, অলি আহাদ, তাজউদ্দীন আহমদ ও আরো অনেকে। অন্য পক্ষে তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী নূরুল আমীন ও আরো অনেকে। ভাষা-আন্দোলনভিত্তিক নাটকে আপনি যখন এ দুপক্ষের বক্তব্য তুলে ধরবেন 'প্লট'-এর কথা মনে রেখে; তখনই নাটকীয় 'দ্বন্দ্বের' সৃষ্টি করতে পারবেন।

গ্রন্থের শুরুতে 'বিচিত্র দ্বন্দ্ব-সংঘাতে'র কথা বলেছিলাম। দ্বন্দ্ব-সংঘাত কি সত্যই বিচিত্র? উত্তর হবে হ্যাঁ, সত্য। পৃথিবীর ইতিহাস তো দ্বন্দ্বেরই ইতিহাস। এখানে ব্যক্তির

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

সাথে ব্যক্তির দ্বন্দ্ব হয়; ব্যক্তির সাথে সমাজের দ্বন্দ্ব হয়। জনগণের সাথে রাষ্ট্রক্ষমতার অধিকারীদের সংঘর্ষ বাঁধে। সংঘর্ষ বাঁধে একটি দেশের সাথে আরেকটি দেশের। নিরন্তর দ্বন্দ্ব চলছে পুঁজিবাদের সাথে সমাজতন্ত্রের; বাংলাদেশে দ্বন্দ্ব রয়েছে গণতন্ত্রের সাথে সামরিকতন্ত্রের; বাঙালি জাতীয়তাবাদের সাথে বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদের; ধর্মনিরপেক্ষতার সাথে মৌলবাদের।

এত কথা বলা হলো, একটি গুরুত্বপূর্ণ দ্বন্দ্বের কথা কিন্তু বলা হয় নি। সেটি হচ্ছে, কোন ব্যক্তি অথবা চরিত্রের নিজের সাথে নিজের দ্বন্দ্ব। এ দ্বন্দ্ব আপনার মধ্যেও আছে। আপনি একটি কাজ করতে চাচ্ছেন— আপনার মন হয়তো বলবে— না, এ কাজটি করো না। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের *কৃষ্ণকান্তের উইল* উপন্যাসে রোহিনীর মনে এ রকম একটি দ্বন্দ্ব বেঁধেছিল। তার মন সুমতি ও কুমতি দুটি পক্ষে বিভক্ত হয়েছিল। সু বলেছিল, "এমন লোকেরও সর্বনাশ করিতে আছে?" অন্যদিকে কু বলেছিল, "উইল ত হরলালকে দিই নাই। সর্বনাশ কই করিয়াছি?" নাটকের পরিভাষায় এ দ্বন্দ্বের নাম অন্তর্দ্বন্দ্ব। আপনি কি 'অন্তর্দ্বন্দ্ব' সৃষ্টি করতে চান? এভাবে করতে পারেন। আপনার কোন একটি চরিত্রের বাবাকে হত্যা করা হয়েছে। ঘটনাচক্রে চরিত্র জানতে পারল, তার মা ও চাচা চক্রান্ত করে তার বাবাকে হত্যা করেছে। প্রতিশোধ গ্রহণ কি সহজ কাজ হবে? প্রতিশোধ গ্রহণ করতে হলে নিজের মা ও চাচাকে হত্যা করতে হয়। হত্যা করব কি করব না— প্রতিশোধ গ্রহণ করা ঠিক হবে কি হবে না— চরিত্র সমস্যায় ভুগবে। আর আপনি সৃষ্টি করতে পারেন চমৎকার অন্তর্দ্বন্দ্ব, যেমন করেছিলেন শেক্সপিয়ার তাঁর 'হ্যামলেট' চরিত্রে।

দ্বন্দ্ব-সংঘাতের শিল্পরূপ দিতে হলে আপনাকে আরো কিছু কথা ভাবতে হবে। বায়ান্নোর একুশে ফেব্রুয়ারিতে নূরুল আমিনের পক্ষের গুলিতে আবুল বরকত, সালাম প্রমুখ শহীদ হয়েছিলেন। বিরোধ অথবা দ্বন্দ্ব কি ওই দিনই শুরু হয়েছিল? নাকি এ দ্বন্দ্বের একটি সূচনা আছে? আপনাকে খুঁজতে হবে সেই সূচনাপর্ব। দ্বন্দ্বের সূত্রপাত কি বায়ান্নর জানুয়ারিতে হয়েছিল? অথবা ভাষা-সংগ্রাম গঠিত হবার পর? নাকি '৪৮ সালের মার্চ মাসে, মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ্‌র 'Urdu and Urdu shall be the only state language' এ-ঘোষণার পর? এরপর আপনাকে খুঁজতে হবে দ্বন্দ্বের তথা বিরোধের অগ্রগতি। কীভাবে বিরোধ ধীরে ধীরে দানা বেঁধে উঠল, জনগণের মনে কীভাবে ভাষা-চেতনা প্রবাহিত হলো ইত্যাদি। আপনি জানেন, দুপক্ষের দ্বন্দ্ব চরমে উঠেছিল ১৯৫২ সালের একুশে ফেব্রুয়ারি। আপনি জানেন, কীভাবে নূরুল আমিনচক্রের গুলিতে শহীদ হয়েছিলেন বরকত, সালাম, রফিক, জব্বার ও আরো কয়েক জন। দুপক্ষের চূড়ান্ত সংঘর্ষের পর প্রতিক্রিয়া কী হয়েছিল? স্বতঃস্ফূর্ত জনগণ রাস্তায় নেমে পড়েছিলেন; আইন পরিষদের সদস্যপদ ত্যাগ করেছিলেন আবুল কালাম শামসুদ্দীন ও আব্দুর রশীদ তর্কবাগীশ। এ বিরোধের সমাধান হলো কীভাবে? হয়েছিল, অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে বাংলাকে স্বীকৃতি প্রদানের ঘোষণার মাধ্যমে অর্থাৎ, জনতার বিজয়ের মাধ্যমে।

দুপক্ষের বিরোধ বিশ্লেষণ করলে আমরা পাই, বিরোধের সূত্রপাত; বিরোধের অগ্রগতি, চরম আকার প্রাপ্তি; এর পর জনগণের প্রতিক্রিয়া এবং সর্বশেষে সমাধান। পৃথিবীর যে-কোন বিরোধ বা দ্বন্দ্ব বিশ্লেষণ করলেই দেখা যাবে এ রকম সূত্রপাত, অগ্রগতি, চরম আকার প্রাপ্তি, প্রতিক্রিয়া ও সমাধান রয়েছে। নাটকের পরিভাষায় বলা

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

যায় প্রত্যেক 'দ্বন্দ্বের'র রয়েছে প্রারম্ভ (সূত্রপাত); প্রবাহ (অগ্রগতি), ক্লাইম্যাক্স বা সঙ্কট (চরম আকার প্রাপ্তি); সঙ্কটমোচন (প্রতিক্রিয়া) ও পরিণতি (সমাধান)।

ভাষা-আন্দোলন নিয়ে নাটক লিখলে আপনাকে তুলে ধরতে হবে ভাষা-দ্বন্দ্বের প্রারম্ভ, প্রবাহ, সঙ্কট, সঙ্কটমোচন ও পরিণতি। নাটকে সাধারণত পাঁচটি অঙ্ক কেন থাকে এবারে বলা যেতে পারে। সাধারণত প্রথম অঙ্ক থাকে দ্বন্দ্বের 'প্রারম্ভ'-এর জন্য; দ্বিতীয় অঙ্ক 'প্রবাহে'র জন্য। এভাবে তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম অঙ্ক থাকে যথাক্রমে সঙ্কট, সঙ্কটমোচন ও পরিণতির জন্য। ইচ্ছে করলে অথবা বিশেষ প্রয়োজনে আপনি এ নিয়ম/ধারাবাহিকতা ভাঙতে পারেন। ক্লাইম্যাক্স বা সঙ্কট তৃতীয় অঙ্কে না এনে চতুর্থ অঙ্কে আনতে পারেন। কিং লিয়ার নাটকে শেক্সপিয়ার, কারো কারো মতে ক্লাইম্যাক্স নাকি এনেছিলেন প্রথম অঙ্কে। তাহলে আপনার পরিকল্পিত ভাষা-আন্দোলনভিত্তিক নাটকের আনুমানিক কাঠামো হতে পারে নিম্নরূপ :

প্রথম অঙ্ক	প্রারম্ভ [Exposition]	মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর ঘোষণা "Urdu and Urdu shall be the only state language" থেকে উর্দুকে চাপিয়ে দেয়ার সরকারি সিদ্ধান্ত পর্যন্ত।
দ্বিতীয় অঙ্ক	প্রবাহ [Initial incident/ rising action]	উর্দুকে চাপিয়ে দেয়ার চক্রান্ত। প্রতিরোধ জল্পনা-কল্পনা থেকে সংগ্রাম পরিষদ গঠন পর্যন্ত।
তৃতীয় অঙ্ক	সঙ্কট [Climax]	সংগ্রাম পরিষদের বিভিন্ন আন্দোলন কর্মসূচি থেকে একুশে ফেব্রুয়ারির গুলিবর্ষণ ও শাহাদাত পর্যন্ত। [ঘটনা ক্লাইম্যাক্সে উঠল অর্থাৎ, দুপক্ষ মুখোমুখি হলো, সংঘর্ষে লিপ্ত হলো।]
চতুর্থ অঙ্ক	সঙ্কটমোচন [Turning point/ resolution]	আবুল কালাম শামসুদ্দিন ও আবদুর রশীদ তর্কবাগীশদের পদত্যাগ—জনগণের প্রতিক্রিয়া ও নূরুল আমিন প্রমুখের নমনীয় সুর।
পঞ্চম অঙ্ক	পরিণতি [Catastrophe]	অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে বাংলাকে স্বীকৃতি প্রদানের ঘোষণা থেকে জনগণের বিজয় মিছিল পর্যন্ত।

ভাষা-আন্দোলনভিত্তিক নাটক শুধু এভাবেই হবে এমন কোন কথা নেই। ইচ্ছে

আমার বই

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

করলে আপনি আনুমানিক কাঠামোর ধারাবাহিকতা ভাঙতে পারেন। অথবা বায়ান্নর একুশে ফেব্রুয়ারির রক্তাক্ত ঘটনার সূত্র ধরে লিখতে পারেন 'কবরের' মতো নাটক— যেমন লিখেছিলেন মুনীর চৌধুরী।

প্রতিটি অঙ্ক কয়েকটি দৃশ্যে বিভক্ত থাকে কেন? যে-কোন অঙ্কের সাহায্যে এর উত্তর দেয়া যেতে পারে। ধরা যাক, প্রথম অঙ্ক। এ অঙ্কে আপনার দায়িত্ব— কোন্ দুটি পক্ষের মধ্যে বিরোধের সূত্রপাত হয়েছে এটা বোঝানো। এটা বোঝাতে পারেন, বিভিন্ন দৃশ্যের সাহায্যে। প্রথম দৃশ্যে আনতে পারেন প্রথম পক্ষকে; দ্বিতীয় দৃশ্যে দ্বিতীয় পক্ষকে। তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম দৃশ্যে আনতে পারেন আবার দ্বিতীয়, প্রথম অথবা তৃতীয় কোন পক্ষকে। প্রথম অঙ্কের প্রথম দৃশ্যেই মূল দ্বন্দ্ব বোঝাতে হবে— এমন কথা নেই। প্রথম অঙ্কের শেষ দৃশ্যেও আপনি মূল দ্বন্দ্বের সূচনা করতে পারেন। বাকি দৃশ্যসমূহে কিন্তু ক্ষেত্র প্রস্তুত করতে হবে।

এসব কাজে আপনাকে বারবার মনে রাখতে হবে, প্লট রচনার কৌশল অর্থাৎ, বিভিন্ন ঘটনাকে মূল বক্তব্যের সাথে মিলিয়ে সম্পর্কিত করবার কৌশল। আরো কাজ আছে আপনার। পারলে প্রথম অঙ্কেই আপনাকে প্রদান করতে হবে শেষ অঙ্কের ইঙ্গিত অর্থাৎ, দ্বন্দ্বের 'পরিণতি' কী হবে সে ইঙ্গিত। সোফোক্লিসের ইডিপাস চরিত্র নাটকের গোড়াতেই বলেছিলেন— "প্রতিটি গৃহ থেকে সে (অপরাধী) অশুচি এবং ঘৃণিত বলে বিতাড়িত হবে। ... একই শাস্তি আমারও হবে যদি আমিও জ্ঞাতসারে পাপীকে আশ্রয় দিই।" নাটক শেষে আমরা দেখেছি, অপরাধের শাস্তি ইডিপাসের নিজের ওপরই পড়েছিল এবং তিনি দেশ থেকে বিতাড়িত হয়েছিলেন।

সাম্প্রতিক কোন কোন নাটকে 'অঙ্ক-দৃশ্য' সুস্পষ্ট করে লেখা থাকে না। না থাকলেও, পড়লে বুঝতে পাবেন, নাট্যকার মনে মনে কাঠামোটি ঠিক করে নিয়েই কলম ধরেছিলেন।

০৬. চরিত্র/চরিত্র সৃষ্টি

আপনি জানেন, পৃথিবীর যে-কোন সমস্যায় কমপক্ষে দুটি পক্ষ থকে। এক পক্ষ বলে এ কাজ করব; অন্য পক্ষ বলে এ কাজ করা চলবে না। প্রত্যেক সমস্যার পক্ষে-বিপক্ষের লোকগুলোই হচ্ছে আপনার চরিত্র, নাটকের চরিত্র। আপনাকে এ চরিত্রসমূহ 'সৃষ্টি' করতে হবে— তাদের অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ মিলিয়ে। তাদের স্বপ্ন-কল্পনাকে রূপ দিতে হবে 'আপন মনের মাধুরী মিশিয়ে'। চরিত্র সৃষ্টি করতে গিয়ে আপনাকে মনে রাখতে হবে— 'কবি তব মনোভূমি/রামের জন্মস্থান অযোধ্যার চেয়ে সত্য জেনো'।

সৈয়দ শামসুল হকের 'যুদ্ধ এবং যুদ্ধ' নাটকের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র রহমতুল্লাহ। সে চায় না জিনাত মহল পরিবার ছেড়ে চলে যাক। সে চায় না, জিনাত মহল কাউকে বিয়ে করুক। কেন চায় না সে? জিনাত মহলের মঙ্গল কামনা করে বলে? মনে হয় না। খুব ধার্মিক বলে? প্রশ্নই ওঠে না। রহমতের পরিবার হিন্দু ধর্মাবলম্বী হলে হয়তো এ প্রশ্ন উঠতে পারত। জিনাতের প্রতি রহমতের কি কোন দুর্বলতা আছে? না। তাহলে, কেন সে চায় না জিনাত ঘর ছাড়ুক নাটক থেকে আমরা নিচের কারণগুলো খুঁজে পাই :

০১. জিনাত মহল এবং তার শহীদ স্বামীর নাম ব্যবহার করে রহমত প্রচুর

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

টাকা-পয়সা করেছে। পুরোনো ঢাকার কানাগলি ছেড়ে অভিজাত এলাকা গুলশানে বাড়ি করেছে। জিনাত মহল এখন পর্যন্ত তার ফার্মের অন্যতম ডিরেক্টর। সুতরাং সে চলে গেলে তার 'ফার্মের' ক্ষতি হতে পারে।

০২. শহীদ পরিবারের সদস্য হিসেবে রহমত দীর্ঘকাল ধরে সমাজে সম্মান লাভ করে এসেছে। জিনাত চলে গেলে সমাজে ভুল বোঝাবুঝির জন্ম হবে। এর ফলে শহীদ পরিবারের সদস্য হিসেবে তার মর্যাদা ক্ষুণ্ন হতে পারে।

০৩. এখন স্বাধীনতা বিরোধীরা ক্ষমতায়। জিনাতের গৃহত্যাগে এখন হয়তো বিশেষ অসুবিধে হবে না। যদি কখনো স্বাধীনতার পক্ষের শক্তি এসে জিজ্ঞেস করে, শহীদের বিধবাকে বের করে দিলে কেন— তখন কি জবাব দেবে সে?

এ কারণগুলো একটু বিশ্লেষণ করা যাক। প্রথম কারণ থেকে বোঝা যাচ্ছে রহমতের সিদ্ধান্তের পেছনে কাজ করেছে অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ। দ্বিতীয়-তৃতীয় কারণের পেছনে রয়েছে যথাক্রমে সমাজ-মনস্তাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ। চরিত্র সৃষ্টি করতে হলে আপনাকে মনে রাখতে হবে, চরিত্রের কোন সিদ্ধান্ত, কাজ অথবা আচরণের পেছনে সুগোপনে কাজ করে তার আর্থ-সামাজিক অবস্থান, তার রাজনৈতিক চিন্তাধারা, তার মনস্তত্ত্ব ইত্যাদি। এমনকি তার শারীরিক গঠনও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।

আপনাকে মনে রাখতে হবে, শুধু একটি কারণেই কেউ কোন বড় সিদ্ধান্ত নেয় না। প্রেমের ক্ষেত্রে যদি ব্যর্থতা আসে, শুধু একটি কারণে তা আসে না। একদিনের কোন ঘটনার জের হিসেবে কেউ বিশেষ ধরনের আচরণ করে না। অন্য কারণ— অন্য ইতিহাসও থাকে। রবীন্দ্রনাথের বিসর্জন নাটকে রাজা গোবিন্দমাণিক্যের বলিপ্রথা বন্ধের নির্দেশ শুনে পুরোহিত রঘুপতি প্রতিবাদ জানিয়েছিল। এ নির্দেশের বিরুদ্ধে সর্বশক্তি নিয়োগ করেছিল। পুরোহিত রঘুপতি কি শুধু ধর্মীয় কারণে বাধা দিয়েছিল? বাধা দেয়ার পেছনে আরো কাজ করেছিল অহঙ্কার, অভিমান, ব্রাহ্মণত্ব :

আমি আছি যেথা, সেথা এলে
রাজদণ্ড খসে যায় রাজহস্ত হতে
মুকুট ধুরায় পড়ে লুটে।

সে ভাল করে জানে, বলিপ্রথা বন্ধ হলে তার পুরোহিততন্ত্রে আঘাত আসবে আর সে আঘাতে তার প্রবল প্রতাপ হবে ক্ষুণ্ন। সুতরাং 'জীব-রক্ত' না হলে দেবীর চলে না— শুধু এ কারণে সে রাজার বিরুদ্ধাচারণ করে নি। অন্যদিকে শুধু রাজার কাছে বাধাদানের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ রঘুপতি চরিত্রকে সীমাবদ্ধ রাখেন নি। পালকপুত্র জয়সিংহের প্রতি তার প্রবল টানাপোড়েনের মাধ্যমে মনস্তাত্ত্বিক দিক থেকে ভিন্ন মাত্রা যোগ করেছেন রবীন্দ্রনাথ। এ রকম কোন চরিত্র নিয়ে নাটক লিখলে ধর্মীয় কারণ ছাড়াও আর্থ-সামাজিক, মনস্তাত্ত্বিক কারণ/সিচুয়েশন আপনাকে তৈরি করতে হবে। আর তৈরি করতে পারলেই আপনার চরিত্র হবে সর্বাঙ্গ সুন্দর।

শুধু একটি কারণে প্রেমে ব্যর্থতা আসে কি? ধরা যাক, আপনি একটি ব্যর্থ প্রেমের নাটক লিখবেন। প্রেমিক-জুটি একই ক্লাশের ছাত্র-ছাত্রী। দীর্ঘদিনের মেলামেশার কারণে বন্ধু-বান্ধব জানে একদিন তাদের শুভ-পরিণয় সুসম্পন্ন হবে। কিন্তু কোন এক নিষ্ঠুর বিকেলে মেয়েটি এসে ছেলেটিকে বলল : "আমাকে মাফ করে

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

দাও। আব্বা এক ইঞ্জিনিয়ার ছেলের সাথে আমার বিয়ে ঠিক করে ফেলেছে। তোমাকে ছাড়া কেমন করে যে বাঁচব? এরপর ছেলেটি— 'জীবনে যদি দীপ জ্বালাতে নাহি পারো সমাধি পরে মোর জ্বেলে দিও' ধরনের একটি গান গাইতে গাইতে চলে গেল। মেয়ের পিতা ইঞ্জিনিয়ারের সাথে বিয়ে ঠিক করেছে বলেই প্রেমিকটি ব্যর্থ হবে? একটি কারণে? না। ব্যর্থ-প্রেমিক চরিত্রটি আঁকতে হলে আপনাকে আরো কাজ করতে হবে। ছেলেটি কি ইঞ্জিনিয়ারিং অথবা ডাক্তারি পড়বে? না। এমন কোন বিষয় পড়লে ভাল হয়— যে-বিষয়ে পাশ করলে বেকার হবার প্রচুর সম্ভাবনা থাকে। ছেলেটি পড়াশোনায় মনোযোগী হয়ে প্রথম শ্রেণী লাভ করেবে কি? ছেলেটি অমনোযোগী হয়ে তৃতীয় শ্রেণী পেলে এবং সে সাথে খ্যাতি লাভের জন্য রাজনীতি ও সংস্কৃতি চর্চায় অতিব্যস্ত হলে ভাল হয়। ছেলেটির আর্থিক অবস্থা এবং স্বভাব কেমন হবে? গরিব ও আন্তরিক বলে দরিদ্র মায়ের দুঃখের পাঁচালি ভরা একটি চিঠি সে প্রেমিকাকে পড়তে দিয়েছিল। ফলে শুধু ইঞ্জিনিয়ার ছেলের প্রস্তাবে প্রেমে ব্যর্থতা এল তা কিন্তু নয়। ব্যর্থতার জন্য দায়ী ছেলেটির পড়াশোনার প্রতি অমনোযোগ, পরীক্ষার ফল, সংস্কৃতি জগতে প্রতিষ্ঠা লাভের ব্যর্থ প্রচেষ্টা ও সর্বোপরি আর্থিক সমস্যা। আচ্ছা এমন যদি হয়? ছেলেটি পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণী পেয়েছে। পরিবারের আর্থিক অবস্থাও যথেষ্ট ভালো। তাহলেও প্রেমে ব্যর্থতা আসতে পারে। এক্ষেত্রে ব্যর্থতার কারণ হবে ভিন্ন। সে-কারণগুলো একটু চিন্তা করলেই আপনি খুঁজে পাবেন।

আপনি লোককাহিনী অথবা পৌরাণিক কাহিনী অবলম্বনে একটি নাটক লিখবেন। গ্রিক পুরাণ নিয়ে ভাবতে ভাবতে খুঁজে পেলেন ইডিপাসের কাহিনী। ইডিপাসের ভাগ্য পূর্ব-নির্ধারিত। দৈব নির্দেশ আছে, সে তার পিতাকে হত্যা করবে এবং মাকে বিয়ে করবে। দৈব-নির্দেশ যাই থাক না কেন, নাটক লিখতে হলে, পিতাকে হত্যা করে মাকে বিয়ে করবার মতো পরিস্থিতি এবং সর্বশেষে নিজের পরিচয় জানবার মতো মর্মান্তিক পরিস্থিতি আপনাকে সৃষ্টি করতে হবে। ইডিপাস চরিত্রের মধ্যে এমন কিছু বৈশিষ্ট্য আরোপ করতে হবে যাতে এ'দুটি কঠিন ও অবিশ্বাস্য কাজ সম্ভব হয়। ইডিপাস পুরোপুরি দৈবে বিশ্বাসী হবে কি? না। পুরো বিশ্বাসী হলে নাটকই হয় না। পুরো বিশ্বাসী নয় বলে সে করিনথের মন্দিরে যায়। সে-মন্দিরে-শোনা নির্দেশ যাতে তার ওপর কার্যকরী হতে না পারে, সে-জন্যে পালিয়ে আসে। আপনি নাট্যকার। আপনি চান, পৌরাণিক কাহিনী অক্ষত থাকুক অর্থাৎ, ইডিপাস তার পিতাকে হত্যা করুক। পিতৃহত্যার সিচুয়েশন আপনাকে তৈরি করতে হবে অর্থাৎ, পরস্পরের অজান্তে পিতা-পুত্রের সাক্ষাৎ ঘটাতে হবে। সাক্ষাৎ ঘটলেই কি পিতৃহত্যা হবে? নিশ্চয়ই না। ইডিপাস চরিত্রের মধ্যে এমন একটি উপাদান থাকতে হবে, যে কারণে এ-রকম একটি হত্যা সম্ভব। সে উপাদান হতে পারে শক্তি, সাহস, মেজাজ অথবা একগুঁয়েমি। এসব উপাদান তার মধ্যে আছে বলে সে পথ না ছাড়ার জন্য বৃদ্ধকে হত্যা করবে। এবার মা অর্থাৎ, জোকাস্টার সাথে বিয়ের সিচুয়েশন আপনাকে তৈরি করতে হবে। আপনি পৌরাণিক কহিনী জানেন— জানেন এলাকার নিয়মাবলি। ধাঁধার উত্তর দিয়ে স্ফীক্সস-এর অত্যাচার থেকে যে-ব্যক্তি থীবীকে রক্ষা করতে পারবে, সে-ই মৃত রাজার পত্নী অর্থাৎ, জোকাস্টাকে বিয়ে করবার অধিকার পাবে। ধাঁধার উত্তর দিয়ে জোকাস্টাকে বিয়ে করবার জন্য ইডিপাসকে হতে হবে জ্ঞানী। সর্বশেষে ইডিপাস-এর আত্মপরিচয় উদ্ঘাটনের পালা। অজানা পাপে ভরে গেছে দেশ। পাপীকে খুঁজে বের করতে হবে।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

জনগণ এল রাজা ইডিপাসের কাছে। ইডিপাসের চরিত্রে এমন উপাদান যোগ করতে হবে, যে কারণে সে পাপীকে খুঁজে বের করে শাস্তি বিধান করবে। পাপীকে সন্ধানের ব্যাপারে ইডিপাস হবে আগ্রহী, সত্য উদ্ঘাটনে তৎপর, অনুসন্ধিৎসু এবং সৎ। সোফোক্লিস তাঁর ইডিপাস চরিত্রে এ গুণগুলিই আরোপ করেছিলেন।

আপনার চরিত্রসমূহের মধ্যে কোন পরিবর্তন, দোদুল্যমানতা থাকবে কি? নাকি তারা একই সিদ্ধান্তে অথবা বক্তব্যে অটল থাকবে পাষাণের মতো? না, আপনার চরিত্রকে পাষাণ হলে চলবে না; তাদের মানুষ হতে হবে। আর মানুষ হতে হলে, তাদের চরিত্রে দরকার পরিবর্তন। একই মানুষ সবসময় এক রকম আচরণ করেনা। একরকম থাকে না। স্থান-কাল পাত্র ভেদে মানুষের মনোভাব পালটাতে পারে।

শেক্সপিয়ারের ম্যাকবেথ রাজা ডানকানকে হত্যা করেছে, ব্যাঙ্কোকে হত্যা করিয়েছে, ম্যাকডাফের স্ত্রী ও শিশুসন্তানকে হত্যার ব্যবস্থা করেছে। এ-রকম উচ্চাকাঙ্ক্ষী, নিষ্ঠুর ও সাহসী ম্যাকবেথের মধ্যে বারবার দেখা গেছে পরিবর্তন, দোদুল্যমানতা তথা অন্তর্দ্বন্দ্ব। ডানকানকে হত্যা করতে গিয়ে প্রথমবার সে পিছিয়ে এসেছে। ব্যাঙ্কোকে হত্যা করিয়ে ভোজসভায় গিয়ে সে মৃত ব্যাঙ্কোকে চেয়ারে দেখতে পায় এবং দিশেহারা হয়ে পড়ে। লেডি ম্যাকবেথ ডানকানের মুখে পিতার মুখের সাদৃশ্য খুঁজে পায় বলে তাকে হত্যা করতে পারে না। লেডী ম্যাকবেথ চরিত্রের এ' পরিবর্তন আরো বেশি উল্লেখযোগ্য। নাটকের শুরুতে সে বলেছিল, "সামান্য পানিতেই এ কাজের চিহ্ন মুছে ফেলা সম্ভব— কত সহজ এ কাজ"। নাটকের শেষ দিকে তার মুখে আমরা শুনি— "আরব দেশের সমস্ত সুগন্ধী এ ছোট হাতের দুর্গন্ধ দূর করতে পারবে না"। ইবসেনের পুতুলের সংসার (ডলস হাউজ) নাটকের শুরুর দিকের আহ্লাদী পুতুল নোরা নাটকের শেষ দিকে পরিপূর্ণ হয়। ওথেলো তার জীবন শুরু করে প্রেম দিয়ে। তার জীবনের সমাপ্তি আসে ঈর্ষা, হত্যা, আত্মহত্যার মাধ্যমে।

আপনার সৃষ্ট চরিত্রে, পরিবর্তন/বিকাশ না থাকলে চরিত্রটি হয়ে পড়বে 'ফ্ল্যাট' (flat)। একজন নাট্যকারের কাছে বিকশিত অথবা 'round' চরিত্রই কাম্য।

শান্ত চরিত্রকে সব সময় শান্ত অথবা বিপ্লবী চরিত্রকে সব সময় বিপ্লবী, সৎ অথবা ভালোমানুষ দেখাতে হবে এমন কোন কথা নেই। আপনার শান্ত চরিত্র হঠাৎ একদিন অশান্ত হয়ে উঠতে পারে— ভাত খেতে খেতে ছুঁড়ে ফেলতে পারে ভাতের থালা অথবা ভেঙে তছনছ করে দিতে পারে ঘরের অনেক আসবাবপত্র। অন্যদিকে বিপ্লবী চরিত্রের মধ্যে আরোপ করতে পারেন কিছু মানবিক ত্রুটি। যেমন, নিষ্ঠুরতা, নারীদেহ লোলুপতা, সহকর্মী, রাজনৈতিক বন্ধুর প্রতি সহজাত ঈর্ষা ইত্যাদি। এ কাজগুলো অত্যন্ত কঠিন। বিপ্লবী চরিত্রে মানবিক দুর্বলতা আঁকতে গিয়ে আপনাকে ভারসাম্য রাখতে হবে, রুচির পরিচয় দিতে হবে। তা না হলে বিপ্লবী চরিত্র পরিণত হবে স্থূল কোন চরিত্রে।

যে-কোন সমস্যার সাথে জড়িত থাকে একাধিক চরিত্র। কেউ পক্ষে কেউ বা বিপক্ষে। আপনার নাটকেও থাকবে একাধিক চরিত্র। রাজা গোবিন্দমাণিক্য বলিপ্রথা বন্ধ করতে চান। তাকে কোন না কোনভাবে সমর্থন করবে কিছু লোক। পুরোহিত রঘুপতি চায়, বলিপ্রথা বন্ধের আদেশ বাতিল হোক। তাকেও কোন না কোনভাবে সমর্থন করবে কিছু লোক। নাটকের পরিভাষায় পক্ষে-বিপক্ষের দুই প্রধান চরিত্রকে 'কেন্দ্রীয় চরিত্র' বলা যেতে পারে। অন্যান্য চরিত্র হচ্ছে পার্শ্বচরিত্র। ইংরেজিতে পক্ষের

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

'কেন্দ্রীয় চরিত্রকে' বলা হল 'Protagonist' এবং বিপক্ষের কেন্দ্রীয় চরিত্রকে বলা হয় antagonist। নাটকের কেন্দ্রীয় চরিত্রই 'নায়ক'। এ'দুটি শব্দে মূলত কোন তফাত নেই। বাংলা ভাষায় সাধারণত প্রেমের নাটকের কেন্দ্রীয় চরিত্রকে 'নায়ক' বলে অভিহিত করা হয়। 'নায়কের' সাথে 'প্রতিনায়ক' এবং 'খলনায়কের' কথাও এসে পড়ে। বাংলায় অনেক সময় প্রতিনায়ক ও খলনায়ককে এক আসনে বসানো হয়। নায়কের আন্তরিক প্রতিদ্বন্দ্বীকে প্রতিনায়ক এবং খল/বদমাশ প্রতিদ্বন্দ্বীকে 'খলনায়ক' বা 'ভিলেন' বলা যেতে পারে। ধরা যাক, নায়িকার নাম 'মেরী'। তাকে আন্তরিকভাবে ভালবাসে যথাক্রমে করিম ও সালেক। মেরী ভালবাসে করিমকে। এক্ষেত্রে সালেক হবে প্রতিনায়ক। সালেক নায়িকাকে লাভের জন্য কোন ছল-চাতুরীর আশ্রয় গ্রহণ করবে না। সালেক যদি আন্তরিকতা পরিহার করে ছল-চাতুরীর আশ্রয় গ্রহণ করে অথবা নায়কের ক্ষতিসাধন করে নায়িকাকে লাভ করতে চায়, তাহলে সেও পরিণত হবে খলনায়কে।

কেন্দ্রীয় চরিত্র অথবা অন্যান্য পার্শ্বচরিত্র কিভাবে সৃষ্টি করবেন? আপনার কেন্দ্রীয় চরিত্রকে (প্রয়োজনে পার্শ্বচরিত্রকেও) হতে হবে দায়িত্বসচেতন, কর্মতৎপর (active) এবং সংগ্রামী। সে সংগ্রাম করবে নিজের বিশ্বাস কার্যকর করবার জন্য; বিপদের মোকাবেলা করবার জন্য এবং প্রতিপক্ষকে নিরস্ত করবার জন্য। সে সংগ্রাম করবে প্রেমিক অথবা প্রেমিকাকে লাভ করবার জন্য। সে সংগ্রাম করবে যে-কোন প্রতিকূল অবস্থার বিরুদ্ধে। তাকে কর্মতৎপর হতে হবে এবং তার কিছু-কিছু প্রচেষ্টা দর্শককে দেখাতে হবে। তার সকল প্রচেষ্টায় সহযোগী নিশ্চয়ই থাকবে কিন্তু তাকেই দিতে হবে নেতৃত্ব।

কেন্দ্রীয় চরিত্রের সঙ্গে পার্শ্বচরিত্রের মিল অথবা অমিল থাকবে কি? অবশ্যই। মিল থাকবে কোন সমস্যার সমর্থনে অথবা বিরোধিতায়। মিল থাকবে মূল চিন্তায় এবং মূল সিদ্ধান্তে। অমিল থাকবে যথাসম্ভব পেশায়, দৃষ্টিকোণ এবং ভূমিকায়। অমিল যদি না-ই থাকল, তাহলে আলাদা চরিত্রের দরকার কি? রবীন্দ্রনাথের 'বিসর্জন নাটকে' গোবিন্দমণিক্য এবং অপর্ণা উভয় চরিত্রই চাচ্ছে, 'বলিপ্রথা' বন্ধ হোক। কিন্তু এ দুজনের সিদ্ধান্ত এবং দৃষ্টিকোণে আছে মৌলিক তফাত। অপর্ণা রাজার কাছে ছুটে এসেছিল তার ছাগশিশুর জন্য। অন্যদিকে গোবিন্দমাণিক্য সিদ্ধান্ত নিয়েছেন বলিপ্রথার নিষ্ঠুরতা উপলব্ধি করে। শেক্সপিয়ারের ম্যাকবেথ নাটকে ম্যাকবেথের ভূমিকা ছিল নিষ্ঠুর, দয়ামায়াহীন, উচ্চাকাঙ্ক্ষী চরিত্রের প্রতিনিধিত্ব করা। লেডী ম্যাকবেথের ভূমিকা ছিল ম্যাকবেথকে অনুপ্রাণিত করা ও অন্তর্দ্বন্দ্বের কারণে হত্যাকাণ্ড থেকে পিছিয়ে আসা ম্যাকবেথকে সাহস যোগানো। বিসর্জন নাটকে জয়সিংহের ভূমিকা গোবিন্দমাণিক্য অথবা রঘুপতি থেকে আলাদা ছিল। তাকে একদিকে টানছিল রঘুপতি অন্যদিকে গোবিন্দমাণিক্য অর্থাৎ, একদিকে টানছিল বলিপ্রথা অন্যদিকে প্রেম ও মানবতা। তার কাজ ছিল প্রথমত, এ দুয়ের টানাপোড়েনে ক্ষতবিক্ষত হওয়া। অবশেষে আত্মবিসর্জন করা।

প্রসঙ্গত বলা প্রয়োজন, কোন্ কোন্ চরিত্র আপনার নাটকে থাকবে অথবা কোন্ কোন্ চরিত্র থাকবে না এ সিদ্ধান্ত আপনাকেই গ্রহণ করতে হবে। বায়ান্নর ভাষা-আন্দোলন-ভিত্তিক নাটকে অলি আহাদ, তোয়াহা, তাজউদ্দীনের পরিবারসমূহের বিভিন্ন চরিত্রের দরকার আছে বলে মনে হয় না। প্রয়োজনে শহীদ আবুল বরকত

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

অথবা অন্যকোন ভাষা শহীদের মায়ের চরিত্র অথবা পারিবারিক পরিবেশ আঁকা যেতে পারে— আপনি যদি শহীদ পরিবারের প্রতিক্রিয়া দেখিয়ে দর্শকদের সহানুভূতি পেতে চান। নাটকে কোন দেব-দেবী চরিত্র থাকতে পারবে কি? এটা নির্ভর করছে মূলত আপনার বিষয়ের ওপর। আপনি যদি পৌরাণিক কোন বিষয় নিয়ে নাটক লেখেন, তাহলে দেব-দেবী চরিত্র নিশ্চয়ই থাকতে পারে। এ ক্ষেত্রে আপনাকে মনে রাখতে হবে, রূপক-সাঙ্কেতিক নাটক ব্যতীত অন্যনাটকে দেব-দেবীদের স্থান বর্তমান যুগে খুব একটা নেই।

আপনার চরিত্র কি গান গাইতে অথবা নাচতে পারবে? গান গাইলে অথবা নাচলে কি উন্নমানের চরিত্র হবে না? এ সব ধারণার কোন মানে নেই। আপনার চরিত্র অবশ্যই গান গাইতে পারবে যদি সে সঙ্গীতসাধক অথবা সঙ্গীতের ভক্ত হয়। তবে নায়ক-নায়িকা মানেই গায়ক-গায়িকা-এ ধরনের বাণিজ্যিক বিশ্বাস নিঃসন্দেহে নাটকের জন্য ক্ষতিকর।

প্রেমের নাটকে মাঝে মাঝে দেখা যায়, নায়িকাকে ঘিরে আছে আট-দশজন সহচরী। তারা প্রিয়সঙ্গীর কাছে জানতে চাচ্ছে প্রেমের অগ্রগতি, নায়কের অবস্থান, প্রেমিক সম্পর্কে তার অনুভূতি ইত্যাদি ইত্যাদি। তারপর অকারণে হেসে লুটিয়ে পড়ছে। একটি বা দুটি দৃশ্যের জন্য এ ধরনের সখী চরিত্র অপ্রয়োজনীয়। তবে এ-কথাও ঠিক, দশ জন কেন বিশ জন সখীও আপনি আনতে পারেন, যদি অন্যান্য দৃশ্যেও এসব সখীর আলাদা আলাদা করণীয় থাকে। এ বক্তব্য যে-কোন পার্শ্বচরিত্র সম্পর্কেও সমভাবে প্রযোজ্য। ঘটনা-সংযোজনের জন্য যেমন কার্যকরণ সূত্র থাকে; চরিত্র সংযোজনের জন্যও তেমনি থাকতে হবে কার্যকারণসূত্র। আপনার কাহিনীকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য প্রত্যেক চরিত্রকেই পালন করতে হবে কম-বেশি ভূমিকা।

০৭. এ্যাকশন/নাট্যক্রিয়া

এ্যাকশনের বাংলা প্রতিশব্দ নাট্যক্রিয়া/ক্রিয়া। এ্যাকশন বুঝতে হলে, আপনাকে যেতে হবে মহান অ্যারিস্টটলের কাছে। তিনি ট্র্যাজেডি তথা নাটককে বলেছেন, অনুকরণ, জীবনের অনুকরণ, এ্যাকশনের অনুকরণ (imitation of an action)। বলেছেন, নাটককে বর্ণনামূলক আঙ্গিকে নয়, এ্যাকশনের আঙ্গিকে উপস্থাপন করতে হবে (in the form of action, not of narrative)। হেক্টর অথবা একিলিসের সংগ্রাম, তাদের বীরত্ব মহাকাব্যের মতো বর্ণনার মাধ্যমে প্রকাশ করলে হবে না, নাটকীয়ভাবে উপস্থাপন করতে হবে। চরিত্রদের এমনভাবে উপস্থাপন করতে হবে, দেখে মনে হবে যেন তারা বেঁচে আছে এবং আমাদের সামনে চলাফেরা করছে (He may present all his characters as living and moving before us)

নাট্যক্রিয়া বা "ক্রিয়া বলতে শুধু শারীরিক আচরণ বা পরিস্থিতি সৃষ্টির ক্ষমতা বা পরিবেশকে স্বনিয়ন্ত্রণে আনার ক্ষমতাই বোঝায় না, মনন,অনুভবন এমন কি মননশক্তির, অনুভবশক্তির— অভাবজনিত জড়তা ও চরিত্রের আচরণ তথা ক্রিয়া হতে পারে। ক্রিয়া বলতে নাটকীয় পাত্রপাত্রীর আচরণ বোঝায়...। ...চরিত্র উদ্যোগী হতে পারে, আবার নিশ্চেষ্টও থাকতে পারে, কোথাও দুঃখ দিতে পারে, কোথাও দুঃখ বুক পেতে নিতেও পারে; কোথাও বাধার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে পারে, কোথাও বা মর্মাহত

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

হয়ে সমস্ত চেষ্টা ছেড়ে দিয়ে দারুণ অভিমানে আত্মপীড়নের পথ বেছে নিতে পারে" (সাধনকুমার ভট্টাচার্য, নাট্যতত্ত্ব মীমাংসা পৃ. ৩৪৩-৪৪)। কোন চরিত্র নিশ্চেষ্ট থাকলেই নাট্যক্রিয়াহীন বা নিষ্ক্রিয় হয় না। শেক্সপিয়ারের লিয়ার "নিশ্চেষ্ট হতে পারেন— কোন লক্ষ্যে পৌঁছানো জন্য তিনি চেষ্টা না করতে পারেন কিন্তু তিনি নিষ্ক্রিয় নন, কারণ তার মানসিক বিক্ষোভ ও আর্তনাদ যে কোন শারীরিক ক্রিয়ার চেয়ে বেশি চিত্তাকর্ষক, বেশি জোরালো ক্রিয়া (সাধনকুমার ভট্টাচার্য, পৃ. ৩৪৪)।

এ্যাকশন বা নাট্যক্রিয়া সৃষ্টি করতে হলে, আপনার মূল দায়িত্ব হবে চরিত্রকে তার কাজ এবং আচরণের মাধ্যমে উপস্থাপন করা। ধরা যাক, বায়ান্নর ভাষা-আন্দোলন নিয়ে আপনি একটি নাটক লিখছেন। আপনার কেন্দ্রীয় চরিত্র তাজউদ্দীন অথবা মোহাম্মদ তোয়াহা যথার্থ সংগ্রামী। তৃতীয় কোন চরিত্রের মুখ দিয়ে তাঁদের সংগ্রামের বর্ণনা করলে চলবে না। বর্ণনার বদলে আপনাকে দেখাতে হবে, আপনার কেন্দ্রীয় চরিত্র সাথী-বন্ধুদের নিয়ে ভাষা-সংগ্রাম পরিষদ গঠন করছে; ১৪৪ ধারা ভাঙার পরিকল্পনা করছে এবং পরবর্তী কোন এক দৃশ্যে ১৪৪ ধারা ভেঙে এগিয়ে যাচ্ছে। দর্শক এসব আচরণ দেখলেই বুঝবেন, কেন্দ্রীয় চরিত্র যথার্থ সংগ্রামী।

আমি রেগে গেছি। রাগলে আমার মাথা ঠিক থাকে না— এ ধরনের সংলাপ যথাসম্ভব পরিহার করা ভালো। ভাত খেতে খেতে কোন চরিত্র হঠাৎ যদি পানির গ্লাস ছুঁড়ে মারে অথবা ভেঙে ফেলে, কেউ না বললেও তার আচরণ থেকে বোঝা যাবে সে রেগে গেছে।

এ্যাকশন সৃষ্টির অন্যতম কৌশল হচ্ছে 'আকস্মিকতা'। ইউরিপিদিসের 'হেলেন' সতেরো বছর ধরে মিসের রাজপ্রাসাদে বন্দি। তার স্বামী কোথায় আছে সে জানে না। সে ধরে নিয়েছে স্বামীর সাথে আর কোনদিন দেখা হবেনা। হঠাৎ একদিন দেখা গেল, সামুদ্রিক ঝড়ে বিধ্বস্ত মেনেলাস (হেলেনের স্বামী) মিসরের রাজপ্রাসাদে আশ্রয়প্রার্থী। এ ধরনের আকস্মিকতায় এক ধরনের 'এ্যাকশন' সৃষ্ট হয় এবং এতে নাটকে আসে গতি।

আকস্মিক ও অপ্রত্যাশিত সংলাপের মাধ্যমেও সৃষ্ট হতে পারে, চমৎকার এ্যাকশন। দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের 'শাজাহান' নাটকের একটি দৃশ্য এখানে স্মরণ করা যেতে পারে।

শাজাহান ॥ জাহানারা।
জাহানারা ॥ বাবা।
শাজাহান ॥ তোকে আশীর্বাদ করি—
জাহানারা ॥ কী বাবা?
শাজাহান ॥ যেন তোর পুত্র না হয়, শত্রুরও যেন পুত্র না হয়।

চতুর্থ অঙ্ক, পঞ্চম দৃশ্য

এখানে আমাদের প্রত্যাশা ধাক্কা খেল। এসব ক্ষেত্রে সাধারণত আশীর্বাদ করা হয়, শুভ অথবা মঙ্গলজনক কিছু লাভের জন্য— পুত্রসন্তান লাভের জন্য ইত্যাদি। আমাদের প্রত্যাশাকে ধাক্কা দিয়ে আশীর্বাদ করা হলো, পুত্রসন্তান না হবার জন্য। এ অপ্রত্যাশিত সংলাপে সম্রাট সাজাহানের মানসিক যন্ত্রণা এবং মনস্তত্ত্ব প্রকাশিত হলো বলে, নাটকে এলো অভিনব গতি। এ ধরনের আরেকটি উদাহরণ নেয়া যায় 'যুদ্ধ এবং যুদ্ধ' নাটক থেকে। রাজাকার সবুরের পরামর্শে ক্যান্টনমেন্টে বন্দি স্বামীকে মুক্ত

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

করতে জিনাত মহল গিয়েছে কর্নেলের কাছে। জিনাত ফিরে এলো। তারপর তাদের সংলাপ এ রকম :

সবুর ॥ কর্নেল কিছু করেছে? [জিনাত অবাক হয়ে তার দিকে তাকায়]। নিশ্চয়ই সে কিছু করেছে, জিনাত।

জিনাত ॥ হাঁ, করেছে।

সবুর ॥ কী? ...করেছে।

পরের সংলাপে সবুর এবং দর্শক আশা করছে, সুন্দরী জিনাত মহল বলবে, কর্নেল তাকে ধর্ষণ করেছে। কিন্তু জিনাত তা বলে না। অন্তত সবুর এবং দর্শক যেভাবে আশা করে সেভাবে বলে না। জিনাত বলে :

হ্যাঁ, সে তোমার মাকে ধর্ষণ করেছে, তোমার বোনকে ধর্ষণ করেছে, তোমার স্ত্রীকে ধর্ষণ করেছে, তোমার ভাইকে হত্যা করেছে, তোমার বাবাকে সে খুন করে ভাগাড়ে ফেলে রেখে গেছে; তোমার বাড়িতে আগুন দিয়েছে, তোমার সন্তানকে বুটের তলায় পিষে মেরেছে, আর কি জানতে চাও তুমি, আর কি করেছে?

এ ধরনের উচ্চারণে সংলাপের মাত্রা পাল্টে যায়। প্রত্যাশার বাইরে নতুন চেতনা এসে দর্শককে ধাক্কা দেয়। দর্শককে এক মানসিক স্তর থেকে অন্যস্তরে নিয়ে যায়। অন্যদিকে সংলাপের চমক নাটকে এনে দেয় গতি।

অভিনয় শিল্পীদের নড়াচড়া বা মুভমেন্টেও সৃষ্ট হয় এ্যাকশন। এ নড়াচড়ার সুযোগ কিন্তু নাট্যকারকেই করে দিতে হবে। ধরা যাক, আপনার কেন্দ্রীয় চরিত্র সম্মুখ মঞ্চে বসে কিছু একটা পড়ছে। পেছনের মঞ্চে হঠাৎ বেজে উঠতে পারে টেলিফোন। সে ছুটে যাবে টেলিফোনের কাছে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আলাপ করবে। জরুরি আলাপ। হঠাৎ ভিন্ন প্রান্ত থেকে কেউ একজন তাকে ডাকতে পারে। সে রিসিভার হাতে করেই এগিয়ে আসতে পারে দেখবার জন্য।

অভিনয়শিল্পীর হাত, মুখ, চোখের ভঙ্গি বদলাবার সুযোগ থাকলেও এ্যাকশন সৃষ্ট হতে পারে। কোথায় যেন পড়েছিলাম, কোন বিদ্রোহী চরিত্র হঠাৎ যদি হাঁটুগেড়ে আত্মসমর্পন করে, তাহলেও সৃষ্ট হয় এ্যাকশন।

'নীরবতা' কি কোন 'এ্যাকশনে'র জন্ম দিতে পারে? ধরা যাক, এ'রকম একটি দৃশ্য। মঞ্চে কয়েকজন চরিত্রের আনন্দোল্লাস চলছে। হঠাৎ রিং রিং বেজে উঠল টেলিফোন। একজন চরিত্র ফোনে কথা ব'লে নিশ্চুপ হয়ে গেল। পড়তে পড়তে পাশের চেয়ারে বসে পড়ল। সবাই জানতে চাচ্ছে, ব্যাপার কী— কেউ মারা গেছে কিনা। চরিত্রটি কিছুই বলছে না। তার নিশ্চুপ হয়ে যাওয়া এবং নীরবতার ফলে সৃষ্ট হতে পারে বিশেষ ধরনের এ্যাকশন।

কণ্ঠস্বরের ওঠা-নামার সুযোগ থাকলেও এ্যাকশন সৃষ্ট হতে পারে। তবে কণ্ঠস্বরের ওঠা-নামা নান্দনিকতার সীমা লঙ্ঘন করলে 'চিৎকারে' পরিণত হবে। এর ফলে নাটকের গতির বদলে ক্ষতির সম্ভাবনা থাকবে বেশি।

"শেক্সপিয়ারের নাটকে নাট্যক্রিয়া (এ্যাকশন) প্রধানত বহির্মুখী, কিন্তু বার্নার্ড শ' কিংবা গলসওয়ার্দীর নাটকে কিংবা ব্রেশট বা এলিয়টের নাটকে নাট্যক্রিয়া বহির্মুখী নয়। সাঙ্কেতিক বা সমস্যামূলক নাটকে নাট্যক্রিয়া প্রধানতই অন্তর্মুখী। নাট্যক্রিয়া বহির্মুখী বা অন্তর্মুখী যাই হোক, নাটক্রিয়ার গতি থাকা চাই। সেই ঘটনাই নাটকীয় যা সঙ্কট সৃষ্টি করে আর সেই চরিত্রই নাটকীয় যার বহির্মুখী ক্রিয়াকলাপ থাক বা না থাক,

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

মানসিক ক্রিয়ার একটা পরিবর্তনশীল রূপ অন্তত আছে। রবীন্দ্রনাথের 'চিত্রাঙ্গদা' নাটকে চিত্রাঙ্গদা যে মুহূর্তে সৌন্দর্যে অভিষিক্ত হয়েছে সেই মুহূর্তেই তার অর্জুনকে প্রবঞ্চিত করার বিবেক-দংশন, আত্মবঞ্চনা এবং সৌন্দর্য অন্তর্নিহিত হওয়ার পরেকার প্রত্যাখ্যানের আশঙ্কার যে ছবি আমরা পাই তার অধিকাংশই অন্তর্মুখী নাট্যক্রিয়া, অর্জুনকে আহ্বান করার ক্রিয়াটুকুই কেবল তার বর্হিমুখী (উজ্জ্বলকুমার মজুমদার, *সাহিত্যের রূপ-রীতি*, পৃ. ১০৬)।

০৮. সাসপেন্স/ টেনশন/উৎকণ্ঠা

জিনাত মহল তার বড় জা রাবেয়াকে একটি কথা বলেছে। ছোট্ট একটি কথা। ছোট্ট একটি সিদ্ধান্ত। কী কথা? কী সে কথা? 'যুদ্ধ এবং যুদ্ধ' নাটকের দুই ব্যক্তির মতো রহমতুল্লাহ জানতে চায় কী সে কথা? সেলিমুল্লাহ জানতে চায় কী সেকথা এবং দর্শকও জানতে চায় কী সে কথা? জিনাত মহল শুধু বলেছে, এ বাড়িতে আর থাকব না। কোথায় যাবে সে? কেন যাবে?

রহমত ॥ ভাইয়ের কাছে যাবা?
জিনাত ॥ না।
রহমত ॥ বিদেশে?
জিনাত ॥ না।
রহমত ॥ ঢাকাতেই থাকবা?
জিনাত ॥ জ্বী।
রহমত ॥ ভাইয়ের কাছে যাবা না, আমার কাছে থাকবা না। ঢাকায় আর কোথায় থাকবা তুমি? বাসা ভাড়া করবা?
জিনাত ॥ জ্বী না।
রহমত ॥ না? তাহলে? মানুষ জিগ্যেস করলে আমি তবে কি উত্তর দেব, বৌমা? তুমি তো অবুঝ না। তুমি নিজে হইলে কলেজের প্রফেসর, তুমি কও, কি আমি তাদের বলব?
জিনাত ॥ কেউ আপনেরে কিছু জিগ্যেস করবে না দাদা।

জিনাতের কাছ থেকে উত্তর পাওয়া গেল না, রহমত এবং দর্শক উৎকণ্ঠিত— জিনাতের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে। জিনাত কোথায় যাবে— এ কথা রহমতকে জানতে হবে এবং সে সাথে দর্শককেও। দর্শকের এই উৎকণ্ঠাই 'সাসপেন্স'। নাটক লিখতে হলে আপনাকে এই সাসপেন্স সৃষ্টি করতে হবে। দর্শক অধীর আগ্রহে জানতে চাইবে— তারপর? তারপর কী হল? কী হবে?

সৈয়দ শামসুল হক কতক্ষণ ধরে রাখতে পেরেছেন, এ 'সাসপেন্স' অর্থাৎ, দর্শকদের উৎকণ্ঠা? বলা যায়, প্রায় শেষ পর্যন্ত। মাঝখানে অনেক ঘটনা ঘটে গেছে। কিন্তু তিনি দর্শকদের বসিয়ে রেখেছেন, উত্তর না দিয়ে। নাটক অনেক দূর এগিয়ে যাবার পরও জিনাত মহল এবং দেবর সেলিমের সংলাপ এর রকম :

সেলিম ॥ কোথায় গিয়েছিলে?
জিনাত ॥ জাহান্নামে।
সেলিম ॥ ফাজলামো কোরো না... কোথায় তুমি যেতে চাও শুনি, বাড়ি ছেড়ে?
জিনাত ॥

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

সেলিম ॥ আবার?

জিনাত ॥ বললাম তো, জাহান্নামে। কেন জায়গাটা খারাপ?

নাটকে 'জাহান্নাম' প্রসঙ্গ আরো কিছুক্ষণ চলতে থাকে প্রতীকী ব্যঞ্জনাসহ। সেলিম উত্তর পেল না। অর্থাৎ, এখনো 'সাসপেন্স' বজায় থাকল। মাঝখানে আরো কিছু ঘটনা ঘটল। সৈয়দ হক দর্শকদের বসিয়ে রাখলেন। অনেক পরে দর্শক জানতে পেল, জিনাত মহল বিয়ে করছে এবং রাজাকার সবুরকেই বিয়ে করছে। একজন রাজাকারকে বিয়ে করছে কেন? আবারো 'সাসপেন্স' এবং উৎকণ্ঠার অবসানের মাধ্যমেই নাটকের সমাপ্তি।

আপনাকে এ 'সাসপেন্স' তৈরি করতে হবে। প্রয়োজনে একাধিক 'সাসপেন্স'। ইউরিপিদিসের হেলেন নাটকে কমপক্ষে দুটি 'সাসপেন্স' আছে :

০১. বন্দি হেলেনের সাথে তার স্বামী মেনেলসের আর কখনো কি দেখা হবে?

০২. মেনেলস ঘটনাচক্রে মিসরের রাজপ্রাসাদে এলো। তারা পালাতে পারবে তো?

ইচ্ছে করলে, নাটকের প্রথম সংলাপেই আপনি 'সাসপেন্স' সৃষ্টি করতে পারেন :

পিতা ॥ এ বিয়ে হবে না।

মা ॥ এ বিয়ে হবেই।

আপনার দায়িত্ব দর্শককে উৎকণ্ঠিত করা। আপনি 'সাসপেন্স' তৈরি করতে পারলে, দর্শক জানবার জন্য বসে থাকবে— কার সাথে কার বিয়ে হবে না— কেন হবে না— বিয়ে হল কি হল না ইত্যাদি জানবার জন্য।

চলচ্চিত্র, টিভি এমন কি মঞ্চে সাসপেন্স সৃষ্টির একটি কৌশল বহুব্যবহৃত। কৌশলটি জেনে রাখা ভাল;

চোর পালাচ্ছে। পুলিশ তার পেছনে। দর্শক চাচ্ছে চোর ধরা পড়ুক। কিন্তু ধরা পড়ছে না। চোর লুকাল একটি বড় গাছের আড়ালে। পুলিশ এলো গাছের কাছে। ভালভাবে গাছের দিকে না তাকিয়ে গেল এগিয়ে সামনের দিকে।

এখানে যতক্ষণ চোর ধরা না পড়বে, ততক্ষণ বজায় থাকবে 'সাসপেন্স'।

০৯. দৃশ্য-পরিকল্পনা : কয়েকটি কৌশল

প্রবীণ নাট্যকারকে নাটকের পাণ্ডুলিপি শোনাতে এসেছে নবীন নাট্যকার। প্রবীণ নাট্যকার জানতে চাইলেন, নাটকের বিষয়, সমস্যা এবং বক্তব্য। জানতে চাইলেন, নাটকের প্রারম্ভ ও পরিণতি। নবীন নাট্যকার একটু লজ্জা পেয়ে বলল, পুরো নাটক এখনো লিখতে পারি নি। প্রবীণ বললেন, নাই বা লিখলে কিন্তু 'পরিণতি' নিয়ে কি ভেবেছ? দ্বন্দ্বের 'সমাধান' কীভাবে হবে? নবীন বলল ও সবতো ভাবি নি। প্রবীণ ঠাণ্ডা মাথায় বললেন, প্রথম দৃশ্য লিখতে বসবার আগে নাটকের শেষ দৃশ্য আগেভাগেই তোমাকে ভেবে নিতে হবে। এমন কি কোন্ দৃশ্যের পর কোন্ দৃশ্য আসবে যথাসম্ভব তাও তোমাকে ভাবতে হবে। মনে মনে অথবা লিখিতভাবে একটা কাঠামো দাঁড় করাতে হবে।

শেক্সপিয়ার অথবা শ্রেষ্ঠ নাট্যকারগণ কি এসব নিয়ে ভাবতেন? উদাহরণ হিসেবে নেয়া যাক, শেক্সপিয়ারের ম্যাকবেথ নাটকটি। দৃশ্য-পরিকল্পনা বুঝতে হলে সংক্ষিপ্ত কাহিনী/বিষয়বস্তুও জানা দরকার :

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

স্কটল্যান্ডে ডানকান নামে এক রাজা ছিলেন। তাঁর ছিল দুই ছেলে— ম্যালকম ও ডনালবেন। রাজার সেনাবাহিনীতে ছিল ম্যাকবেথ ও ব্যাঙ্কো নামের দুই জেনারেল। ম্যাকবেথ রাজাকে হত্যা করে সিংহাসনে আরোহণ করেন। তারপর সম্ভাব্য প্রতিদ্বন্দ্বীদের সরাবার উদ্দেশ্যে প্রথমে ব্যাঙ্কোকে এবং পরে ম্যাকডাফের স্ত্রী ও শিশুপুত্রকে হত্যা করেন।

ম্যাকবেথ শেষ রক্ষা করতে পারেন নি। ম্যালকম ও অন্যান্যকে নিয়ে ম্যাকডাফ, ম্যাকবেথকে পরাজিত ও হত্যা করেন। ডানকানের ছেলে ম্যালকম সিংহাসন ফিরে পায়।

ম্যাকবেথ নাটকের প্রথম অঙ্ক বিশ্লেষণ করলে আমরা দেখতে পাব, এ অঙ্কেই শেক্সপিয়ার প্রদান করেছেন অনেক ইঙ্গিত। দেখতে পাব, তার অনেক ঘটনা/দৃশ্যই সুপরিকল্পিত। যেমন :

০১. ম্যাকবেথ দ্বিতীয় অঙ্কে ডানকানকে হত্যা ক'রে রাজা হবেন। কিন্তু তার আগে ম্যাকবেথের মনে উচ্চাশা জাগাতে হবে; রাজা হবার সম্ভাবনা তৈরি করতে হবে এবং সর্বোপারি রাজাকে হত্যা করবার সুযোগ এনে দিতে হবে। শেক্সপিয়ার এ কাজগুলো করলেন এভাবে—

ক. প্রথম অঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্যে রাজা ডানকান ঘোষণা করলেন, কডরের শাসনকর্তাকে মৃত্যুদণ্ড প্রদান করা হোক এবং ম্যাকবেথকে কডরের শাসনকর্তা হিসেবে বরণ করা হোক : Go pronounce his present death, And with his former title greet Macbeth.

খ. প্রথম অঙ্কের তৃতীয় দৃশ্যে বিদ্রোহ-দমনকারী ম্যাকবেথের সাথে দেখা হলো তিনজন ডাকিনীর। প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় ডাকিনী তাকে যথাক্রমে গ্লামিস ও কডরের অধিপতি এবং দেশের পরবর্তী রাজা হিসেবে অভিবাদন জানাল। ম্যাকবেথের মধ্যে আশা-নিরাশার দোলা শুরু হলো, যদিও সে মুখে বলল,
'রাজা হবার ব্যাপারটি বিশ্বাসের ধারে-কাছে ঘেষতে পারছে না।'
[and to be king stands not within the prospect of belief.]

গ. একই দৃশ্যে কিছুক্ষণ পরই 'রস' এসে বলল— তোমাকে অভিবাদন, কডরের শাসনকর্তা। বিস্মিত ম্যাকবেথের প্রতিক্রিয়া ছিল নিম্নরূপ :
'কডরের শাসনকর্তা তো এখনো জীবিত।
আমাকে তোমরা ধার করা পোষাক পরাচ্ছ কেন?'
[The Thane of Cawdor lives; why do you dress me in borrowed robes?]

যেহেতু ডানকানকে হত্যা না করে ম্যাকবেথের পক্ষে রাজা হওয়া সম্ভব নয়, সেহেতু তার মনের মধ্যে প্রবল উচ্চাকাঙ্ক্ষা জাগানো হলো। এমন হতে পারে যে, বিদ্রোহ-দমনের পরই তার মধ্যে উচ্চাশা জেগেছে, তারপর ডাকিনীদের ভবিষ্যদ্বাণী ও 'রস'-এর অভিবাদনের পর সে উচ্চাশা আরো দৃঢ় হয়েছে। অথবা এমন হতে পারে যে, 'রস'-এর অভিবাদনের পর ম্যাকবেথের প্রবল উচ্চাশা জাগবে। এ রকম পরিকল্পনা করে, শেক্সপিয়ার আগের দৃশ্যসমূহে (বিশেষ করে ডাকিনীদের মাধ্যমে) উচ্চাশার বীজ-বপনের কৌশল অবলম্বন করেছিলেন। আবার এও হতে পারে, ডাকিনীদের মাধ্যমে শেক্সপিয়ার ম্যাকবেথের গোপন উচ্চাশার প্রতীকী রূপায়ণ করেছিলেন। কৌশল যাই হোক না কেন, ফলশ্রুতিতে আমরা দেখেছি, ম্যাকবেথের

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

মনে প্রবল উচ্চাশা জেগেছে :

ম্যাকবেথ (স্বগত) : গ্লামিস অধিপতি! কডর অধিপতি!
সর্বশ্রেষ্ঠ পদটি এখনও অনেক দূরে
[Aside] Glamis, and Thane of Cawdor!
The greatest is behind]

০২. ডানকানকে হত্যা করতে হবে। অবিলম্বে।
নিজের ছেলেদেরকে প্রিন্স অব কামবারল্যান্ড (যুবরাজ) এবং ম্যাকবেথের বাড়িতে ডানকানের অতিথি হবার ঘোষণার মাধ্যমে শেক্সপিয়ার রাজা-হত্যার পথটি প্রশস্ত করলেন।

০৩. শেক্সপিয়ার জানেন, ম্যাকবেথের পতন হবে অর্থাৎ, তিনি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন, নিষ্ঠুর উচ্চাশার ধ্বংস দেখাবেন। প্রথম অঙ্কে একাধিক বার ম্যাকবেথের পরিণতির ইঙ্গিত প্রদান করা হয়েছে :

ক. ডাকিনীদের প্রথম ভবিষ্যদ্বাণীর সময় ম্যাকবেথের সঙ্গে ছিল ব্যাঙ্কো। ম্যাকবেথের রাজা হবার ভবিষ্যদ্বাণী শুনে কৌতূহলী ব্যাঙ্কো তার সম্পর্কে কিছু জানতে চাইলে, জবাব ছিল নিম্নরূপ :
"প্রথম ডাকিনী। ম্যাকবেথের চাইতে কিছু কম এবং মহত্তর।
দ্বিতীয় ডাকিনী। খুব সুখী নয়, অথচ অনেক বেশি সুখী।
তৃতীয় ডাকিনী। আপনার বংশে রাজা হবে, যদিও আপনি কিছুই হবেন না।"

খ. প্রথম অঙ্কের তৃতীয় দৃশ্যে ম্যাকবেথ বলে 'আমাকে তোমরা ধার করা পোষাক পরাচ্ছো কেন? পরে ব্যাঙ্কোর সাথে আলাপ প্রসঙ্গে দুবার শোনা যায়, তার স্বগত উচ্চারণ :
(স্বগত) দুই ভবিষ্যৎ বাণী সত্যে পরিণত, রাজ-অভিনয়ে সুন্দর সূচনা গান যেন
(গিরীশ ঘোষের অনুবাদ)
(স্বগত)... ভবিষ্যতের ভয়ানক দৃশ্যাবলীর কাছে আজকের ভয় কিছুই নয়।
[Present fears are less than horrible imaginings.]

প্রথমত, ডাকিনীদের মাধ্যমে শেক্সপিয়ার ইঙ্গিত দিলেন, ব্যাঙ্কোর বংশধর রাজা হবে। একথার মানে দাঁড়ায়, ম্যাকবেথের রাজ-বংশ দীর্ঘস্থায়ী হবে না। দ্বিতীয়ত, 'ধার করা পোশাক', 'রাজ-অভিনয়' এবং 'ভবিষ্যতের ভয়ানক দৃশ্যাবলী' ইত্যাকার শব্দাবলির মাধ্যমে শেক্সপিয়ার প্রথম অঙ্কেই ইঙ্গিত প্রদান করলেন— ম্যাকবেথ হয়তো টিকে থাকতে পারবে না।

০৪. ডানকানকে হত্যা করে সিংহাসনে আরোহণের পর ম্যাকবেথ কি নির্বিবাদে দেশ শাসন করতে পারবে? যদি তা'না হয়, কার কার সাথে তার দ্বন্দ্ব-সংঘাত হবে? শেক্সপিয়ার প্রথম অঙ্কে ম্যাকবেথের সম্ভাব্য প্রতিদ্বন্দ্বীর ইঙ্গিত দিয়েছেন এভাবে :

ক. ব্যাঙ্কোর প্রতি ডাকিনীর সংলাপের মাধ্যমে 'আপনার বংশে রাজা হবে, যদিও আপনি কিছুই হবেন না।'

খ. ম্যালকমকে যুবরাজ হিসেবে ঘোষণার পর ম্যাকবেথের 'স্বগত' সংলাপের মাধ্যমে :
প্রিন্স অব কাম্বারল্যান্ড?
আমার পথের কাঁটা। হয় আমি এ কাঁটা উপড়ে ফেলবো, নয়তো আমার পতন হবে।
[(Aside) The prince of Cumberland!

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

That is a step,
On which I must fall down, or else o'er-leap,
For in my way it lies]

এ সংলাপসমূহ থেকে সহজে বোঝা যায়, একদিকে ব্যাঙ্কো এবং তার সন্তানেরা, অন্যদিকে যুবরাজ ম্যালকম হবে ম্যাকবেথের সম্ভাব্য প্রতিদ্বন্দ্বী। অর্থাৎ, ম্যাকবেথের 'দ্বন্দ্ব' হবে ব্যাঙ্কো, ম্যালকম প্রমুখের সঙ্গে।

০৫. আসলে প্রথম অঙ্কসহ 'ম্যাকবেথের' সকল অঙ্ক, সকল দৃশ্য সুপরিকল্পিত। সব দৃশ্যের বিশ্লেষণে না গিয়ে, আমরা এ নাটকের সার্বিক ইঙ্গিত এবং পরিবেশ-নির্মাণের কিছু কৌশল বিশ্লেষণ করে দেখতে পারি। সার্বিক ইঙ্গিত হচ্ছে, এ নাটকের ঘটনাবলিতে foul and fair-এর মধ্যে কোন বাছ-বিচার থাকবে না; এ নাটকে চলবে অন্ধকারের রাজত্ব; চলবে রক্তের খেলা।

ফলে ম্যাকবেথ নাটক শুরু হয়েছে Thunder and lighting দিয়ে, three witches -এর প্রবেশ দিয়ে। সকল ডাকিনী একসঙ্গে বলে ওঠে— Fair is foul, and foul is fair। প্রথম অঙ্কের তৃতীয় দৃশ্যেও বজ্রপাত ও 'তিন ডাকিনী'। এ পরিবেশে ম্যাকবেথ এসে বলে So foul and fair a day I have not seen। প্রথম অঙ্কের চতুর্থ দৃশ্যে ম্যাকবেথ বলে—

Stars, hide your fires;
Let not light see my black and deep desires.

"তারকারাজি, তোমাদের আগুন নিভিয়ে ফেল; আলো যেন আমার সুগভীর কালো আকাঙ্ক্ষা দেখতে না পায়।" একই অঙ্কের সপ্তম দৃশ্যে নিষ্ঠুর লেডি ম্যাকবেথ 'চতুর্থ ডাকিনীর' মতো বলে ওঠে :

I have given suck, and know
How tender't is to love the babe that milks me.
I would, while it was smiling on my face,
Have pluck my nipple from his boneless gums,
And dash the brains out, had I so sworn
As you have done to this.
[আমি শিশুকে বুকের দুধ পান করিয়েছি। আমি জানি, দুধ-পানরত শিশুকে আদর করতে কত ভাল লাগে। কিন্তু আমি যদি তোমার মতো কোন প্রতিজ্ঞা করতাম, তাহলে শিশুর মুখ থেকে আমার দুধের বোঁটা সরিয়ে, সেই হাসি খুশিমুখ শিশুকে আছাড় দিয়ে তার মগজ বের করে ফেলতাম]।

পুরো নাটকে শেক্সপিয়ারের পরিবেশ-নির্মাণ-কৌশল সম্পর্কিত একটি দীর্ঘ উদ্ধৃতি এখানে সংযোজন করা যেতে পারে। "সমগ্র নাটকটিতে যেন অমারাত্রির বিভীষিকা।...নায়কের মনের পাপের অন্ধকারের সঙ্গে বহির্জগতের অন্ধকার ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে। রাত্রেই সমস্ত কিছু দুষ্কার্য সংঘটিত হয়েছে। রাত্রে ম্যাকবেথ রক্তাক্ত তরবারি দেখে আতঙ্কিত হয়েছিলেন। রাতে রাজা ডানকান নিহত হন। রাত্রের অন্ধকারে ব্যাঙ্কো গুপ্তঘাতকের হাতে প্রাণ হারিয়েছিলেন। ... ম্যাকবেথের প্রতীক বা Symbol-গুলিও মৃত্যু, ব্যাধি ও অন্ধকারকে আশ্রয় করে। পৃথিবী জ্বরে

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

কাঁপছে। চারদিকে অশান্তির ঘূর্ণি। ... রক্ত সম্পর্কিত চিত্র-কল্পগুলি অবিস্মরণীয়। দ্বিতীয় দৃশ্যে রাজদূত রক্তাক্ত কলেবর। ডানকান-হত্যার পর ম্যাকবেথের হাতে রক্তের দাগ। উত্তেজনার মুহূর্তে ম্যাকবেথ বলে উঠলেন, বিশ্বের সমস্ত সমুদ্রের জলেও এ রক্তের দাগ উঠবে না। ... লেডি ম্যাকবেথ রাজার নিদ্রিত প্রহরীদের হাত এবং শরীর রক্ত দিয়ে মাখিয়ে দিয়েছিলেন। ব্যাঙ্কোকে যে হত্যা করেছিল তার মুখেও ছিল রক্তের চিহ্ন। ব্যাঙ্কোর প্রেতাত্মা ভোজসভয় রক্তাক্ত দেহ ধারণ করে এসেছিল। লেডি ম্যাকবেথ রক্তের দাগ নিয়ে স্বামীকে উপহাস করেছিলেন। একটু জল দিয়েই দাগটা ধুয়ে মুছে ফেলা যায়। কিন্তু তা যায় নি।" (সত্যপ্রসাদ সেনগুপ্ত, *শেক্সপিয়ার*, পৃ. ২৪৪-৪৬)।

ড্রামাটিক আয়রনি : শেক্সপিয়ারের ম্যাকবেথ নাটকে রাজা ডানকান সেনাপতি ম্যাকবেথের বাড়িতে অতিথি হয়ে এলেন। ম্যাকবেথ ও তার স্ত্রী আগেই পরিকল্পনা করে রেখেছে, ডানকান বেড়াতে এলে তাকে হত্যা করা হবে। দর্শক হত্যার চক্রান্ত জানেন। ডানকান এলেন। তিনি খুব খুশি। তাঁর ভাল লাগছে এ বাড়ির পরিবেশ।

এ অঙ্কে হত্যার চক্রান্ত দর্শক জানেন কিন্তু ডানকান জানেন না। এটাই ড্রামাটিক আয়রনি।

আনন্দিত ডানকান ম্যালকমের সাথে আলাপ প্রসঙ্গে বলছেন :

> "মানুষের মুখ দেখে মনের খবর বুঝবার আর্ট কারো জানা নেই। ভদ্রলোক মনে করেই আমি তার (কডরের শাসনকর্তা) ওপর পরিপূর্ণ আস্থা স্থাপন করেছিলাম।"
>
> [There's no art
> To find the mind's construction in the face
> He was a gentleman on whom I built
> An absolute trust [Act 1, Seen 1V]

দর্শক কিন্তু জানেন, রাজা কিছুই বুঝতে পারছেন না। এটিও চমৎকার আয়রনি।

দুটি উদাহরণ থেকে আপনি নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছেন ড্রামাটিক আয়রনি সৃষ্টির কৌশল। আপনার কোন চরিত্রের পরিকল্পনা বা অন্য চরিত্র সম্পর্কে মন্তব্য দর্শক জানবে ও বুঝবে। কিন্তু সংশ্লিষ্ট সকল চরিত্র জানবেও না, বুঝবেও না— এটাই ড্রামাটিক আয়রনি। ধরা যাক, ব্রিফকেস ভর্তি টাকা নিয়ে মঞ্চের দিকে আসছে সেলিম। তাকে দেখেই করিম ও রহিম সিদ্ধান্ত গ্রহণ করল, কৌশলে তার ব্রিফকেস ছিনিয়ে নেয়া হবে। দর্শক এ পরিকল্পনা জেনে গেল। সেলিম কিছুই জানল না। মঞ্চে এলো সেলিম। তার সঙ্গে অত্যন্ত মধুর আলাপ শুরু করল করিম ও রহিম। মুগ্ধ সেলিম এক পর্যায়ে জানাল, সে হাইজ্যাকারদের ভয়ে ভীত এবং নিরাপত্তার জন্য সে করিম ও রহিমের সঙ্গ কামনা করছে। আপনি এ রকম কোন সিচুয়েশন তৈরি করতে পারলে একাধিক আয়রনি সৃষ্টি হবে।

শেক্সপিয়ারের 'ওথেলো' নাটকে ডেসডিমোনাকে হত্যা করবার জন্য চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে ওথেলো। দর্শক জানে কিন্তু ডেসডিমোনা এসবের কিছুই জানে না। সরল, নিষ্পাপ ডেসডিমোনা বলছে :

> "তুমি কি আমার শয্যায় আসবে?"
>
> [Will you come to my bed, my lord?]

এ ড্রামাটিক আয়রনির গভীর ব্যঞ্জনা অতি সহজে দর্শকের মন ছুঁয়ে যায়।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

এ' বারে ড্রামাটিক আয়রনির একটি বহুব্যবহৃত উদাহরণ নেয়া যেতে পারে। সাধারণত বাণিজ্যিক নাটকে ব্যবহৃত হলেও আপনি এ কৌশল অবলম্বনে উন্নততর নাটকের জন্য উন্নত সিচুয়েশন তৈরি করতে পারেন :

> দরোজায় ঠক্ ঠক্ শব্দ। নায়িকা দরোজা খুলল। দেখা গেল 'ভিক্ষুক দাঁড়িয়ে।' আবার ঠক্ ঠক্। আবার ভিক্ষুক। নায়িকা দরোজা বন্ধ করল। আবার ঠক্ ঠক্। দরোজায় নায়ক দাঁড়িয়ে। দর্শক দেখল। বিরক্ত নায়িকা ভিক্ষুক ভেবে দরোজার দিকে না তাকিয়ে বলল, যাও, চলে যাও, আমাকে আর জ্বালাতন করো না। বেশি বাড়াবাড়ি করলে গলাধাক্কার ব্যবস্থা হবে। নায়ক ভুল বুঝে চলে গেল।

ড্রামাটিক আয়রনির অন্যতম কৌশল চরিত্রকে ছদ্মবেশ পরানো। শেক্সপিয়ারসহ বহু নাট্যকার তাঁদের নাটকে মহিলা চরিত্রকে পুরুষের পোষাকে সাজিয়ে বহু অঘটন ঘটিয়েছেন। আধুনিক নাটকে এ রকম দৃশ্য মাঝে মাঝে দেখা যায় :

> ইউনিফর্ম পরে বাড়ি পাহারা দিচ্ছে দারোয়ান।
>
> দারোয়ানকে আচমকা ধাক্কা দিয়ে অজ্ঞান করা হলো। তারপর, তার ইউনিফর্ম পরে গেটে দাঁড়িয়ে গেল ডাকাত অথবা বিপ্লবী দলের এক সদস্য।

১০. সংলাপ

নাট্যকার হিসেবে আপনার সবচাইতে বড় দায়িত্ব সংলাপ রচনা। "আপনার বক্তব্য প্রমাণ করতে হলে দরকার সংলাপ। আপনার চরিত্রসমূহের প্রকাশ ঘটাতে দরকার সংলাপ। দ্বন্দ্বকে এগিয়ে নিতে হলে দরকার সংলাপ।" (লাজোস এগরি, পৃ. ২৩৮)। আপনি নাটকের বিষয়, সমস্যা, বক্তব্য ঠিক করে ফেলেছেন। আপনি জানেন, প্লট, দ্বন্দ্ব কিভাবে নির্মাণ করতে হয়। আপনি জানেন, চরিত্র, এ্যাকশন, সাসপেন্স ইত্যাদি সৃষ্টির কলা-কৌশল। আপনি ভেবে নিয়েছেন, কীভাবে শুরু করবেন এবং কোথায় শেষ করবেন। আপনার পরিকল্পনা, কাঠামো ইত্যাদি প্রস্তুত। এবার আপনি সংলাপ লিখতে বসুন।

আপনি জানেন, সাধারণত প্রথম অঙ্কে থাকে দ্বন্দ্বের সূচনা। পারলে প্রথম অঙ্কেই দর্শককে জানাতে হবে কার সাথে কার দ্বন্দ্ব (অর্থাৎ বিরোধ), কেন দ্বন্দ্ব ইত্যাদি। আপনি নিচে প্রদত্ত উদাহরণ থেকে সোফোক্লিসের কৌশল অনুধাবনের চেষ্টা করতে পারবেন। সোফোক্লিসের ইডিপাস নাটকের শুরুটা এ-রকম :

দৃশ্য

থিবির রাজ-প্রসাদের সামনে

[রাজপ্রাসাদের সামনে, সিঁড়ির উপর এবং স্তম্ভের চারদিকে থিবির নাগরিকেরা হাত জোড় করে বিনীত প্রার্থনা বসে আছে। মাঝ-দরজা দিয়ে পরিচরসহ ইডিপাস প্রবেশ করলেন।]

ইডিপাস ॥ ক্যাডমসের প্রাচীন গোত্রভুক্ত নাগরিক দল—তোমাদের এ অনুনয় কেন? হস্তবদ্ধ বিনীত প্রার্থনায়, বৃক্ষশাখা বা কুসুমাল্যে ধূপ-গন্ধে, নির্বিরোধ হতাশায় কোন বেদনার নিপীড়ন হতে মুক্তি কামনা কর... (আচার্যকে) আপনি প্রবীণ, এদের শ্রদ্ধেয় আচার্য, আপনি বলুন, কোন আশঙ্কায় ত্রস্ত?

আচার্য ॥ প্রভু রাজ্যাধিপ, আপনি দেখেছেন আমরা আজ সমবেত হয়েছি, যুবা-বৃদ্ধ

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

> সকলেই—চঞ্চল জীবনময় কেউবা যুবক—বয়োভারে কেউবা প্রবীণ। শুধু এখানেই নয়—বিক্রয় কেন্দ্রে, মন্দির-অঙ্গনে, নদী-তীরে সর্বত্রই নতজানু নাগরিক দল। আমাদের এ নগর চরম দুর্দশাগ্রস্ত, বন্যাবেগে মৃত্যু এসেছে, মৃত্তিকার উদ্‌গত শস্যের মধ্যে মৃত্যু। ... যাচকরূপে আজ আপনার কাছে এসেছি। আপনিই প্রথম অভিচারিণীর প্রহেলিকা থেকে আমাদের জীবন ফিরিয়ে দিয়েছিলেন।

কী কী পেলাম আমরা এখানে? কোথায় ঘটনা অনুষ্ঠিত হচ্ছে এবং সেখানে কারা বসে আছে তার বর্ণনা। পরিচরসহ ইডিপাস যে-দরোজা দিয়ে প্রবেশ করলেন, তার বর্ণনা। লেখক হিসেবে প্রাথমিক নির্দেশনাটুকু আপনাকে দিতে হবে। তারপর পেলাম ইডিপাস ও আচার্যের সংলাপ। সংলাপ থেকে জানা গেল, ওরা ক্যাড্‌মসের প্রাচীন গোত্রভুক্ত নাগরিক। জানলাম হাত জোড় করে রাজার সামনে বসবার রীতি। বৃক্ষ-শাখা, কুসুম-মাল্য ও ধূপগন্ধ থেকে জানা গেল, তাদের ধর্মীয় আচার-প্রথা। জানা গেল, তারা কোন এক বেদনার হাত থেকে মুক্তি চায়। কী সে বেদনা? নাট্যকার শুরুতেই 'সাসপেন্স' এর কৌশল ব্যবহার করলেন। আচার্যের সংলাপ থেকে জানা গেল— সর্বত্রই মৃত্যুর বিভীষিকা। সে সাথে আরো একটি তথ্য— অতীতে অভিচারিণীর প্রহেলিকা থেকে ইডিপাসই তাদের জীবন ফিরিয়ে দিয়েছিলেন।

আপনার সংলাপের মাধ্যমে চরিত্রের পরিচয়, ধর্মীয় বিশ্বাসসহ যে-কোন বিশ্বাস, আর্থ-সামাজিক সমস্যার ইঙ্গিত যথাসম্ভব তুলে ধরতে হবে। প্রথম সংলাপেই সব পরিচয় তুলে ধরতে হবে তা নয়— ধীরে ধীরে এ-কাজটি করতে হবে। এবং সে সাথে শুরুতেই পারলে সাসপেন্স এর কৌশল ব্যবহার করতে হবে।

ইডিপাস নাটক-এর (সৈয়দ আলী আহসান অনূদিত) প্রথম তেরো পৃষ্ঠার বিভিন্ন সংলাপ থেকে জানা যায়— ইডিপাস ক্রীয়নকে পাঠিয়েছিলেন পীথিয় মন্দিরে। ক্রীয়ন ফিরে এসে জানিয়েছে, এ রাজ্যের মৃত রাজা লেয়াসের হত্যাকারী তাদের দেশেই আছে। সে ব্যক্তিই এ দেশকে অপবিত্র করেছে। উত্তরে ইডিপাস জানালেন (সংক্ষিপ্ত) :

> "আর লেয়াসের হত্যাকারী যদি এখানে উপস্থিত থাকে, সেও কোনো প্রকার শঙ্কা না করে আত্মপ্রকাশ করুক। সে শুধু নির্বাসিতই হবে, আর কোনো প্রকার শুরুদণ্ড তাকে ভোগ করতে হবে না। ... (কোনো উত্তর নেই) এভাবে যদি তোমরা চুপ করে থাকো এবং শঙ্কায় আত্মগোপন কর বা হত্যাকারী বন্ধুকে আড়াল করতে চাও হবে তাকে আমার হাতে নিপীড়িত হতে হবে। ...প্রতিটি গৃহ থেকে সে অশুচি এবং ঘৃণিত বলে বিতাড়িত হবে। ... একই শাস্তি আমারও হবে, যদি আমিও জ্ঞাতসারে পাপীকে আশ্রয় দিই।"

ধরা যাক, প্রথম অঙ্ক শেষ হলো এখানে। আমরা জানতে পেলাম, একজন অশুচি ব্যক্তি এ-দেশে অবস্থান করছে। ইডিপাস তাকে খুঁজে বের করবেই। তারপর তাকে নির্বাসিত করবে। হত্যাকারীর সহযোগীরও ক্ষমা নেই।

কে সে হত্যাকারী? 'সাসপেন্স' সৃষ্ট হলো। পরবর্তীকালে জানা যাবে, ইডিপাস নিজেই ছিল হত্যাকারী এবং তাকে দেশ থেকে হতে হয়েছিল বিতাড়িত। নাট্যকার পরিণতির এ ইঙ্গিত প্রথম অঙ্কেই দিয়ে দিলেন। ড্রামাটিক আয়রনির কৌশলও ব্যবহৃত হয়েছে এ সংলাপে— "একই শাস্তি আমারও হবে, যদি আমিও জ্ঞাতসারে

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

পাপীকে আশ্রয় দিই।" ইডিপাস জানতেন না, এ-শাস্তি তার ওপরেই পড়বে। তাছাড়া, ইডিপাসের শক্তি, দৃঢ়তা ও সততার ইঙ্গিত বিভিন্ন সংলাপ থেকে পাওয়া যায়। হত্যা-রহস্য উদ্ঘাটন করে দেশকে অশুচি ব্যক্তির হাত থেকে রক্ষা করতে হলে, ইডিপাস চরিত্রের এ দৃঢ়তা ও শক্তি অত্যন্ত জরুরি।

আগে বলা হয়েছে, চরিত্র সৃষ্টি করতে হলে আপনাকে মনে রাখতে হবে, চরিত্রের কোন সিদ্ধান্ত, কাজ অথবা আচরণের পেছনে সুগোপনে কাজ করে তার আর্থ-সামাজিক অবস্থান, তার রাজনৈতিক চিন্তাধারা, তার মনস্তত্ত্ব ইত্যাদি। সংলাপের মাধ্যমে চরিত্রের মনস্তত্ত্ব প্রকাশ করা খুবই কঠিন। কিন্তু এ-কাজটি আপনাকে করতে হবে। তার আগে আপনাকে বুঝতে হবে ইডিপাস চরিত্র কেন বলে, 'আমার নাম কি? পিতৃঘাতী। আমার নাম কী? মাতার স্বামী'। আপনাকে বুঝতে হবে গিরিশ ঘোষ-সৃষ্ট 'যোগেশ' চরিত্রের মনস্তত্ত্ব এবং কেন সে বারবার বলে 'আমার সাজানো বাগান শুকিয়ে গেল'। অথবা আপনাকে বুঝতে হবে সাম্প্রতিক আবদুল্লাহ আল মামুন সৃষ্ট বাক্কা মিয়া কেন বারবার বলে "দে আমারে চা দে, টোস-বিস্কুট দে, আমি চায়ের মধ্যে চুবাইয়া চুবাইয়া খামু" (এখনও ক্রীতদাস)।

এবারে সংলাপের মাধ্যমে চরিত্রের মনস্তত্ত্ব, যন্ত্রণা ইত্যাদি প্রকাশের চেষ্টা আপনি চালাতে পারেন। ধরা যাক, আপনার নাটকের অন্যতম কেন্দ্রীয় চরিত্র, পুত্র-সন্তানদের অকৃতজ্ঞতার কারণে দারুণ মানসিক যন্ত্রণায় আছে। এক সন্তান-সম্ভবা নারী এল তার কাছে দোয়া-আশীর্বাদ চাইতে। আপনি চাচ্ছেন, অকৃতজ্ঞতাজনিত যন্ত্রণা সংলাপে প্রকাশিত হোক। এক্ষেত্রে আপনার কেন্দ্রীয় চরিত্র বলতে পারে :

০১. হে নারী, আজ তুমি আমার দোয়া চাচ্ছ, একদিন তুমি হয়তো আফসোস করবে।

০২. মানুষ যদি জানত তাহলে হয়তো আঁতুড় ঘরেই মেরে ফেলতো তার সন্তানদের।

০৩. হায় রে, আমার স্ত্রী যদি বন্ধ্যা হতো।

কেন্দ্রীয় চরিত্র তার সন্তানদের সম্পর্কে সরাসরি কিছু বলল না। কিন্তু তিনটি সংলাপ থেকেই বোঝা যাবে, আপনার চরিত্রের মনস্তত্ত্ব অর্থাৎ, সে তার সন্তানদের প্রতি ভীষণ বিরূপ। আর দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের সাজাহান যদি বলেন— "যেন তোর পুত্র না হয়, শত্রুরও যেন পুত্র না হয়"। তাহলে সাজাহানের মনস্তত্ত্বের সঙ্গে চমৎকার এ্যাকশন সৃষ্ট হলো বলে নাটকেও আসে গতি।

সংলাপের মাধ্যমে আপনাকে 'দ্বন্দ্বে'র প্রকাশ ঘটাতে হবে। এ-ক্ষেত্রে আপনাকে মনে রাখতে হবে প্রারম্ভ, প্রবাহ, ক্লাইম্যাক্স, সঙ্কটমোচন, পরিণতি অর্থাৎ, 'দ্বন্দ্বে'র বিভিন্ন পর্যায়ের কথা। আপনি দ্বন্দ্বের সূচনা (অর্থাৎ প্রারম্ভ) করতে পারেন 'ম্যাকবেথে'র মতো কোন সিচুয়েশন তৈরি করে; শেক্সপিয়ার যেমন করেছিলেন ব্যাঙ্কোর প্রতি ডাকিনীদের সংলাপ এবং ম্যালকমকে যুবরাজ ঘোষণার মাধ্যমে।

আপনি 'দ্বন্দ্ব' সৃষ্টি করতে পারেন বিশেষ কোন নাটকের প্রথম দুটি সংলাপের মাধ্যমেই :

পিতা ॥ এ বিয়ে হবে না।

মা ॥ এ বিয়ে হবেই।

এক্ষেত্রে বোঝা যাবে কোন বিয়েকে কেন্দ্র করে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে 'দ্বন্দ্ব' সৃষ্টি

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

হয়েছে অর্থাৎ, তারা দুজন দুপক্ষে।

আপনার নাটকের বিশেষ 'সমস্যা'র পক্ষে কোন্ কোন্ চরিত্র অথবা বিপক্ষে কোন্ কোন্ চরিত্র সেটা বোঝা যাবে চরিত্রাবলির সংলাপ থেকে। 'আমি অমুকের পক্ষে' এ ধরনের সংলাপ নাটকের কোন চরিত্রের মুখে সরাসরি উচ্চারিত না হওয়াই ভাল। ধরা যাক, বিয়েকে কেন্দ্র করে মা-বাবার সংলাপ শুনতে পেল দুভাইবোন। আপনার ইচ্ছে, ভাই-বোনের দুজনকে দুপক্ষে রাখবেন। অতঃপর আপনার সংলাপ থেকেই বোঝা যাবে— কে, কোন পক্ষে।

বোন ॥ এ বিয়ে হলে মুখে চুনকালি পড়বে।

ভাই ॥ এ বিয়ে না হলে আমি ঘর ছাড়তে বাধ্য হবো।

সংলাপের মাধ্যমে আপনাকে 'সাসপেন্স' সৃষ্টি করতে হবে। থিবীর জনগণ যখন ইডিপাসকে বলে, দেশে একজন অশুচি ব্যক্তির অবস্থানের কথা তখন 'সাসপেন্স' সৃষ্টি হয় অর্থাৎ, দর্শকের জানবার আগ্রহ জাগে— অশুচি ব্যক্তিটি কে? ইডিপাস যখন বলেন, হত্যাকারীকে খুঁজে বের করবোই, তখন 'সাসপেন্স' সৃষ্টি হয় অর্থাৎ, দর্শক ভাবে সত্যি সত্যি ধরা পড়বে তো? সংলাপের মাধ্যমে 'সাসপেন্স' তৈরি করতে হলে আপনাকে একটি সহজ কাজ করতে হবে : দর্শকের মনে আগ্রহ জাগাতে হবে কিন্তু সহজে উত্তর দেওয়া চলবে না। আপনি আমাদের 'সাসপেন্স' অধ্যায় আরেকবার পড়লে দেখতে পাবেন; সৈয়দ শামসুল হক ঠিক এ-কাজটিই করেছেন। জিনাত মহল কোথায় চলে যাচ্ছে? এ-উত্তর তিনি একটি কথাতেই দিয়ে দিতে পারতেন— 'আমি সবুরকে বিয়ে করে চলে যাচ্ছি।' তাহলে 'সাসপেন্স' সৃষ্টি হতো না। আর সাসপেন্স সৃষ্টি না হলে তিনি হয়তো দর্শকদের ধরেও রাখতে পারতেন না। সৈয়দ হক কি করলেন? জিনাত মহল কোথাও চলে যাবে—এর রকম একটি সংবাদ দিয়ে দর্শকের আগ্রহ জাগালেন কিন্তু সহজে উত্তর দিলেন না। আপনাকে এ কৌশলটিই রপ্ত করতে হবে।

প্রমথ চৌধুরীর একটি মন্তব্য "আমাদের বই বাজারে কাটে না, পোকায় কাটে।" দেখুন তো, এ মন্তব্য অবলম্বনে একটি সিচুয়েশন তৈরি করে 'সাসপেন্স'-এর কৌশল ব্যবহার করতে পারেন কি না? ধরা যাক, সিচুয়েশনটি এ'রকম। কোন লেখক এসেছেন বই বিক্রেতার কাছে বইয়ের কাটতি সম্পর্কে খোঁজখবর নিতে। আপনি বই বিক্রেতার মুখ দিয়ে বলাবেন— 'বই বাজারে না কেটে পোকায় কাটছে'। কিন্তু আপনি সরাসরি না বলিয়ে 'সাসপেন্স' এর কৌশল ব্যবহার করতে চান। কাজটি এভাবে করতে পারেন :

লেখক ॥ বই কাটছে তো?

বিক্রেতা ॥ কাটছে। খুব কাটছে।

লেখক ॥ (উল্লসিত) আমি জানতাম কাটবেই। কাটবে না কেন? কাগজটাও যে দিয়েছি খাসা।

বিক্রেতা ॥ তাই হবে। কাগজের গুণেই হয়তোবা কাটছে।

লেখক ॥ তাহলে কিছু দিন, টাকাপয়সার বড্ড টানাটানি চলছে।

[বিক্রেতা ভেতর থেকে সুন্দরভাবে ঢেকে কিছু আনল]

বিক্রেতা ॥ এই নিন।

লেখক ॥ এ যে দেখি পোকায় কেটেছে।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

বিক্রেতা ॥ বাজারে না কাটলে পোকায় তো কাটবেই। পোকার কি দোষ, বলুন।

এখানে 'সাসপেন্স' কৌশল-এর সঙ্গে মিশেছে শব্দের খেলা।

সংলাপের মাধ্যমে আপনাকে 'এ্যাকশন' সৃষ্টি করতে হবে। এ্যাকশন সৃষ্ট হবে বর্ণনা ও পরিকল্পনা কমিয়ে কাজ ও আচরণকে প্রাধান্য দিলে। এ্যাকশন সৃষ্ট হবে আকস্মিক ও অপ্রত্যাশিত সংলাপের মাধ্যমে (দেখুন এ্যাকশন অধ্যায়)। কণ্ঠস্বরের ওঠানামার সুযোগ থাকলেও এ্যাকশন সৃষ্টি হতে পারে। আপনি এমনভাবে সংলাপ রচনা করবেন, যাতে অভিনয়শিল্পী সে সুযোগ পেতে পারেন। উদাহরণ হিসেবে হিন্দি বাণিজ্যিক ছবি 'দিওয়ার' এর কিছু সংলাপ শোনা যাক :

[বড় ভাই পুলিশ অফিসার, ছোটভাই 'কালোবাজারি'/ গুণ্ডামির সাথে জড়িত। বড় ভাই এসেছে— ছোট ভাই সব ছেড়ে-ছুঁড়ে দেবে— এ-রকম একটি হলফনামায় স্বাক্ষর নিতে]

প্রথম অংশ

ছোট ভাই ॥ আর কিছু বলতে চাও?

বড় ভাই ॥ এখানে 'সাইন' করে দাও।

ছোট ॥ কি লেখা আছে এ কাগজে?

বড় ॥ লেখা আছে— তুমি সব বলতে রাজী আছো— সাথীদের নাম-ধাম, কাজ-কারবার সব। এখানে তোমার 'সাইন' জরুরি।

দ্বিতীয় অংশ

[সঙ্গীত। পজ]

ছোট ॥ ভাইয়া, তোমার মনে আছে, শৈশবে কত রাত খালি পেটে কেটেছে?

বড় ॥ সাইন করবে কি করবে না?

ছোট ॥ তোমার মনে আছে, শুধু দুটাকার জন্য গায়ে জ্বর নিয়ে মাকে মানুষের বাড়ি বাড়ি গিয়ে কাজ করতে হয়েছে?

বড় ॥ তুমি সাইন করবে কি করবে না?

ছোট ॥ তোমার মনে আছে সে গালির কথা?

বড় ॥ ভাই, তুমি সাইন করবে কি করবে না?

তৃতীয় অংশ

[পজ]

ছোট ॥ হ্যাঁ, আমি সাইন করব। (পজ) কিন্তু আমি একা সাইন করব না। যাও, প্রথমে সে ব্যক্তির সাইন নিয়ে আসো, যে-আমার বাবার 'সাইন' নিয়েছিল। যাও, সে ব্যক্তির সাইন নিয়ে আসো, যে আমার মাকে গালি দিয়ে চাকরি থেকে বের করে দিয়েছিল। যাও, তার সাইন নিয়ে আসো, যে আমার হাতে এটা (চোর) লিখে দিয়েছিল। তারপর, তারপর যে-কাগজে তুমি বলো, সে কাগজে আমি সাইন করব।'

সংলাপের প্রথম অংশে দুভাইয়ের কণ্ঠস্বরে ওঠানামা বেশি নেই। দ্বিতীয় অংশে ছোট ভাইয়ের তিনটি সংলাপ আছে। এ সংলাপ তিনটিতেই ইচ্ছে করলে অভিনয়শিল্পী কণ্ঠস্বর ক্রমান্বয়ে ওঠাতে পারেন। সঙ্গীতের পরিভাষায় প্রথম সংলাপের সময় কণ্ঠস্বর খাদে রাখতে পারেন। দ্বিতীয় ও তৃতীয় সংলাপের সময়

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

যথাক্রমে মুদারা ও তারায়। বড় ভাইয়ের কণ্ঠস্বরও ঠিক একই পদ্ধতিতে খাদ থেকে তারসপ্তকে যেতে পারে। 'ভাই, তুমি সাইন করবে কি করবে না'— এ সংলাপটি খুব উঁচুতে নিয়ে (প্রায় চিৎকারের মতো) বলার সুযোগ আছে। তৃতীয় অংশের শুরুর সংলাপ (হ্যাঁ, আমি সাইন করব। কিন্তু একা করব না) কণ্ঠস্বর নামাবার সুযোগ আছে। পরের সংলাপ থেকে 'চোর লিখে দিয়েছিল', পর্যন্ত তিনটি সংলাপে কণ্ঠস্বর ক্রমান্বয়ে উঁচু থেকে আরো উঁচুতে উঠতে পারে। শেষের সংলাপটিতে সামান্য পজ দিয়ে মুদারায় নামিয়ে বলা যেতে পারে। বড় ভাই ও ছোট ভাই এর চরিত্রে রূপদানকারী শিল্পী শশী কাপুর ও অমিতাভ বচ্চন অনেকটা এভাবেই কণ্ঠস্বরের ওঠানামা করিয়েছিলেন।

"একজনের উচ্চারিত প্রশ্ন যখন খানিক পরেই অন্যজনের মুখ থেকে ফিরে আসে, তখন আমরা নাটকীয়তার তৃপ্তিকর আস্বাদ লাভ করি।" (আনিসুজ্জামান, মুনীর চৌধুরী রচনাবলি, প্রথম খণ্ড পৃ. চৌদ্দ-পনেরো) মুনীর চৌধুরীর একাঙ্কিকা 'দণ্ড' থেকে ডক্টর আনিসুজ্জামান প্রদত্ত উদাহরণ শোনা যাক :

স্ত্রী ॥ শোবে এখন?
স্বামী ॥ হুঁ।
স্ত্রী ॥ বাতি নেবাব?
স্বামী ॥ হুঁ।
স্ত্রী ॥ খুব জটিল কেস নাকি?
স্বামী ॥ হুঁ।
স্ত্রী ॥ কেসটা যখন প্রথম হাতে নাও তখন এরকম মনে হয় নি, না?
স্বামী ॥ হুঁ।
স্ত্রী ॥ কারও সাহায্য না নিয়ে যে রকম আহ্লাদের সঙ্গে একাই খেটেখুটে সব তৈরি করছিলে তা দেখে আমিও ভাবি নি যে কেসটা শেষে তোমার জন্য এত জটিল হয়ে দাঁড়াতে পারে।
স্বামী ॥ শোবে এখন?
স্ত্রী ॥ হুঁ।
স্বামী ॥ আলো নেবাব?
স্ত্রী ॥ হুঁ।
স্বামী ॥ তোমার গলার ব্যথাটা কি আজ আবার বেড়ে গেল নাকি?
স্ত্রী ॥ হুঁ।
স্বামী ॥ সামান্য একটা মাছের কাঁটা তোমাকে এতদিন ভোগাবে কে ভেবেছিল?
স্ত্রী ॥ হুঁ।
স্বামী ॥ ডাক্তার অবশ্য আমাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেছিল যে, আর দু-চার দিন মাত্র। তারপর সবই আরাম হয়ে যাবে। এমন বেঁধা নাকি বিঁধেছে যে ওটাকে একেবারে গলিয়ে ফেলতে হবে।

"এই দ্বৈরথের লক্ষ্য ব্যবহারজীবী স্বামীর মহিলা মক্কেল আর স্ত্রীর চিকিৎসারত পুরুষ ডাক্তার— তারা নেপথ্যেই রয়ে যায়। মঞ্চে চলে বৈদগ্ধ্য ও সৌজন্য চিহ্নিত বাকযুদ্ধ..." (আনিসুজ্জামান, পূর্বোক্ত, পৃ. পনেরো)। প্রসঙ্গত, মুনীর চৌধুরীর এ কৌশলের সাথে আপনি যদি মেশাতে পারেন কণ্ঠস্বর ওঠানামার [illegible]ল, তাহলে সৃষ্টি হবে চমৎকার এ্যাকশন।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

শ্রেষ্ঠ সংলাপ সৃষ্টি করতে হলে আপনাকে অবশ্যই ড্রামাটিক আয়রনির কৌশল প্রয়োগ করতে হবে। ডানকান এবং ইডিপাসের সংলাপে আপনি ড্রামাটিক আয়রনির প্রয়োগ দেখেছেন।

উন্নতমানের সংলাপের অন্যতম প্রধান শর্ত ডাবলমিনিং তথা শ্লেষের ব্যবহার। নুরুল মোমেনের নেমেসিস নাটকে সুরঞ্জিত নন্দী, একবার মাস্টার মশাইকে বলে, "আজই শেষ দিন, আজই আমি মুক্তি পাব।" এ-সংলাপে কমপক্ষে দুটি অর্থ আছে। প্রথম অর্থ অসীমের হাত থেকে সে আজ মুক্তি পাবে। দ্বিতীয় অর্থ মৃত্যুর মাধ্যমে (আত্মহত্যা) পাপ থেকে মুক্তি পাবে। নেমেসিস নাটকে এ-ধরনের আরেকটি সংলাপ "আলো যেন আর সহ্য হতে চায় না।" অন্ধকার ঘরে হঠাৎ আলো জ্বলে উঠলে এ জাতীয় সংলাপ আওড়ানো অসম্ভব নয়। কিন্তু সচেতন নাট্যকার এখানে আরো একটি অর্থ পুরে দিয়েছেন। সেটি হয়তো এ-রকম— সুরঞ্জিত এখন অন্ধকারের জীব। সে আঁধারেই থাকতে চায়। জীবনের আলোকিত দিক অর্থাৎ পজিটিভ দিক সে আর সহ্য করতে চায় না।

আপনার সংলাপে 'ডাবলমিনিং' আনতে চাচ্ছেন? একটি শব্দ নিয়ে আপনি অগ্রসর হতে পারেন। ধরা যাক, শব্দটি হচ্ছে কাঁটা। আপনি অতি সহজে এ শব্দকে দুটি অর্থে ব্যবহার করতে পারেন। এক. সত্যিকারের কাঁটা অর্থে, দুই. আলঙ্কারিক অর্থে (যেমন, প্রতিদ্বন্দ্বী অথবা শত্রু) এবার আপনার সংলাপটি হতে পারে— 'আমি আমার পথে কোন কাঁটা রাখতে চাই না' অথবা 'পথের কাঁটা আমাকে অবশ্যই সরাতে হবে' ইত্যাদি ইত্যাদি।

অথবা ধরা যাক, শব্দটি হচ্ছে 'আগুন'। প্রথম অর্থে, সত্যিকার 'আগুন' এবং দ্বিতীয় অর্থে 'বিপ্লবের আগুন' হিসেবে ব্যবহার করে আপনি রচনা করতে পারেন এ-রকম একটি সংলাপ— আগুন জ্বালাতে আমি এসেছি— দিকে দিকে আগুন জ্বালিয়ে তবেই আমি বিদায় নেব।

কোন কোন নাট্যকার 'একই প্রসঙ্গ' কেন্দ্র করে প্রায় একই ধরনের একাধিক সংলাপ রচনা করে থাকেন এবং এ সংলাপসমূহ বিভিন্ন দৃশ্যে একই চরিত্রের মুখে অথবা অন্য কোন চরিত্রের মুখে বসিয়ে দেন। শেক্সপিয়ারের ম্যাকবেথ নাটকে 'হাত-ধোয়া' প্রসঙ্গকে কেন্দ্র করে লেডি ম্যাকবেথের একাধিক সংলাপ আমরা আগে দেখেছি। এ প্রসঙ্গে ম্যাকবেথ ও লেডি ম্যাকবেথের আরো সংলাপ আছে :

লেডি ম্যাকবেথ ॥ যাও, সামান্য পানি নিয়ে আসো। অতঃপর তোমার হাতেই এই নোংরা সাক্ষ্য মুছে ফেলো।
[Go get water
And wash, this filthy witness from your hand.]

ম্যাকবেথ ॥ সকল মহাসাগরের সমস্ত পানি এই রক্ত ধুয়ে নিতে পারবে?
আমার হাত পরিষ্কার করতে পারবে?
[Will all great Neptune's ocean
Wash the blood
clear from my hand]?

এ সংলাপসমূহ বিচ্ছিন্ন কোন উচ্চারণ নয়— একটির সাথে আরেকটি সম্পর্কিত। এবং কখনো-কখনো বৈপরীত্যসূচক। এগুলোকে সম্পর্কিত সংলাপ অথবা

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

বৈপরীত্যসূচক সংলাপ বলা যেতে পারে। আপনি এ-ধরনের সংলাপ সৃষ্টি করে নাটকীয় ইফেক্ট আনার চেষ্টা করতে পারেন। ঝড়-জলোচ্ছ্বাসপূর্ণ এলাকার একটি স্বাভাবিক সংলাপ— 'দশ নম্বর সিগনেল, তুফান থামে নাই, তুফান থামবে না' — আপনি এ-সংলাপটিকে বিভিন্ন দৃশ্যে ঝড়ে সর্বস্ব হারিয়ে এখন মানসিক রোগগ্রস্ত একজন ব্যক্তির সংলাপ হিসেবে ব্যবহার করতে পারেন। সে স্বাভাবিক ঝড়ের পূর্বাভাস দেখে এ-সংলাপ বলতে পারে। দ্বিতীয়ত, যেহেতু সে ঝড়ের কারণে মানসিক রোগগ্রস্ত, সেহেতু সে সব সময় ঝড়ের পূর্বাভাস শুনতে পারে এবং আপন মনে আওড়াতে পারে এ 'সংলাপটি'। তৃতীয়ত, কোথাও হয়তো পারিবারিক-সামাজিক সংঘর্ষ চলছে — এ সিচুয়েশনেও সে এ-সংলাপ বলতে পারে। বিভিন্ন সিচুয়েশনে ব্যবহৃত এ সংলাপসমূহ দর্শকদের কাছে হয়তো আলাদা 'মাত্রা' নিয়ে আসবে। দ্বিতীয় দৃশ্যে আনতে পারে মানসিক ঝড়ের ইফেক্ট এবং তৃতীয় দৃশ্যে আনতে পারে পারিবারিক-সামাজিক ঝড়ের ইফেক্ট। যদি তা করতে ব্যর্থ হয়, তাহলে সংলাপের পুনরাবৃত্তি অপ্রয়োজনীয় বলে বিবেচিত হবে।

হুমায়ূন আহমদের একটি টিভি নাটকে (*অয়োময়*) নাপিত চরিত্র বারবার বলে, 'ভগবানের লীলা বোঝা ভার'। তার এ সংলাপের সাথে এলাকার সবাই পরিচিত। একদিন চুরির মিথ্যা অপবাদ দিয়ে জমিদার বাড়ির নিরীহ 'পাখাল'কে মুখে চুনকালি মেখে হাঁটানো হচ্ছিল। বিস্মিত নাপিত এ দৃশ্য দেখে জানতে চাইল, ব্যাপার কী? উত্তরে পাখাল বলল, 'ভগবানের লীলা বোঝা ভার'। নাপিতের নিয়মিত সংলাপের মাধ্যমে চমৎকার জবাব দিল পাখাল। এ সংলাপের আসল চমৎকারিত্ব দু-সংলাপকে সম্পর্কিত করবার মধ্যে নিহিত।

সংলাপসৃষ্টির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দিক, শব্দ-চয়ন ও শব্দব্যবহার সম্পর্কে সচেতনতা। এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা প্রয়োজন।

আপনার নাটকে কোন শব্দ ব্যবহৃত হতে পারে 'মটিফ', হিসেবে— প্রতীক হিসেবে। ইবসেন তার 'গোস্টস' নাটকে বারবার ব্যবহার করেছিলেন 'সূর্য' শব্দটি। এবং অবশ্যই প্রতীক হিসেবে। প্রতীকটি বোঝার জন্য নাটকের সংক্ষিপ্ত কাহিনী জানা দরকার। মিসেস অলভিং পাদরি স্যান্ডার্স-এর পরামর্শে নিতান্ত অনিচ্ছায় লম্পট স্বামীর ঘর করেছেন। স্বামীর মৃত্যুর পর তিনি যখন সৎ জীবনযাপনে প্রয়াসী হলেন, তখন তিনি জানতে পেলেন তাঁর ছেলে অসওয়াল্ড, সৎ-বোন রোজিনার প্রতি আসক্ত (সে সম্পর্ক জানত না) এবং অভিশপ্ত রোগে আক্রান্ত। অর্থাৎ পিতার লাম্পট্য এবং যৌনরোগের উত্তরাধিকারী হয়েছে ছেলে। ফলে মিসেস অলভিং-এর আশা ভঙ্গ হয়।

এবারে 'সূর্য' প্রতীক-এর বিশ্লেষণ শোনা যাক, কবীর চৌধুরীর 'প্রসঙ্গ নাটক' (পৃ.৭৩-৭৪) :

> "দ্বিতীয় অঙ্কের মাঝামাঝি আমরা অসওয়াল্ডকে মিসেস অলভিং-এর কাছে অভিযোগ করতে শুনি অন্ধকার পরিবেশ ও ক্রমাগত বর্ষণের বিরুদ্ধে। ... it's so dark here/ Never to get a glimpse of the sun;... নাটক যে শুরু হয়েছিল একটা প্রায় অন্ধকারাচ্ছন্ন নিরানন্দ বদ্ধ পরিবেশে সে কথা আমাদের মনে পড়ে। ... দ্বিতীয় অঙ্কের শেষে এক ভয়ঙ্কর ঘটনার মধ্য দিয়ে এই অন্ধকারের পর্দা দূরীভূত হয়। অসওয়াল্ড জানালা দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে চিৎকার করে ওঠে, "কি হচ্ছে এসব? ওই আলো আসছে কোথা থেকে?" আমরা জানতে পারি যে, ওই আলো কোনো আকাঙ্ক্ষিত শুভ

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

আলো নয়, আগুন ধরে যাওয়া এতিমখানা থেকে উঠছে ওই রশ্মি, এবং তা ভেতরের অন্ধকারকে আরো তমসাচ্ছন্ন করে তুলছে অনিবার্যভাবে। ... "গোস্টস"- এর তৃতীয় অঙ্কে অসুস্থ অবসাদগ্রস্ত ক্লান্ত অসওয়াল্ড বলে যে সব কিছু পুড়ে যাবে, সে নিজেও পুড়ে ছাই হয়ে যাচ্ছে। (হঠাৎ) আশাদীপ্ত কণ্ঠে তিনি বলে ওঠেন। "The day is dawning over the hills; and the weather is fine". অসওয়াল্ডকে উদ্দেশ্য করে তিনি বলেন যে অল্পক্ষণের মধ্যেই সে সূর্য দেখতে পাবে। নাটকের প্রচণ্ড ট্র্যাজিক আয়রনি এখানে সে তার চূড়ান্ত সমাপনী দৃশ্যে সূর্য সত্যিই ওঠে, ... কিন্তু ততক্ষণে অসওয়াল্ডের বিনাশও শেষ লগ্নে উপস্থিত। সূর্য উঠেছে কিন্তু অসওয়াল্ড আর তা দেখতে পায় না...। অপরূপ সুন্দর সূর্যালোকিত বাইরের দৃশ্যপটের দিকে পিঠ ফিরিয়ে সে হঠাৎ বলে ওঠে, "মা, আমাকে সূর্যটা দাও।" যে সূর্যকে সাধারণত জীবন, আনন্দ ও শক্তিমত্তার আর্কিটাইপাল প্রতীকরূপে সবাই গ্রহণ করে থাকে, তা এই মুহূর্তে চরম আতঙ্কের রূপ ধরে আমাদের সামনে প্রতিভাত হয়। এই মুহূর্ত থেকে যবনিকা পড়বার আগে পর্যন্ত মা ও ছেলেদের সংলাপে মাত্র একষট্টিটি শব্দ উচ্চারিত হয় এবং ছেলে যে বারোটি শব্দ নিষ্প্রাণ যান্ত্রিকতার সঙ্গে উচ্চারণ করে তা হলো "The Sun" কথাটির ছ'বার পুনরাবৃত্তি।

আপনার ব্যবহৃত শব্দের মাধ্যমে নাটকের বিষয়ের সাথে সম্পর্কিত পরিবেশ, চরিত্রের মন-মানসিকতা ফুটিয়ে তুলতে হবে। ধরা যাক, ভাষা-আন্দোলনভিত্তিক কোন নাটকে আপনি পাকিস্তানি পরিবেশ অথবা পাকিস্তানি মানসিকতা ফুটিয়ে তুলতে চান। আপনি সে কাজটি করতে পারেন 'কওম', 'দীন' ইত্যাদি শব্দ ব্যবহার করে। যেমন করেছিলেন মুনীর চৌধুরী, তাঁর কবর নাটকে, "তোমাকে দেশের নামে, কওমের নামে, দীনের নামে, যারা এখনও মরে নি— তাদের নামে মিনতি করছি— তুমি যাও, যাও, যাও।" এস. এম. সোলায়মানের নাটক 'এই দেশে এই বেশে' থেকে এ-রকম আরেকটি উদাহরণ নেয়া যেতে পারে :

হুরমত ॥ ও তুমি। তুমিই সেই শহীদ রাজাকার চিকন আলী। আস। কাছে আস ভাই। আরবি কায়দায় একখান চুম্বা খাই। খোরমা আছে, খাইবা?

চিকন ॥ স্যার।

হুরমত ॥ উটের গোশ্‌ত, একদম খাঁটি, মরুভূমির।

চিকন ॥ না, স্যার, হজম অইবো না।

ধর্ম ॥ (চিকনকে ফুঁ দেয়) জিত রহো বেটো। জিত রহো। শহীদের চিরকাঙ্ক্ষিত পথে তোমার বিচরণ। আল্লাহ তোমাকে বেহেস্ত নসিব করুক।

'আরবি কায়দায় চুম্বা', 'খোরমা', 'উটের গোশ্‌ত', 'জিত রহো' ইত্যাদি শব্দ-সমষ্টি নিঃসন্দেহে পাকিস্তানি মানসিকতার পরিচায়ক।

শুধু পাকিস্তানি মানসিকতা কেন, চরিত্রের যে-কোন মানসিকতা ফুটে উঠতে পারে, আপনার শব্দ-চয়নের মাধ্যমে। ধরা যাক, আপনি একজন অর্ধশিক্ষিত নব্য ধনীর চরিত্র আঁকতে চান। চরিত্রটি পদমর্যাদা সচেতন। তার ধারণা ইংরেজি শব্দ ব্যবহার করলে আধুনিক হওয়া যায়। সুতরাং তার মুখে কারণে-অকারণে এবং ভুল উচ্চারণে ইংরেজি শব্দ বসিয়ে দিতে পারেন। উদাহরণ হিসেবে ভেবে দেখতে পারেন নিচের অংশটি। "টেক তো টেক, নো টেক তো নো টেক একবার তো সী" (নিন তো নিন, না নিন তো না নিন একবার তো দেখুন)।

প্রসঙ্গত মোল্লা-মৌলভী, সংস্কৃত-পণ্ডিত, ফুটবল খেলোয়াড়, চলচ্চিত্রকর্মী,

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

নাট্যকর্মী তথা যে-কোন পেশাজীবীর মুখে পেশার সাথে সম্পর্কিত শব্দ বসাতে পারেন। যেমন :

ক. মোল্লা-মৌলভী : বদনসিব, তকলিফ, ওল্লামায়ে কেরাম, দোজাহানের নেকি ইত্যাদি।

খ. সংস্কৃত- পণ্ডিত : বৎস, কিবংপ্রকার।

গ. ফুটবল খেলোয়াড় : গোল, ডজ, ব্যাকভলি, লংপাস, মাইনাস, ব্যাকপাস ইত্যাদি।

ঘ. চলচ্চিত্রকর্মী : ক্লোজআপ, লংশট, শুটিং, স্ক্রিপ্ট, শট, কাট ইত্যাদি।

ঙ. নাট্যকর্মী : প্লট, সাসপেন্স, ব্লকিং, মেকআপ, প্রডাকশন ইত্যাদি।

প্রয়োজনে একই শব্দকে বার বার ব্যবহার করে, সংলাপ রচনা করতে পারেন। উদাহরণ হিসেবে নেয়া যেতে পারে শেক্সপিয়ারের কিং লিয়ার নাটকের নিচের সংলাপটি :

Never, never, never, never, never.

"একটি শব্দে বিশ্বের নিঃসীম শূন্যতা ফুটে উঠেছে যখন লীয়ার বুঝলেন তাঁর আদরিণী কন্যা কর্ডেলিয়া আর ফিরে আসবেন না।"

সংলাপের শ্রেষ্ঠত্ব নির্ভর করে অধিকাংশ সময় কথার মারপ্যাঁচ, শব্দের খেলা এবং ব্যঞ্জনা সৃষ্টির মধ্যে।

আসাদুজ্জামান নূর রূপান্তরিত বেরটল্ট ব্রেশটের 'দেওয়ান গাজীর কিসসা'-র মাখন ও গাজীর কয়েকটি সংলাপ এ'রকম :

মাখন ॥ ... (হঠাৎ রেগে ওঠে) আপনি আমায় কি ভেবেছেন, আমি মানুষ না?

গাজী ॥ এ্যাই তো বাপু উল্টো-পাল্টা কতা বইলতে লেগেছ। এই বললে তুমি চাকর, এই বলতিছো তুমি মানুষ। আরে এক কতা বল। ভদ্দর লোকে দুই কথা বলে না।

ভদ্রলোকেরা, তথাকথিত এক কথার মানুষেরা, চাকর-বাকরদের 'মানুষ' বলে গণ্য করে না এ-রকম ইঙ্গিত ও খোঁচা এ সংলাপে রয়েছে। আপনাকে এ-রকম সংলাপ সৃষ্টি করতে হবে। শব্দ নিয়ে খেলতে হলে আপনি বিশেষ্য ও ক্রিয়ার সহযোগে তৈরি সংযুক্ত শব্দ নিয়ে অগ্রসর হতে পারেন। যেমন—

একজন ॥ হুজুর, আপনার নুন খেয়েছি।

অন্যজন ॥ তো, এবার গুলি খা। (হিন্দী চলচ্চিত্র 'শোলে')

অন্য একটি উদাহরণ (বহুল প্রচলিত) :

একজন ॥ আপনি কি পানাসক্ত?

অন্যজন ॥ অবশ্যই। তবে পান করি না, পান খাই।

শব্দ নিয়ে খেলবার অসংখ্য কৌশল আছে। মুনীর চৌধুরীর 'কবর' থেকে একটি উদাহরণ নেয়া যাক :

মূর্তি ॥ কবরে যাব না।

নেতা ॥ আগে কথাটা ভাল করে শোন। ... বিশ্ববিদ্যালয়ের সব চেয়ে উঁচু ক্লাশে উঠেছ। ... তোমার মাথা আছে।

মূর্তি ॥ ছিল। এখন নেই। খুলিই নেই। উড়ে গেছে।

'তোমার মাথা আছে' এ সংলাপটি নেতা ব্যবহার করেছিল, 'তোমার বুদ্ধি আছে' অর্থে। মূর্তি চরিত্র মাথাকে সত্যিকার মাথা অর্থে ধ'রে গুলি[illegible]ার প্রশ্ন ওঠানোর ফলে নাট্যরস জমে উঠেছে।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

"To be, or not to be that is the question" শেক্সপিয়ারের হ্যামলেট কী বলতে চেয়েছেন এ সংলাপে? কী ধরনের দ্বিধা-দ্বন্দ্বে ভুগছিলেন তিনি? দুর্ভাগ্য মেনে নেবেন কি নেবেন না— এ দ্বিধা-দ্বন্দ্বে? পৃথিবীর জ্বালা-যন্ত্রণা থেকে মুক্তি লাভের জন্য স্বেচ্ছায় মৃত্যুবরণ করবেন নাকি করবেন না— এ দ্বিধা-দ্বন্দ্বে? পিতার হত্যাকারী মা ও চাচাকে হত্যা করবেন কি করবেন না— এ দ্বিধা-দ্বন্দ্বে? নাটকের দর্শক, পাঠক ও সমালোচকগণ দীর্ঘদিন ভেবেছেন, এ সংলাপ নিয়ে। একটি নির্দিষ্ট জবাব খুঁজে পান নি। একটি সংলাপ তখনই ব্যঞ্জনাসমৃদ্ধ হবে যখন সে সংলাপে একাধিক অর্থের অবকাশ থাকে— যখন সে সংলাপ নিয়ে প্রচুর ভাববার অবকাশ থাকে। বাদল সরকারের বাকী 'ইতিহাস' নাটকের একটি অংশ শোনা যাক :

শরবিন্দু ॥ (স্তম্ভিত) আমি ? আমি আত্মহত্যা কেন করবো?
সীতানাথ ॥ কেন করবে না। যুক্তি দাও।
শর ॥ যুক্তি? এত সহজ যুক্তি। বাঁচতে চাই বলে।
সীতা ॥ কেন বাঁচতে চাও?
শর ॥ কেন বাঁচতে চাই? বাঁচতে কে না চায়?
সীতা ॥ অনেকেই চায় না।
শর ॥ কে বলল চায় না।
সীতা ॥ কে বলল চায়?
শর ॥ যদি না চায় বেঁচে আছে কেন? আত্মহত্যা করছে না কেন—তোমার মতো।
সীতা ॥ বেঁচে নেই। আত্মহত্যা করছে। হয়তো আমার মত নয়।
শর ॥ তার মানে?
সীতা ॥ তার মানে তারা গলায় ফাঁসি দিয়ে ঝুলছে না। কাপড়ে কেরোসিন ঢেলে জ্বলছে না। কোমরে পাথর বেঁধে ডুবছে না। তারা নিঃশব্দে নীরবে বাঁচা বন্ধ করে বেঁচে আছে।

নাটকের এ অংশের আত্মহত্যা প্রসঙ্গ নিয়ে ভাববার যথেষ্ট অবকাশ আছে। চরিত্রসমূহের অবসাদ, ক্লান্তি, হতাশা অনায়াসে স্পর্শ করে পাঠক-দর্শককে।

কাব্যনাটকের সংলাপ

"জীবনের সমগ্রতা প্রকাশের ক্ষেত্রে কাব্য-নাট্যকার পদ্যকেই বেশি উপযুক্ত মনে করেছেন এবং তাঁদের মতে, পদ্যর স্পন্দনেই চরিত্রের অন্তর্নিহিত আবেগের অকৃত্রিম প্রকাশ সম্ভব এবং তা যদি লৌকিক ভাষা স্পন্দনের কাছাকাছি হয়, তাহলে মানুষের বাইরের ও ভেতরের দুটো চেহারাই স্বাভাবিকভাবে প্রকাশ পেতে পারে। তার ওপর পদ্যের স্পন্দনে তীব্র নাটকীয় আবেগের প্রকাশও হয়, যাতে মানুষের আত্মিক শক্তি তার প্রয়োজনীয় মর্যাদা ও ঐশ্বর্যকেও স্পর্শ করতে পারে" (উজ্জ্বলকুমার মজুমদার, পূর্বোক্ত, পৃ. ১২৫)।

বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কাব্যনাটক, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'বিসর্জন'। তিনি এ নাটকে অক্ষরবৃত্ত ছন্দ ব্যবহার করেছেন। অধিকাংশ পঙ্ক্তি চৌদ্দমাত্রায় রচিত। যেমন,

গোবিন্দমাণিক্য ॥ শ্রান্ত দেহে [illegible] চিত্ত হতে

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

অমৃত করিতে পান; সেথাও কি নাই
দয়া সুধা? গৃহমাঝে পুণ্য প্রেম বহে,
তারো মাঝে মিশিয়াছে রক্তধারা? এত
রক্তস্রোত কোন্ দৈত্য দিয়াছে খুলিয়া।

[দ্বিতীয় অঙ্ক, তৃতীয় দৃশ্য]

চৌদ্দমাত্রার চাল বজায় রেখে রবীন্দ্রনাথ মাঝে মাঝে এনেছেন বৈচিত্র্য। যেমন,

রঘুপতি ॥ তুমি রাজা হবে।
নক্ষত্র রায় ॥ বিশ্বাস না হয় মোর।
রঘু ॥ দেবীর স্বপন সত্য। রাজটীকা পাবে তুমি, নাহিকো সন্দেহ।
নক্ষত্র ॥ নাহিকো সন্দেহ? কিন্তু যদি নাই পাই?
রঘু ॥ আমার কথায় অবিশ্বাস?

[তৃতীয় অঙ্ক, প্রথম দৃশ্য]

দেখা যাচ্ছে, রঘুপতি ও নক্ষত্র রায়ের সংলাপের বিভিন্ন পঙ্‌ক্তিতে কখনো এসেছে ছ'মাত্রা, কখনো এসেছে আটমাত্রা। এমন কি শেষ পঙ্‌ক্তিতে এসেছে চারমাত্রা। কিন্তু বিভিন্ন চরিত্রের সংলাপ মিলিয়ে রবীন্দ্রনাথ বজায় রেখেছেন চৌদ্দমাত্রার চাল।

নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছেন, কাব্যনাটক লিখতে হলে, আপনাকে জানতে হবে বাঙলা ছন্দ, বিশেষ করে অক্ষরবৃত্ত ছন্দের নিয়মাবলি ও বৈচিত্র্য। কাব্যনাটকে প্রয়োজনে গদ্য-সংলাপও ব্যবহৃত হতে পারে। বিসর্জন নাটকে জনতাদের মুখে রবীন্দ্রনাথ গদ্য-সংলাপ দিয়েছিলেন।

প্রসঙ্গত বলা প্রয়োজন, শুধু কাব্যনাটক কেন, সব ধরনের নাটকেই আপনি কবিতা, গান, ছড়া, ইত্যাদি ব্যবহার করতে পারেন। যাত্রার বহু সংলাপ পদ্যে রচিত হয়ে থাকে। যাত্রার নায়ক-নায়িকা এবং অন্যান্য চরিত্র মাঝে মাঝে এবং বিবেক চরিত্র শুধু গানের মাধ্যমেই ভাব প্রকাশ করে থাকে। বাংলা সাহিত্যের ঐতিহ্য বিবেচনা করলে দেখা যাবে, নাট-গীতির (নাটক ও গান) প্রতি এদেশের শ্রোতা-দর্শকের ঝোঁক বেশি। পালাগান, যাত্রা ও কথকতার উদাহরণ আমাদের এ বক্তব্যকে সমর্থন করবে।

এ্যাবসার্ড নাটকের সংলাপ

"আবোল তাবোল কথাবর্তা" হচ্ছে এ্যাবসার্ড নাটকের প্রাণ। এ ধরনের নাটকের সংলাপ মূলত "Non sequitur" তত্ত্বের ভিত্তিতে রচিত হয়। ল্যাটিন ভাষায় "Non sequitur" মানে 'পরের ঘটনা আগের ঘটনাকে অনুসরণ করে না।' এ-কথা বুঝলো, এ্যাবসার্ড নাটকের পদ্ধতি ও ভাষার ব্যবহার বুঝতে অসুবিধা হবে না।

এ্যাবসার্ড নাটকে চরিত্র, ঘটনাবলি ও ভাষা প্রায়শ যুক্তির সীমা লঙ্ঘন করে। বাক্যসমূহ একটি আরেকটিকে অনুসরণ করে না। অনেক সময় প্রচলিত অর্থকে লঙ্ঘন করে শব্দসমূহকে নতুন অর্থে ব্যবহার করা হয়। আয়ানেস্কোর The Bald Soprano থেকে একটি উদাহরণ নেয়া যাক :

MRS. Smith : The car goes very fast, but the cook-beats better batter.
MRS. Martin : Don't be turkeys, rather kiss the conspirator.
MRS. Smith : I am waiting for the aqueduct to come to see me at my windmill.

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

MR. Martin : One can prove that social progress is definitely better with sugar.

Mr. Smith : To hell with polishing!

এ নাটকের অধিকাংশ সংলাপ অপ্রাসঙ্গিক এবং Non sequitur তত্ত্বের ভিত্তিতে রচিত (*এড়ুইন উইলসন*, পৃ. ১৭২-১৭৩)।

উইলসন (পৃ. ১৭৩) এ রকম আরেকটি উদাহরণ দিয়েছেন, স্যামুয়েল ব্যাকেটের Waiting for Godot থেকে। লাকী নামের চরিত্রটি প্রায় সারাক্ষণ কোন কথা বলে না। কিন্তু প্রথম অঙ্কের শেষ দিকে ধর্ম এবং আইনের পরিভাষা মিলিয়ে হঠাৎ সে এক দীর্ঘ অসংলগ্ন বক্তৃতা প্রদান করে :

> Given the existence as uttered forth in the public works of puncher and wattmann of a personal God quaquaquaqua with white beard quaquaquaqua outside time without extension who from the heights of divine apathia divine athambia aphasia loves us dearly with some exceptions for reasons unknown but time will tell...

সংলাপ রচনার কৌশলের কোন শেষ নেই। সবশেষে আমরা বলতে পারি, চরিত্রের মনের অবস্থা প্রকাশ করবার জন্য আপনি ব্যবহার করতে পারেন স্বগত সংলাপ (Soliloquy)। দীর্ঘ বাক্য, বক্তৃতা ও বর্ণনা যথাসম্ভব এড়িয়ে চলা ভালো। শেক্সপিয়ারের সংলাপ প্রসঙ্গে এগরি বলেছেন, দার্শনিক অংশে তাঁর সংলাপ ভারী এবং মাপা; প্রেমের দৃশ্যে গীতল ও ধীরগতিসম্পন্ন। এ্যাকশন চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছলে (অর্থাৎ ক্লাইম্যাক্সে) বাক্যগুলো হয় ছোট ও সহজ"। আপনি প্রয়োজনে এ উপদেশ অনুসরণ করতে পারেন। আপনাকে অবশ্যই মনে রাখতে হবে, চরিত্রসমূহের মধ্যে পারস্পরিক বিরোধিতা থাকলেও আপনার সঙ্গে কোন চরিত্রের বিরোধ নেই। কেননা, চরিত্রগুলো আপনারই সৃষ্টি। ধরা যাক, নবাব সিরাজ উদ্‌দৌলার জীবনভিত্তিক একটি নাটক আপনি লিখবেন। সিরাজ উদ্‌-দৌলার সংলাপ লিখবার সময় আপনাকে হতে হবে সিরাজ উদ্‌দৌলা। পরক্ষণে মীর জাফরের সংলাপ লিখবার সময় আপনাকে হতে হবে মীর জাফর। এ কাজটি আন্তরিকভাবে করতে না পারলে আপনি সংলাপ লিখতে পারবেন না। আর সংলাপ লিখতে না পারলে, আপনি হয়তো কখনো সফল নাট্যকার হতে পারবেন না।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

নাটকের পরিভাষা

নাটক লেখার কলাকৌশল-এর সাথে সম্পর্কিত কিছু পরিভাষা রয়েছে। উৎসাহী ও উচ্চতর পাঠে আগ্রহী লেখকবৃন্দের জন্য 'নাটকের পরিভাষা' সংযোজিত হলো। নাটকের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে বিজ্ঞ লেখকবৃন্দের মতামত এতে তুলে ধরবার চেষ্টা করা হয়েছে। বিজ্ঞ লেখকবৃন্দের মতামত, নাটক সম্পর্কিত ধারণা স্পষ্টতর করে তুলবে। প্রসঙ্গত বলা প্রয়োজন, মূলত নাট্যকারের জন্য প্রয়োজনীয় পরিভাষাই এখানে পরিবেশিত হয়েছে।

নাটক/ড্রামা/প্লে

"নাটক হলো মানব-জীবন সম্পর্কিত অভিজ্ঞতার এমনই এক কবিকৃত অভিনয়যোগ্য বৃত্ত যা সমবেত দর্শকদের মধ্যে উত্তেজনা, উৎকণ্ঠা, কৌতূহল সৃষ্টি করে তাদেরই চিত্তে উদ্দিষ্ট রস-পরিণাম লাভ করে বা চিত্তকে নাট্যকারের অভিপ্রেত পথে উদ্বোধিত করে।"

দুর্গাশঙ্কর মুখোপাধ্যায়, নাট্যতত্ত্ব বিচার, পৃ.২৩

"Drama is the art of expressing ideas about life in such a manner as to render that expression capable of interpretation by actors and likely to interest an audience assembled to hear the words and witness the actions."

[নাট্যকলা হচ্ছে, অভিনেতৃবর্গের দ্বারা উপস্থাপ্য জীবন সম্পর্কিত ধারণার এমনভাবে প্রকাশ, যা শ্রবণ ও দর্শনের জন্য দর্শকদের আকৃষ্ট করে]।

—এলারডাইস নিকল, দুর্গাশঙ্কর মুখোপাধ্যায়ের অনুবাদ।

থিয়েটার

"The word derives from theatron, the Greek word for "seeing-place", which was coined to describe the semicircular hillside benches that seated the audience during ancient Greek dramatic performances...

In its various usage's "the theatre" today may refer to a culture's entire dramatic literary heritage, or it might encompass only plays, or it

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

might refer as well to mime shows, musical extravaganzas, minstrel entertainment's, cabaret revues, acted out story-telling even puppet shows. By extension, the word is occasionally broadened to include motion pictures and radio and television production. Metaphorically, "theatre" has even been applied to political boundaries and military operation (the "Pacific Theatre" and the "European Theatre" of World War II)".

[গ্রিকশব্দ থিয়েট্রন অর্থাৎ, 'দেখার স্থান' (প্রেক্ষাগৃহ) থেকে থিয়েটার শব্দটি এসেছে। থিয়েটার বলতে নাটকের দর্শকের জন্য পাহাড়ের পাদদেশে নির্মিত অর্ধবৃত্তাকার আসন বোঝাত। থিয়েটার শব্দের বহুবিধ প্রয়োগ রয়েছে। আজকাল থিয়েটার বলতে কোন সংস্কৃতির সমগ্র ঐতিহ্য, মাইম শো, সঙ্গীত-সন্ধ্যা, ক্যাবারে, পুতুলনাচ থেকে পালাগান পর্যন্ত সবকিছুকে বোঝায়। এমন কি থিয়েটার বলতে চলচ্চিত্র এবং রেডিও-টিলিভিশনের প্রযোজনাকেও বোঝানো হয়ে থাকে। রূপকার্থে রাজনীতি ও সামরিক অঙ্গনে থিয়েটারের প্রয়োগ দেখা যায়]।

—*Robert Cohen,Theatre, P.20*

স্ক্রিপ্ট

"The written or printed art, consisting of dialogue, stage directions, character description and the like, of a play or other theatrical representation.

[কোন নাটক অথবা নাটকীয় পরিবেশনার জন্য সংলাপ, মঞ্চ নির্দেশনা, চরিত্র বর্ণনা ইত্যাদি সংবলিত লিখিত অথবা প্রকাশিত টেক্সট]

—*এডুইন উইলসন, দি থিয়েটার এক্সপেরিয়েন্স, পৃ. ৪০৬*

ট্র্যাজেডি

বিয়োগান্ত নাটক।
সংগ্রামী ব্যক্তির ব্যর্থতা/পতন অবলম্বনে রচিত নাটক।

"Tragedy then is an imitation of an action that is serious, complete and of certain magnitude, in language embellished with each kind of artistic ornament the several kinds being found in separate parts of the play; in the form of action not of narrative, through pity and fear effecting proper purgations of these emotions".

[ট্র্যাজেডি হলো কোন গুরুগম্ভীর ঘটনার অনুকরণ। ট্র্যাজেডির যে ঘটনা, তা হবে একটি বিশেষ দৈর্ঘ্যবিশিষ্ট ও স্বয়ংসম্পূর্ণ। এর যে ভাষা তাতে থাকবে আনন্দদায়ক ছন্দ ও গান। এর প্রকাশভঙ্গিমা হবে উক্তি-প্রত্যুক্তি সম্বলিত, নাটকীয় এবং কখনই তা বর্ণনাত্মক হবে [illegible] করবে যাতে Pity ও fear অর্থাৎ

আমার বই

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

অনুকম্পা ও ভয় দর্শকচিত্তে জাগ্রত হয়। আর এর লক্ষ্য হবে অনুকম্পা ও ভয়ের আবেগ-বাহুল্য থেকে চিত্তের মুক্তি]।

—অ্যারিস্টটল, দুর্গাশঙ্কর মুখোপাধ্যায়ের অনুবাদ, পৃ. ১৬৪।

ফেইট ও নেমেসিস

নিয়তি ও কর্মফল।

গ্রিক তত্ত্ব ফেইট অর্থ নিয়তি বা ভাগ্য। এ তত্ত্বানুসারে মানুষের ভাগ্য পূর্ব-নির্ধারিত। চেষ্টা করেও কেউ এ ভাগ্য অতিক্রম করতে পারে না। অথচ অনিচ্ছাকৃত অপরাধের জন্য তাকে 'কর্মফল' (নেমেসিস) ভোগ করতে হয়। ফলে তার জীবনে নেমে আসে ট্র্যাজেডি। শ্রেষ্ঠ উদাহরণ, *ইডিপাস*।

ক্যাথারসিস

গ্রিকশব্দ। ইংরেজি পরিভাষা purgation বাংলায় 'বিশোধন' 'বিমোক্ষণ' ইত্যাদি পরিভাষা ব্যবহৃত হচ্ছে। অ্যারিস্টটলের মতে, ট্র্যাজেডিতে 'করুণা'। 'শোক' (pity), ভয় (fear) ইত্যাদি ভাব ব্যবহার করতে হবে এবং দর্শকের মন থেকে 'ক্যাথারসিসে'র মাধ্যমে এসব অনুভূতি দূর করতে হবে। দর্শককে উত্তেজনা/ tension মুক্ত করতে হবে। ধরা যাক, একজন দর্শক জুতার অভাবে মানসিক যন্ত্রণা ভোগ করছে। মঞ্চে যদি সে দেখতে পায়, একজন পঙ্গুব্যক্তি পায়ের অভাবে ভীষণ কষ্ট পাচ্ছে, তাহলে নিশ্চয়ই তার যন্ত্রণার উপশম হবে। এটাই ক্যাথারসিস।

সাধনকুমার ভট্টাচার্যের মতে "Effecting proper purgation of the emotion"— কথাটি অ্যারিস্টটল মানসিক পরিশোধন, নৈতিক উন্নয়ন, চরিত্র-সংগঠন বা ভয় ও শোচনার পরিণাম এর কোন অর্থেই ব্যবহার করেন নি। যে অর্থে ব্যবহার করেছেন তা— "He who hears the tale told will thrill with horror and melt to pity"— এই উক্তিটির মধ্যেই ব্যক্ত হয়েছে— 'ক্যাথারসিস শব্দটি তিনি এখানে সাধারণভাবে রেচন বা উদ্রেক অর্থেই ব্যবহার করেছেন, বলতে চেয়েছেন যে ভয়ানক ও শোচনীয় ঘটনাকে এমনভাবে উপস্থাপিত করতে হবে যাতে দর্শকের মনে ভয়ের শিহরণ এবং শোচনার দ্রবণ উপস্থাপিত হয়, যাতে ভয় শিহরণের মাত্রায় এবং শোচনা দ্রবীভাবের মাত্রায় পৌঁছায়। এই মাত্রায় পৌঁছানো নামই— "Purgation of these emotions" এই হিসেবে 'ক্যাথারসিস' শব্দটি রসনিষ্পত্তির মাত্রা নির্দেশ করবার জন্যই ব্যবহৃত হয়েছে।

— অ্যারিস্টটলের পোয়েটিকস ও সাহিত্যতত্ত্ব, পৃ. ৩৫২।

কমেডি

"কমেডি নানারূপ, নানা চেহারা, বিচিত্র মুখোশ পরে সে আমাদের সামনে আসে, বিভিন্ন প্রকার আবেদন নিয়ে। কখনো আমরা উচ্চকিত হই সরল মধুর হাসিতে,

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

কখনো আমাদের ওষ্ঠে ফুটে উঠে তির্যক তীক্ষ্ণ মৃদু হাস্য রেখা, কখনো ঠাট্টা বিদ্রূপের তোড়ে কাউকে বা কিছুকে ভাসিয়ে নিয়ে যাওয়ার মতো কলহাস্যে আমরা ভেঙে পড়ি। কমেডির ভাষাও বহুরূপী : কাটা কাটা ক্ষুরধার বাক্যবাণ, দ্ব্যর্থবোধক হেঁয়ালীপনা, ভাঁড়ামীভরা কথার ফোয়ারা, অশ্লীল কৌতুক, কেচ্ছাকাহিনী, বিদগ্ধ খেলা, আবার কখনো হয়তো নিঃশব্দ মুকাভিনয়"।

—কবীর চৌধুরী, প্রসঙ্গ নাটক, পৃ. ১৪৭।

"...Generally it can be said to be a play that is light in tone, is concerned with issues tending not to be serious, has a happy ending and is designed to amuse and provoke laughter."

[মূলত দর্শকদের আনন্দদানের উদ্দেশ্যে হাল্কা বিষয় অবলম্বনে রচিত হাল্কা চালের নাটক]

—এড্রইন উইলসন, পৃ. ৪১০।

প্রহসন

কমেডির উপশাখাবিশেষ। তুলনামূলকভাবে অগভীর ও হাল্কা রসাত্মক। "It aims to entertain, to provoke laughter. Its humour is the result primarily of physical activity and visual effects, and it relies less on language and wit than do so-called higher forms of comedy."

[আনন্দ দান ও হাস্যোদ্রেকের উদ্দেশ্যে রচিত। প্রধানত অঙ্গভঙ্গির মাধ্যমে হিউমার সৃষ্টির প্রচেষ্টা গৃহীত হয়। কমেডির মতো বাকচাতুরী এবং উইট এর খেলা থাকে না।]

—এড্রইন উইলসন, পৃ. ৪১২

ট্র্যাজি-কমেডি

ট্র্যাজেডি এবং কমেডি উভয় ধরনের নাটকের উপাদান সমৃদ্ধ। নাটকের মূলসুর ট্র্যাজিক কিন্তু সমাপ্তিতে থাকে আনন্দঘন পরিবেশ। "... described as a tragic play that ends happily."

—রবার্ট কোহেন, পূর্বোক্ত, পৃ. =

মেলোড্রামা

"... a suspenseful, plot-oriented drama featuring all good heroes, all bad villains, simplistic dialogue, moral conclusions, and bravura acting."

[সাসপেন্স-পূর্ণ, প্লটপ্রধান নাটক। এ নাটকে নায়কেরা সবাই ভালো। সবাই ভিলেন ভীষণ মন্দ। সংলাপ সাদাসিদে, উপসংহার নৈতিক উপদেশপূর্ণ। চড়াগলার উদাত্ত অভিনয়।]

—কোহেন, পৃ.২৩২।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

"... any dramatic play which presents an unambiguous confrontation between good and evil. Characterisation is often shallow and stereotypical, and because the conflict is externalised, action and violence prominent in melodrama, usually culminating in a happy ending meant to demonstrate the eventual triumph of good."

[ভাল এবং মন্দের দ্বন্দ্ব-কেন্দ্রিক নাটক। চরিত্রায়ণ অগভীর এবং গতানুগতিক। যেহেতু নৈতিক দ্বন্দ্বের বহিঃপ্রকাশ ঘটে, সেহেতু এ্যাকশন এবং ভায়োলেন্স প্রাধান্য পায়। প্রায়শ 'শুভ'-এর বিজয় দেখানোর জন্য নাটকের পরিণতি হয় আনন্দঘন।]

—এড্রইন উইলসন, পৃ. ৪১৩।

প্লট

ই. এম. ফর্স্টার 'Aspects of the Novel' গ্রন্থে উপন্যাসের প্লট নিয়ে যে কথাগুলো বলেছেন— নাটকের প্লট প্রসঙ্গে সে-কথাগুলো ভেবে দেখা যেতে পারে :

"We have defined a story as a narrative of events arranged in their time sequence. A plot is also a narrative of events, the emphasis falling on causality. 'The king deed, and then the queen died', is a story. The king died, and then the queen died of grief', is a plot. The time-sequence is preserved but the sense of causality overshadows it... Consider the death of the queen. If it is in a story we say and then? If it is in a plot we ask why?

[কাহিনী হচ্ছে কালানুক্রমিকভাবে সাজানো ঘটনার বর্ণনা। প্লটেও ঘটনার বর্ণনা থাকে, কিন্তু জোর পড়ে কার্যকারণের ওপর। 'রাজা মারা গেছেন এবং তারপর রাণী মারা গেছেন'— এটা হচ্ছে কাহিনী; রাজা মারা গেছেন এবং তারপর রাজার শোকে রাণী মারা গেছেন— এটা হচ্ছে প্লট। টাইম সিকোয়েন্স রক্ষিত হলো বটে, কিন্তু কার্যকারণ তাকে ছাড়িয়ে গেল। ... রাণীর মৃত্যুপ্রসঙ্গ বিবেচনা করুন। কাহিনীতে এ প্রসঙ্গ এলে আমরা বলি, "অতঃপর?" পক্ষান্তরে প্লট-এ এ-প্রসঙ্গ এলে, আমরা বলি, "কেন"?] — পৃ. ৯৩-৯৪।

"A story is a complete account of an episode or sequence of events, but a plot is what we see on stage"—

[কাহিনী হচ্ছে, কোন এপিসোডের পূর্ণাঙ্গ বর্ণনা, পক্ষান্তরে প্লট হচ্ছে আমরা মঞ্চে যা দেখি তা]

—এড্রইন উইলসন, পৃ. ১৪৫।

ক্লাইমেটিক এবং এপিসোডিক প্লট

"...The climatic and episodic forms each other in their fundemental approaches. The one emphasizes constriction and compression on all-fronts; the other takes a far broader view and aims at a cumulative

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

effect, piling up people, place, and events—"

—এ. উইলসন, পূর্বোক্ত পৃ. ১৬।

এ দুয়ের পার্থক্য নিম্নরূপ (উইলসন অবলম্বনে) :

	ক্লাইমেটিক	এপিসোডিক
০১.	প্লট দেরিতে শুরু হয়। ক্লাইম্যাক্স অথবা সমাপ্তির আগে।	প্লট তাড়াতাড়ি শুরু হয় এবং অনেক এপিসোড নিয়ে অগ্রসর হতে থাকে।
০২.	সময়ের পরিধি কম। কয়েক ঘণ্টা। বড় জোর কয়েকদিন।	সময়ের পরিধি বেশি। কয়েক সপ্তাহ, কয়েক মাস এমন কি অনেক বছর।
০৩.	তিন অঙ্ক বিশিষ্ট। প্রত্যেক অঙ্ক একটি দীর্ঘ দৃশ্য।	ছোটবড় অনেক দৃশ্যের সমন্বয়।
০৪.	সীমাবদ্ধ জনপদে, একটি ঘরে অথবা একটিমাত্র কক্ষে ঘটনা সংঘটিত হয়।	সমগ্র শহর অথবা অনেক দেশ জুড়ে ঘটনা সংঘটিত হতে পারে।
০৫.	আটজনের বেশি চরিত্র থাকবে না।	মাঝে মাঝে ডজন-ডজন চরিত্র।
০৬.	প্লট এক রৈখিক। শাখা কাহিনী কম।	একই সাথে দুটি সমান্তরাল কাহিনী থাকতে পারে।
০৭.	চরিত্র এবং ঘটনাবলি কার্যকারণসূত্রে আবদ্ধ।	বাহ্যত কারণ ছাড়া অনেক কারণের ফলে একটি ঘটনা সংঘটিত হতে পারে।

এপিক থিয়েটার

এ রীতির প্রবক্তা হিসেবে বের্টল্ট ব্রেশটের নাম সর্বাধিক পরিচিত। এপিক থিয়েটার

"...aimed at the intellect rather than emotions, seeking to present evidence regarding the social questions in such a way that they may be objectively considered and an intelligent conclusion reached. Brecht felt that emotional involvement by the audience defeated this aim and he used various devices designed to produce an emotional alienation" of the audience from the action on stage. His plays are episodic, with narrative, songs separating the segments and large posters or signs announcing the various scenes.

— এ. উইলসন, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪১১।

এপিক থিয়েটার সম্বন্ধে ব্রেশট্-এর উক্তি (নাগরিক নাট্য সম্প্রদায়ের একটি পুস্তিকা থেকে):

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

নাটকীয় থিয়েটার	এপিক থিয়েটার
কাহিনী নির্ভর	বর্ণনাশ্রয়ী
দর্শককে মঞ্চক্রিয়া দ্বারা মোহাচ্ছন্ন করে তার প্রতিক্রিয়াকে খর্ব করে।	দর্শককে পর্যবেক্ষকে পরিণত করে তার প্রতি ক্রিয়ার ক্ষমতাকে বাড়িয়ে দেয়।
দর্শককে রোমাঞ্চিত করে।	দর্শককে সিদ্ধান্ত নিতে অনুপ্রাণিত করে।
অভিজ্ঞতা নির্ভর।	সচিত্র বিবরণ।
দর্শক সবকিছুর সাথে একাত্ম হয়ে যায়।	দর্শককে সবকিছুর মুখোমুখি দাঁড় করানো হয়।
ইঙ্গিতবাহী।	তর্কপ্রধান।
সহজাত অনুভূতিকে লালন করে।	অনুভূতিকে বুঝতে সাহায্য করে।
দর্শককে ঘটনার কেন্দ্রবিন্দুতে নিয়ে গিয়ে তাকে অভিজ্ঞতার আদান-প্রদানে লিপ্ত করা হয়।	দর্শক বাইরে দাঁড়িয়ে বিশ্লেষণ করে।
মানুষকে স্বতঃসিদ্ধভাবে গ্রহণ করা হয়।	মানুষকে নিরীক্ষার বিষয় হিসেবে গ্রহণ করা হয়।
মানুষ পরিবর্তনশীল নয়।	মানুষ পরিবর্তনশীল এবং পরিবর্তনক্ষম।
পরিণতি প্রধান।	প্রতি দৃশ্যই স্বয়ংসম্পূর্ণ।
পরিণতি।	চিত্রগাথা।
সরল গতি।	বক্ররেখায় অগ্রগতি।
পূর্ব নির্ধারিত অভিব্যক্তি।	অনির্ধারিত অভিব্যক্তি।
মানুষ একটি জড় বিন্দু।	মানুষ একটি প্রক্রিয়া।
চিন্তাই অস্তিত্বের নির্ধারক।	সামাজিক অবস্থান চিন্তার নির্ধারক।
অনুভূতি।	যুক্তি।

(ভারশুল "রচনা ২", বার্লিন ১৯৩০ থেকে উদ্ধৃতি)

চরিত্র

"Every object has three dimensions : depth, height, width. Humanbeings have an additional three dimensions : physiology, sociology, psychology. Without a knowledge of these three dimensions we cannot appraise a humanbeing"

—লাজোস এগরি, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৩।

চরিত্র-সৃষ্টির জন্য এগরি প্রদত্ত ছক (পৃ. ৩৬-৩৭) :

Here is a guide then, a step-by-step outline of how a tridimensional character bone structure should look.

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

Physiology

01. Sex
02. Age
03. Height and weight
04. Color of hair, eyes, skin
05. Posture
06. Appearance : good-looking, over or underweight, clean, neat, pleasant, untidy. Shape of head, face, limbs.
07. Defects : deformities, abnormalities. Birthmarks. Diseases.
08. Heredity

Sociology

01. Class : lower, middle, upper.
02. Occupation : type of work, hours of work, income, condition of work, union or nonunion, attitude toward organization, suitability for work.
03. Education : amount, kind of schools, marks, favorite subjects, poorest subjects, aptitudes.
04. Home life : parents living, earning power, orphan, parents separated, vices, neglect. Character's marital status.
05. Religion.
06. Race, nationality.
07. Place in community : leader among friends, clubs, sports.
08. Political affiliations.
09. Amusements, hobbies : books, newspapers, magazines he reads.

Psychology

01. Sex life, moral standards
02. Personal premise, ambition
03. Frustrations, chief disappointments
04. Temperament : choleric, easygoing, pessimistic, optimistic.
05. Attitude toward life : resigned, militant, defeatist.
06. Complexes : obsessions, inhibitions, superstitions, phobias.
07. Extrovert, introvert, ambivert.
08. Abilities : languages, talents.
09. Qualities : imagination, judgment, taste, poise
10. I.Q.

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

This is the bone structure of a character, which the author must know thoroughly and upon which he must build.

কোরাস
মূলত গ্রিক নাটকের সমবেত শিল্পী। মূল দায়িত্ব, বিশেষ ঘটনা-পরিস্থিতিতে দলবদ্ধভাবে মন্তব্য প্রদান করা। সাম্প্রতিক বাংলা নাটকে জনতা-দৃশ্যে কোরাস ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

বিবেক
কোরাস-সদৃশ চরিত্র। বাংলা যাত্রায় বহুল ব্যবহৃত। সাধারণ গানের মাধ্যমে বিবেক মন্তব্য প্রদান করে থাকে।

সূত্রধার
নাটকের প্রস্তাবক। নাট্য-উপস্থাপকও বলা যেতে পারে। পাশ্চাত্য নাটকের ন্যারেটর। ব্রেশটের নাটকে এবং ব্রেশটের অনুসরণে রচিত নাটকে বহুব্যবহৃত।

প্রস্তাবনা (Prologue)
নাটকের পরিচিতিমূলক বক্তব্য। নাটক শুরুর আগে কোন শিল্পী দ্বারা উপস্থাপিত।

সমাপ্তিভাষণ (Epilogue)
নাটক-শেষে কোন শিল্পী প্রদত্ত ভাষণ, নাটকের বিষয় ও বক্তব্যের সাথে সম্পর্কিত।

ক্লাইমাক্স/ক্রাইসিস/ উৎকর্ষ
"যেহেতু পরস্পর বিরোধী দুটি সংঘাত চিরকাল চলতে পারে না, তাই নাটকের কাহিনীকে এমন একটা স্তরে নিয়ে যেতে হয় যেখানে কোনো একটি শক্তি প্রাধান্য পায় এবং সেই শক্তিটিই জয়ী হয়। নাট্যকাহিনীর গতিপথে আবির্ভূত এই সন্ধিলগ্নটিকেই বলে উৎকর্ষ বা ক্রাইসিস বা ক্লাইম্যাক্স। যেখানে কাহিনী একাধিক সংঘাতের ধারায় ক্রমান্বয়ে গতিশীল সেখানে ওই সংঘাতগুলির মধ্যে প্রধান সঙ্কটটিকেই "উৎকর্ষ' বলতে হবে। তবে সূচনা-প্রারম্ভ-প্রবাহ-উৎকর্ষেরা ক্রমোন্নয়নের মধ্যবর্তী ব্যবধান সব সময় একরকম নয়। কাজেই সব নাট্যক্রাইসিস একই সময় আসে না।

[উজ্জ্বলকুমার মজুমদার, পৃ. ১১৩]

ঐতিহাসিক নাটক
ঐতিহাসিক ঘটনা ও চরিত্র অবলম্বনে রচিত নাটক। ইতিহাসের সত্য অক্ষুণ্ন রেখে 'কল্পনা'র আশ্রয় গ্রহণ করা যেতে পারে। চরিত্র সৃষ্টির সময় 'কবি তব

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

মনোভূমি/রামের জনমস্থান অযোধ্যার চেয়ে সত্য যেনো'— রবীন্দ্রনাথের এ বক্তব্যের অনুধাবন আবশ্যিক।

পৌরাণিক নাটক

পুরাণ-অবলম্বনে রচিত নাটক। রামায়ণ, মহাভারত, ইলিয়ড, ওডিসির বিভিন্ন চরিত্র অথবা যে-কোন পুরাণ অবলম্বনে এ ধরনের নাটক রচিত হতে পারে।

সামাজিক নাটক

পৃথিবীর যে-কোন নাটকই আসলে সামাজিক নাটক। কেননা, যে-কোন নাটকেই সমাজ প্রতিফলিত হতে পারে। তবু সমসাময়িক সমাজের বিশেষ বিশেষ সমস্যা প্রাধান্য পায় মূলত পরিবার-কেন্দ্রিক। বিধবা-বিবাহ সমস্যা, যৌতুক সমস্যা ইত্যাদি সামাজিক নাটকের বিষয়বস্তু হতে পারে।

যাত্রা

বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী নাট্য-মাধ্যম। সংলাপে সংগীতের প্রাধান্য। যাত্রামঞ্চের চারদিক খোলা অর্থাৎ, দর্শক মঞ্চের চারপাশে বসতে পারেন। সংলাপ বলার ভঙ্গি নাটক থেকে ভিন্ন।

পালাগান

লোকনাট্য বিশেষ। একজন মূল গায়ক ও দু-তিন জন দোহার থাকেন। মূল গায়ক একাই বিভিন্ন ভূমিকায় অভিনয় করে থকেন। মাঝে মাঝে দোহারগণও বিভিন্ন চরিত্রে পরিণত হন।

পথনাটক

মূলত রাজনৈতিক সচেতনতা জাগাবার উদ্দেশ্যে রচিত প্রতিরোধের নাটক। এমনভাবে রচিত হয় যাতে মঞ্চ ছাড়াও যে-কোন স্থানে এমন কি পথেও অভিনীত হতে পারে। মুক্তবুদ্ধি সম্পন্ন দেশ-সচেতন নাগরিক গড়ে তোলাই পথনাটকের উদ্দেশ্য।

মুক্তনাটক

বাংলাদেশের 'আরণ্যক নাট্যদল' প্রবির্তত নাট্যাঙ্গিক। মুক্তনাটকে লিখিত কোন পাণ্ডুলিপি থাকে না। আলোক-সজ্জাবিহীন এ ধরনের নাটকে গ্রামের খেটে খাওয়া মানুষেরা নিজেদের সমস্যা নিজেরাই তুলে ধরে। মুক্তনাটকের অন্যতম উদ্দেশ্য জনগণকে শ্রেণী-সচেতন করে তোলা।

গ্রাম-থিয়েটার

বাংলাদেশের 'ঢাকা থিয়েটার' প্রবর্তিত নাট্যান্দোলন। 'গ্রাম-থিয়েটারে'র অন্যতম উদ্দেশ্য শহরকেন্দ্রিক নাটক মঞ্চায়নের পাশাপাশি বাংলাদেশের গ্রামগুলিতে নাটকের দল গঠন। তাদের নাটকের বিষয়বস্তু আঞ্চলিক ও সার্বজনীন সমস্যাভিত্তিক। তাদের

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

বক্তব্য, 'নাটকে অবশ্যই সমসাময়িক সামাজিক সমস্যা, অনাচার, অত্যাচার, মানুষের সুখ-দুঃখ, জয়-পরাজয়, জীবন-মৃত্যুর কথা থাকবে'।

তৃতীয় থিয়েটার *(থার্ড থিয়েটার)*
পশ্চিমবঙ্গের নাট্যকার বাদল সরকার প্রবর্তিত নাট্যান্দোলন। তাঁর মতে, "থিয়েটারকে ফ্রি করতে গেলে নগরনাট্যের মঞ্চ, দৃশ্যসজ্জা, আলোকসম্পাত, সাজ-পোষাক ইত্যাদি উপকরণ ব্যবহার করা সম্ভব নয়। এই দ্বিতীয় কারণেও প্রোসেনিয়া মঞ্চ ছেড়ে নেমে আসার প্রয়োজন আছে। তৃতীয় বা বিকল্প থিয়েটারের জন্ম এ কারণেই ঘটেছে। সংক্ষেপে বলতে গেলে এর রূপ নমনীয় (flexible) বহনীয় (portable) এবং সুলভ (INEXPENXIVE) থিয়েটার। দৃশ্যসজ্জা, আলোকসম্পাত, সাজ-পোষাক ইত্যাদি বাহ্য উপকরণ ছেড়ে দিলে, পুরো জোরটা পড়ে নাটকর্মীর শরীরের উপর, মানসিকতার উপর"।

[থিয়েটার ফ্রন্ট— প্র.৪৯।]

পুওর থিয়েটার
"A term coined by Jerzi Grotowski to describe his ideal of theater stripped to its barest essentials. The lavish sets, lights and costumes usually associated with the theater, ... merely reflect base materialistic values and must be eliminated. If theater is to become rich spritually and aesthetically, it must first be "poor" in everything that can attract from the performer's relationship with the audience" (গ্রটোওস্কি প্রবর্তিত পরিভাষা। এ থিয়েটারে, সামগ্রী ব্যবহারে ন্যূনতম প্রয়োজনের ওপর জোর দেয়া হয়। ব্যয়বহুল সাজসজ্জা, আলোকসম্পাত এবং পোষাক-পরিচ্ছদ তাঁর মতে বস্তুতান্ত্রিক মূল্যবোধের পরিচায়ক। এসব বর্জন করতে হবে। থিয়েটারকে যদি আধ্যাত্মিক এবং নান্দনিক অর্থে 'ধনী' হতে হয়, তাহলে দর্শক এবং অভিনয়শিল্পীর মাঝে সম্পর্ক স্থাপনে বাধা সৃষ্টি করে এ-রকম সব বাদ দিয়ে 'পুওর' হতে হবে)।

[—এ উইলসন, পৃ. ৪১৪।]

এ্যাবসার্ড নাটক
"দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর সময়ে জীবনের শূন্যতা, একাকিত্ব, আত্মবিচ্ছিন্নতা, ঈশ্বর-বিচ্ছিন্নতা, নৈঃসঙ্গ্য, অন্তহীন ক্লান্তি, অর্থহীন ভবিষ্যৎ এবং অস্তিত্বের দুর্ভর যন্ত্রণা উপস্থাপনে একদল নাট্যকার সচেতনভাবে এ্যাবসার্ড আঙ্গিকে নাটক নির্মাণ করেন। এই নাটকে চরিত্র-বিশ্লেষণের সূক্ষ্মতা কিংবা ঘটনাংশের ক্রমবিকাশ থাকে না; বরং তার জায়গায় পাই কাব্যময়তা আর প্রতীকী ব্যঞ্জনাময় পরিণাম-চিত্র। প্রচলিত নাটকের মতো দ্বন্দ্ব ও সংঘাত, চরিত্রের টানাপোড়েন ও ক্রমবিকাশ, নাটকীয় বাঁক-পরিবর্তন এবং সংলাপের সঙ্গতি থাকে না এ্যাবসার্ড নাটকে" ([illegible] ঘোষ, সাহিত্য পত্রিকা, আষাঢ় ১৩৯৪, পৃ. ১০১)।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

"In the Theatre of the absurd, the audience is confronted with actions that lack apparent motivation, characters that are in constant flux and often happennings that clearly outside the realm of rational experience. Here, too, the audience can ask, what is going to happen next? But anything may happen next, so that answer to this question cannot be worked out according to the rules of ordinary probability based on motives and characterization that will remain constant throughout the plays. The relevant question here is not so much what is going to happen next but what is happenning."

[এ্যাবসার্ড নাটকে দর্শকবৃন্দ সাধারণত উদ্দেশ্য বিবর্জিত এ্যাকশন-এর মুখোমুখি হন। চরিত্রসমূহ অনবরত পরিবির্তত হতে থাকে। নাটকের ঘটনাবলি প্রায়শ যৌক্তিক অভিজ্ঞতার সীমা অতিক্রম করে যায়। এ নাটকেও দর্শক জিজ্ঞেস করতে পারে, "অতঃপর কি ঘটছে?" কিন্তু যে-কোন কিছুই ঘটতে পারে পরবর্তীতে। সম্ভাব্যতার নিয়ম অনুসরণ করে প্রশ্ন উথাপন করে লাভ নেই, কেননা পুরো নাটকে উদ্দেশ্য এবং চরিত্রায়ণ একই রকম নাও থাকতে পারে। কি ঘটতে যাচ্ছে— এটা এতটা প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন নয় বরং কি ঘটে চলেছে এটাই বড় কথা—]।

[মারটিন এসলিন, দি থিয়েটার অব দি এ্যাবসার্ড, পৃ. ৪০৬]

সহায়ক গ্রন্থাবলি

নাট্যতত্ত্ব বিচার : দুর্গাশঙ্কর মুখোপাধ্যায়, কলকাতা, ১৩৯১।

নাট্যতত্ত্ব মীমাংসা : সাধন কুমার ভট্টাচার্য, কলকাতা, ১৯৬৩।

প্রসঙ্গ নাটক : কবীর চৌধুরী, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী, ঢাকা ১৯৮১।

বাংলাদেশের সাহিত্য ও অন্যান্য প্রসঙ্গ : সৈয়দ আকরম হোসেন, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৫।

বিষয় চলচ্চিত্র : সত্যজিৎ রায়, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ১৯৭৬।

শেক্সপিয়ার : সত্যপ্রসাদ সেনগুপ্ত, পুঁথিপত্র, কলকাতা, ১৯৭৪।

সাহিত্যর রূপ-রীতি : উজ্জ্বল কুমার মজুমদার, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, কলকাতা, ১৯৮৫।

An introduction to the study of literature : William Henry Hudson, George G. Harrap and Co. Ltd. 1961.

Aspects of the novel : E.M. Forster, Penguin Books, 1966.

The art of dramatic Writing : Lagos Egri, The Writer, Inc. Boston, 1960.

The Theatre Experience : Edwin Wilson, Megraw-Hill Book Company, 1985.

Theatre : Robert Cohen, Mayfield Publishing Company, 1981.

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

পরিশিষ্ট

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

নাটকের করণকৌশল : পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়

সৈয়দ শামসুল হক

'পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়' মঞ্চের জন্যে লেখা আমার প্রথম নাটক; প্রথম এই অর্থে, মঞ্চে অভিনীত হবে— সচেতন সেই ভাবনা নিয়ে লেখা। একেবারে কিশোর বেলায়, তখন আমি ক্লাশ টেনের ছাত্র, জে বি বড়ি গোলা নীল কালিতে পেতলের নিবওয়ালা কলম ডুবিয়ে একটি নাটক লিখেছিলাম 'নিশি হলো ভোর' নামে— বিষয় ছিল, এখন পেছনের দিকে তাকিয়ে সেই বয়সের পক্ষে বিস্ময়কর বলে মনে হয়, ভারত-বিভাগ— আজ এত বছর পরেও আমার আঙুল অপেক্ষা করছে এ বিষয়টিকে নাটকে পাবার জন্যে। তারপর, ষাটের দশকের শেষ দিকে টেলিভিশনের জন্যে বেশ কটি নাটক লিখি শহীদ মনিরুল আলমের প্ররোচনায়। এর কোনোটিকেই আমি নাটক রচনার অন্তর্গত বলে এখন আর মনে করি না, বরং বলা যেতে পারে ও সবই ছিল আমার শিক্ষানবিশী।

০২.

'পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়'— লিখেছিলাম দেশ থেকে বহুদূরে বসে, এক কামরার ছোট একটি ঘরে, শীতার্ত লন্ডন নগরীতে; শীত ভেঙে তখন সেখানে নেমে আসছে গ্রীষ্মকাল, গাছের পাতাগুলো আবার উঁকি দিচ্ছে মরা ডাল থেকে, কিন্তু বৃষ্টি, সে বছর উনিশ শ পঁচাত্তর সাল— বৃষ্টি আমাদের তুমুল তাড়া করে ফিরছিল, তাই শীত যদিও কমবার কথা— কমেনি; আমি ভোরে উঠে কাজে বেরোই ছাইরঙা মোটা ট্রেঞ্চকোট পরে, পাতাল রেলের ইস্টিশানে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করি ট্রেনের হ্যাম্পস্টেডে। ট্রেন বড় দেরী করে আসে, লন্ডনের গভীরতম এই ইস্টিশানের প্ল্যাটিফরমে দাঁড়িয়ে মনে মনে রচনা করে চলি 'পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়'-এর সংলাপ, তারপর অফিসে পৌঁছেই নিচতলার ক্যান্টিন থেকে কফি নিয়ে পাঁচতলায় উঠে আমি আমার কামরায়, দ্রুত লিখে রাখি সদ্য রচিত সংলাপগুলো; তারপর ডুবে যাই কাজে, সন্ধ্যেয় ঘরে ফিরে রান্না ও আহার শেষে বিছানায় যাই; ছোট ঘর— টেবিলের সংকুলান হয় নি, বিছানায় আধো শুয়ে পা দেয়ালে ঠেকিয়ে হাঁটুর ওপর খাতা রেখে লিখে চলি; উনিশ শ পঁচাত্তর সালের পয়লা মে লিখতে শুরু করে তেরোই জুন মধ্যরাতে নাটকটি শেষ করে উঠি।

০৩.

একদা কলম হাতে নিয়েছিলাম কবিতা লিখব বলে, সেই কলম অচিরে গল্প খুঁজে পেয়েছে, উপন্যাসও অধরা থাকেনি, নাটক ও [illegible] এমন আশা আর করিনি— শেষ পর্যন্ত

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

নাটকও এলো স্বাধীনতার পর বাংলাদেশের নাট্যচর্চায় প্রাণিত হয়ে, বাংলাদেশের সমূহ বর্তমানকে ভাষামাধ্যমে আরো একটি স্তরে প্রকাশ করবার দরোজা দেখে এবং এলো সে কবিতার হাত ধরে, কবিতা, কারণ অনেকদিন থেকেই আমার মনে হচ্ছিল যে এই বর্তমানে, বাংলাভাষায়, খণ্ড কবিতার সব সম্ভাবনা আপাতত আমরা আবিষ্কার করে ফেলেছি, এখন একে কিছুদিনের জন্যে পাশে রেখে অন্যদিকে মুখ ফেরানো প্রয়োজন — হতে পারে মহাকাব্য, কথাকাব্য কিংবা কাব্যনাট্য।

কাব্যনাট্যই শেষ পর্যন্ত আমার করোটিতে জয়ী হয়; টিএস এলিয়েটের কাব্যনাট্যভাবনা আমাকে ক্রয় করে; আমি লক্ষ না করে পারি না যে আমাদের মাটির নাট্যবুদ্ধিতে কাব্য এবং সঙ্গীতই হচ্ছে নাটকের স্বাভাবিক আশ্রয়; আরো লক্ষ করি, আমাদের শ্রমজীবী মানুষের স্বাভাবিক প্রবণতাই হচ্ছে এক ধরনের কবিতাশ্রয়ী উপমা, চিত্রকল্প, রূপকল্প উচ্চারণ করা— আমাদের রাজনৈতিক শ্লোগানগুলো তো সম্পূর্ণভাবে ছন্দ ও মিল নির্ভর; লক্ষ করি, আমাদের সাধারণ প্রতিভা এই যে আমরা একটি ভাব প্রকাশের জন্যে একই সঙ্গে একাধিক উপমা বা রূপকল্প ব্যবহার না করে তৃপ্ত হই না; ময়মনসিংহগীতিকা, যা বহুদিন থেকেই আমি নাটকের পাণ্ডুলিপি বলে শনাক্ত করে এসেছি, আমাকে অনুপ্রাণিত করে; একই সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয় জীবনে পঠিত ধ্রুপদী গ্রিক নাটক আমাকে আচ্ছন্ন করে রাখে; শেক্সপিয়ার, যাঁর নাটকের কথা বাবা অক্লান্তভাবে বলে যেতেন একদা, আমাকে তীব্র আলোকসম্পাতের ভেতরে দাঁড় করিয়ে রাখে। এ সবই আমার করোটির ভেতরে খেলা করে, আমাকে পথের সন্ধান দেয়, আমার করণকৌশলের গভীরে গিয়ে কাজ করে, 'আমি পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়' কাব্যনাট্যে প্রবেশ করি।

০৪.

এই নাটকের বীজ আমি পেয়েছিলাম একাত্তরে আমাদের মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে বাস্তব একটি ঘটনা থেকে; কিন্তু সেই ঘটনা ঠিক কোথায় ঘটেছিল তা আজ শনাক্ত করতে পারব না; এমন ঘটনা বাংলাদেশে সেদিন প্রায় প্রতিটি এলাকাতেই ঘটেছিল বলে আমরা দেখতে পাবো; আমরা দেখতে পাবো যে, হানাদার পাকিস্তানি বাহিনীর সঙ্গে যারা সহায়তা করেছিল তাদের অনেকেই শেষ পর্যন্ত ঐ হানাদার বাহিনীরই শিকারে পরিণত হয়েছিল। 'পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়'-এর মূল ঘটনা তো এই যে— কোনো একটি গ্রামের মাতবর পাকিস্তানি সৈন্যদের মদদ জুগিয়ে যাচ্ছিল মুক্তিযোদ্ধাদের বিরুদ্ধে, মাতবরের ছিল যুবতী মেয়ে, পরাজয় নিশ্চিত জেনে পাকিস্তানি বাহিনী পিছু হটবার মুহূর্তে তাদের আঞ্চলিক অধিনায়ক এক ক্যাপটেন এসে মাতবরের মেয়েকে এক রাতের জন্যে চায়, মাতবর চমকে ওঠে, সে তো এই ক্যাপটেনকে বন্ধু বলে জেনেছে এবং তাকে যথাসাধ্য সাহায্য করেছে যুদ্ধে, তার কাছ থেকে এ রকম একটি প্রস্তাব আসবে সে দুঃস্বপ্নেও ভাবতে পারেনি, মাতবর যখন বুঝতে পারে যে ক্যাপটেন তার মেয়ের সম্ভ্রম নষ্ট না করে আঙিনা থেকে বিদায় নেবে না তখন সে তাকে অনুরোধ করে— 'আপনি এক রাতের জন্যে হলেও আমার মেয়েকে বিয়ে করুন'; ক্যাপটেন কি ভেবে রাজী হয় এবং মাতবর নিজেই মেয়ের সঙ্গে ক্যাপটেনের বিয়ে দেয়, ক্যাপটেন তার সম্ভ্রম হরণ করে সৈন্যসহ পালিয়ে যায়। পরদিন মুক্তিযোদ্ধারা যখন গ্রামের সীমান্তে এসে পৌঁছোয়

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

তখন গ্রামবাসীরা মাতবরের কাছে আসে সর্বশেষ পরিস্থিতি জানতে এবং এরই এক পর্যায়ে মাতবরের মেয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এসে গত রাতের ঘটনা প্রকাশ করে দেয় ও বিষপানে আত্মহত্যা করে, গ্রামবাসীরা এই প্রথম মাতবরের প্রকৃত চরিত্রটি উপলব্ধি করে ওঠে এবং বিজয়ী মুক্তিযোদ্ধাদের আগমনের কয়েক মুহূর্ত আগেই তারা তাকে হত্যা করে।

০৫.

গ্রামের খেটে খাওয়া মানুষই হচ্ছে এই নাটকের চরিত্র; আলাদা করে কোনো একজন নয়, মিলিতভাবে সকলেই; এবং মিলিতভাবে সকলেই বলে আমি এই নাটকের নির্মাণে প্রয়োগ করি বাংলাদেশের মানুষের মিলিত বা বলা যায় মাটির নাট্যবুদ্ধিকে। সৃষ্টির অনেকটাই অন্ধকারে বটে, তাকে ঠিক অংকের মতো যোগবিয়োগ বুঝিয়ে দেয়া যায় না; আমি রক্তের অন্ধকারে অনুভব করি, আমাকে যদি এ কাহিনী লিখতে হয় তাহলে কাব্যনাট্যই হতে হবে এর শরীর।

হ্যাম্পস্টেডের শীতার্ত প্ল্যাটফরমে দাঁড়িয়ে এক সকালে করোটির ভেতরে জন্ম নেয়া এই নাটকের প্রথম কয়েকটি পংক্তি। সেই পংক্তিগুলো ছিল এরকম—

'মানুষ আসছে দূর কালীপুর হাজীগঞ্জ থেকে
মানুষ আসছে আরো ফুলবাড়ি নাগেশ্বরী থেকে
মানুষ আসছে যেন যমুনার বান
মানুষ আসছে— তারা মহররমে ধুলোর সমান,
মানুষ আসছে দেখো ছিপ ডিঙি শালতি ভেলায়,
মানুষ আসছে কেউ লাঠি ভর দিয়ে খালি পায়'।

এইভাবে আমি সেদিন সকালে, সেদিন অফিস থেকে ফেরার পথে ট্রেনে সন্ধ্যেয় আরো কিছু পঙ্ক্তি রচনা করি সাহিত্যিক চলিতভাষায়। অভিনয় করলে মিনিট দশেকের মতো হবে— এতদূর লিখে ফেলবার পর এবং যেহেতু নাটক তাই একা ঘরে জোরে জোরে পংক্তিগুলো উচ্চারণ করে পরীক্ষা করে দেখবার পর অকস্মাৎ আমার মনে হয় যে, পংক্তিগুলো নীরক্ত, কৃত্রিম এবং অন্যপরে কি কথা—আমাকেই তারা কিছু বলতে ব্যর্থ। আমি মরুভূমিতে হঠাৎ নিজেকে দেখতে পাই এবং এমত মনে হয়, আর আমি অগ্রসর হতে পারব না। আমি তো এযাবৎ যা লিখেছি, পাঠক বা সমালোচকের কাছে ভালো-মন্দ যা-ই মনে হোক না কেন, প্রথমত, আমার কাছে তারা গ্রহণযোগ্য না হলে আমার সঙ্গেই তারা কথা বলতে না পারলে, আমি কাগজে কলম রাখিনি।

আমি ভাবতে থাকি এবং ভাবতে থাকি এবং আমি পরপর কয়েকটি দিন নিষ্ফলা কাটাই। তারপর এক মধ্যরাতে, বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মতো আমি বিছানায় জেগে উঠি, ঘুমের ভেতরে আমাদের চিন্তার প্রক্রিয়া থেমে থাকে না, ঘুমের ভেতরেই হয়তো আমি ভেবে চলেছিলাম পঙক্তিমালার কথা— জেগে উঠি এই স্পষ্ট বোধ নিয়ে যে, পঙক্তিগুলো নীরক্ত এবং বার্তাহীন, কারণ এ হচ্ছে নাটকের সংলাপ, জীবন্ত মানুষের সংলাপ এখানে এবং এখনই উচ্চারিত হবার অপেক্ষায় সে সংলাপ এবং এ সংলাপ গ্রামবাসীদের, কিন্তু পংক্তিগুলো রচিত হয়েছে সাহিত্যিক চলিত বাংলায়— তাই তারা কৃত্রিম। আমি বাতি জ্বেলে সেই ভোররাতেই খাতায় দ্রুত লিখে ফেলি—

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

'মানুষ আসতে আছে কালীপুর হাজীগঞ্জ থিকা
মানুষ আসতে আছে ফুলবাড়ি নাগেশ্বরী থিকা
মানুষ আসতে আছে যমুনার বানের লাহান
মানুষ আসতে আছে মহররমে ধুলার সমান,
মানুষ আসতে আছে ছিপ ডিঙি শালতি ভেলায়
মানুষ আসতে আছে লাঠি ভর দিয়া ধুলা পায়।'

একই টানে আমার কলম থেকে অতঃপর অনায়াসে বেরিয়ে আসতে থাকে— যেনবা আমার করোটির ভেতরে তারা কবে থেকেই রচিত হয়ে ছিল—

'মানুষ আসতে আছে বাচ্চাকাচ্চা-বৌ-বিধবা বইন
মানুষ আসতে আছে আচানক বড় বেচইন
আমগাছে আম নাই শিলে পড়ছে সব
ফুল গাছে ফুল নাই গোটা ঝরছে সব
সেই ফুল সেই ফল মানুষের মেলা,
সন্ধ্যার আগেই য্যান ভরা সন্ধ্যা বেলা'

তারপর থেকে আমার কলম আর অপ্রতিভ বোধ করেনি, দিনের পর দিন, প্রায় দেড়মাস ধরে আমি নাটকটি লিখে চলি এবং প্রতি রাতে যখন দিনের রচনাটুকু একা ঘরে জোরে জোরে উচ্চারণ করে নিজেকে শোনাই, তখন দেখি— পংক্তিগুলোর ধমনী দিয়ে তাজা উষ্ণ রক্ত বইছে এবং তারা আমার সঙ্গে কথা বলছে।

আসলে, প্রথম নাটক রচনা বলেই, আমি গোড়ার দিকে আদৌ ধরতে পারিনি যে— নাটক হয় জীবন্ত মানুষের স্বর নিয়েই রচিত— ছাপা পৃষ্ঠায় নাটক থাকে অনুপস্থিত, যেমন স্বরলিপি নয় বস্তুত কোনো গান; উচ্চারণেই তার মুক্তি, কণ্ঠেই তার জন্মগ্রহণ, মঞ্চেই তার জীবন। নাটক এমন যে, মঞ্চে কিছু জীবন্ত মানুষ, মঞ্চের বাইরে কিছু জীবন্ত মানুষ এবং এই দুই জীবন্ত সমাবেশের ভেতরে বয়ে যায় সৃষ্টির বিদ্যুৎ, সেই বিদ্যুৎ সম্ভব হয় কেবল তখনই জীবন্ত মানুষের অভিজ্ঞতা বর্ণিত হয় জীবন্ত ভাষায়— 'পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়'-এর মতো নাটকের ক্ষেত্রে গ্রামীণ মানুষের প্রতিদিনের ভাষায়।

০৬.

কিন্তু কেবল কি ভাষা? শুধু গ্রামীণ ভাষাতেই গ্রামীণ একটি ঘটনা নিয়ে নাটক লেখা— তাও হয় বটে নীরক্ত। ভাষার পেছনে থাকে ভাবনা-বিন্যাসের বিশেষ একটি বীজগণিত। তাই এ নাটক লিখতে গিয়ে আমি কেবল গ্রামীণ ভাষা ব্যবহার করি না, সেইসঙ্গে আমাকে প্রবেশ করতে হয় গ্রামীণ মানুষের, গ্রামবাংলার বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর ভাবনা প্রকাশভঙ্গির দীর্ঘ অভ্যেস ও ঐতিহ্যের ভেতরে। প্রথমেই বলতে হয়, উপমা বা তুলনার কথা— লক্ষ্য করা দুষ্কর যে, গ্রামের মানুষ উপমা ও তুলনা ব্যবহারে অকৃপণ— এ রকম একটি সিদ্ধান্ত আমার আছে যে, আমরা যতই শিক্ষিত হই এবং নাগরিক হয়ে পড়ি আমাদের উচ্চারণ থেকে উপমা ও তুলনার প্রয়োগ তত কমে যায়, আমাদের প্রকাশভঙ্গি ক্রমশ বিমূর্ত হয়ে পড়ে। নাগরিক মানুষ, শিক্ষিত জন যেখানে 'মানী মানুষের ইজ্জত করা চাই' বলে ক্ষান্ত হবে, গ্রামীণ মানুষ সেই কথাটি বলেই তৃপ্ত হবে না, বোধ করবে না যে সম্পূর্ণ বলা হয়ে গেল বরং এগিয়ে বলবে— যা আমি এ নাটকে কোনো এক জায়গায় বলিয়েছি—

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

'মানী মানুষের ইজ্জত করা চাই
বটগাছে যদি কুড়াল মারস, চৈত্রমাসে তার ছায়া নাই।'

এই যে বটগাছের ছেদন এবং ফলে চৈত্রমাসে তার ছায়ার অনুপস্থিতি— এই চিত্রটির আমদানী আগের বক্তব্যকে শুধু যে ধনীই করল তা নয়, আমার বিবেচনায় এর ভেতরের কথাটিকে আপ্তবাক্যের চরিত্র দান করল।

এ ছাড়া, আরো লক্ষ্য করি, আমাদের মাটির একটি প্রকাশ— ঐতিহ্য বা বিশিষ্ট কৌশল হচ্ছে— একই ভাবকে একাধিক, আরো বিশেষ করে চিহ্নিত করতে হলে, জোড়া জোড়া কখনো বা চারটি, উপমা বা রূপকল্প ব্যবহার করে প্রকাশ করা। এ এমন নয় যে, দুই বা চারটি উপমা একসঙ্গে ব্যবহার করে তারা পুনরুক্তি দোষ ঘটাচ্ছে, বরং এ এমন যে— একটি ভাবকে তারা দুই বা চারটি কোণ থেকে ঘুরিয়ে দেখেছে।

যেমন, এ নাটকের পীর সাহেব যখন বলছেন যে— মাতবর সাহেব অবশ্যই আসবেন গ্রামবাসীদের সঙ্গে দেখা করতে, কারণ তিনি দেশের পরিস্থিতি সম্পর্কে ভালো করেই জানেন, তখন ব্যাপারটি প্রকাশ করছেন একই সংলাপে পরপর চারটি উপমা দিয়ে—

'ঝড়ের খবর আগে পায় বড়গাছের ডাল
বানের খবর আগে পায় যমুনার বোয়াল
খরার খবর পয়লা জানে ছিলা-শকুনের বাপ
আর, জারের খবর পয়লা জানে আজদাহা সাপ।'

কিংবা স্মরণ করা যেতে পারে মাতবরের মেয়ের সংলাপ, যখন সে গ্রামবাসীদের বলছে তার জীবন বিপর্যয়ের কথা, বলছে ক্যাপটেন তার সম্ভ্রম নষ্ট করবার পর নিজের বর্তমানের কথা, বলছে— যেনবা এই রকম যে, আপনারা যেমন আমাকে এতকাল দেখেছেন। আমি আর সেই রকম নই, আমার শরীরে ও আত্মায় এক ভয়াবহ দাগ, সে দাগ প্রত্যক্ষ করা না গেলেও তার প্রতি ইঙ্গিত করে সে চারটি উপমা উপস্থিত করছে—

'যেমন মানুষ গেলে পথে চিহ্ন থাকে
আছে চিহ্ন আছে
যেমন বানের শেষে পাড়ে চিহ্ন থাকে
আছে চিহ্ন আছে
যেমন মারীর শেষে গায়ে চিহ্ন থাকে
আছে চিহ্ন আছে
যেমন হিমের শেষে ডালে চিহ্ন থাকে
আছে চিহ্ন আছে।'

০৭.

এই প্রসঙ্গে মিলের কথাটিও উল্লেখ করতে হয়। পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়-এর সংলাপ মিলযুক্ত— এবং এই মিল একান্তর নয়, যুগল পঙ্‌ক্তিতে তারা এসেছে। এটিও আমি গ্রহণ করেছি আমাদের লোকজ ঐতিহ্য থেকে; আমি লক্ষ করেছি যে, অনুপ্রাণিত মুহূর্তে আমরা, বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলে, সমিল উচ্চারণ করে থাকি; কখনো এই মিল অত্যন্ত নিকট ও পরস্পরনিবদ্ধ, কখনো বা অর্ধমিল, মধ্যমিল সমৃদ্ধ। আমাদের নাগরিক জীবনেও রাজনৈতিক শ্লোগানগুলো যে মিলযুক্ত হয়— দেয়ালের লিখন দ্রষ্টব্য— তা এ লোকজ

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

প্রতিভা, মাটির প্রতিভারই অন্তর্গত। আমার স্মরণ হয়, একাত্তরের পহেলা মার্চ ইয়াহিয়া খানের বেতার ভাষণ— যে ভাষণে তিনি সংসদ অধিবেশন স্থগিত করবার কথা ঘোষণা করেন— প্রচারিত হবার সঙ্গে সঙ্গে আমি, আলমগীর কবির ও জহির রায়হান— আমরা সেদিন একটি একটি পত্রিকা অফিসে বসে ছিলাম— পথে বেরিয়েই শুনতে পাই রাজপথে মিছিল নেমে পড়েছে এবং তারা তাৎক্ষণিকভাবে রচনা করে ফেলেছে, আকাশ কাঁপিয়ে শ্লোগান দিচ্ছে— 'ইয়াহিয়ার পাকিস্তান/ আজিমপুরের গোরস্তান'। সেই শ্লোগানটির পেছনে আমাদের মাটির নাট্যবুদ্ধির যে পরিচয় আমি পেয়েছিলাম তা এখনো আমার কাছে একটি প্রধান সূত্র হয়ে আছে।

০৮.

'পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়'-এর নাট্যকাঠামোর জন্যে আমি গিয়েছি গ্রিক নাট্যসূত্রের কাছে। সেই নাট্যসূত্র ধরেই আমি বাস্তবের ঘটনাকাল এবং নাটকের ঘটনাকাল এক ও অভিন্ন রেখেছি। এটি ছিল সচেতন একটি সিদ্ধান্ত। মাতবরের ট্র্যাজেডি, মুক্তিযুদ্ধে আমাদের আসন্ন বিজয়, মাতবরের মেয়ের আকাশচেরা জীবন উপলব্ধি— এসব নাটকে ধরবার জন্যে আমার প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল তীব্র টানটান একটি নাট্যসময়ের এবং সে সময় আমাকে দিতে পারে একমাত্র গ্রিক নাট্যসূত্র যার ভেতরে রয়েছে 'ইউনিটি অব টাইম'।

যৌবনে আলোড়িত হয়েছিলাম সফোক্লিসের 'রাজা ইদিপাস' নাটক পড়ে— সেই নাটকের মূল কাঠামো আমি সচেতনভাবেই আত্মসাৎ করেছি 'পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়' কাব্যনাট্যে। 'রাজা ইদিপাস' স্মরণ করলে পাঠক ও দর্শকের কাছে অচেনা মনে হবে না— 'ইদিপাস'-এ যেমন, তেমনি আমার নাটকেও শুরুতেই গ্রামবাসীরা উপস্থিত হয়ে চারদিকের অশুভ ও দুর্লক্ষণের বর্ণনা দিচ্ছে। ইদিপাসের মতোই পায়ের আওয়াজেও কোরাসের আহ্বানে মাতবর এসে উপস্থিত হচ্ছে এবং শেষ পর্যন্ত ঐ ইদিপাস নাটকের মতোই আমার নাটকেও উদ্ঘাটিত হচ্ছে ভয়াবহ একটি ঘটনা— ইদিপাসে তাঁর স্ত্রীর আসল পরিচয় যে সে ইদিপাসেরই জননী আর পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়-এ ক্যাপটেনের, যে ক্যাপটেন মাতবরেরই বন্ধু, তার হাতে মাতবরের মেয়ের সম্ভ্রমহানি। তবে একটি মৌলিক পার্থক্য এই যে, বরং এইটিই আলাদা করে দিয়েছে ইদিপাস থেকে পায়ের আওয়াজকে মৌলিকভাবে— নাটকের শুরুতে ইদিপাস আদৌ জানতেন না তাঁর জন্যে উন্মোচিত হবে এই নাটক কিভাবে, আর পায়ের আওয়াজের মাতবর যখন মঞ্চে আসেন তখন আর কেউ না জানলেও কেবল তিনিই জানেন মঞ্চ-সময়ের আগে কি ঘটে গেছে।

বলা বাহুল্য, কোরাসের ব্যবহারটিও 'রাজা ইদিপাস' তথা গ্রিক নাট্যসূত্র থেকেই গ্রহণ করি। কিন্তু এই কোরাসটির ধারণাও সম্পূর্ণ গ্রিক নয়; আমাদের লোকজীবনের দিকে দৃষ্টিপাত করলে দেখতে পাবো, গ্রামের যিনি প্রধান তাঁর 'দরবারে' উপস্থিত লোকসকলের উপস্থিতি যতটা না ব্যক্তিক তার অধিক সমষ্টিগত; গ্রামের দরবারে মানুষেরা যখন কথা বলে তখন একজন বললেও প্রায়শই তা হয় সমষ্টির পক্ষে উচ্চারণ। কাজেই 'পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়'-এ গ্রামবাসী বহিরঙ্গে গ্রিক হয়েও চরিত্রের দিক থেকে বঙ্গবাসী।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

০৯.

'পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়' মুক্তিযুদ্ধের নাটক হিসেবে পাঠক ও দর্শকের কাছে চিহ্নিত হলেও, সবশেষে কিন্তু সবচেয়ে গুরুত্বের সঙ্গে বলা দরকার যে— এ নাটক আমি একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের নাটক হিসেবে রচনা করিনি; একাত্তর এ নাটকে একটি পরিচিত ও আমাদের প্রত্যেকের জীবন-স্পর্শকারী পটভূমি মাত্র। আমি চেয়েছি এই মুক্তিযুদ্ধকে পটভূমি হিসেবে ব্যবহার করে আরো বড় একটি মুক্তির জন্যে দর্শককে প্রাণিত করতে— সে মুক্তিযুদ্ধ ধর্মীয় কুসংস্কারের বিরুদ্ধে, ধর্মের নৌকোয় নৈতিক অন্যায়কে পার করিয়ে দেবার যুগযুগান্তরের কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে।

এবং এখানেই আমি দৃষ্টি আকর্ষণ করবো মাতবরের মেয়ের দীর্ঘ তিনটি সংলাপের দিকে— যে সংলাপ উচ্চারিত হয়েছে গ্রামবাসীদের উদ্দেশ্যে কিন্তু রক্তমাংসে শেক্সপিয়ারের নাটকে স্বগতোক্তির সঙ্গে যার রক্তের মিল। মাতবরের মেয়ে বলছে, তার বাবা বিয়ের একটা অভিনয় করে ক্যাপটেনের হাত তাকে ধর্ষিত হবার জন্যে তুলে দেবার কথা স্মরণ করে—

'পাপ হাজারে হাজার
মানুষ নিশ্চিন্তে করে, সাক্ষী নাম সেই তো আল্লার।
না, কিছুতে বাজানের বাধে নাই
কারণ দিছেন তিনি আল্লার দোহাই।
তাঁর কাছে কবুল এ বিয়া,
কারণ তা করা হয় ঐ এক নাম নিয়া।
নাম, আর কিছু নাই, খালি এক নাম,
নিরাকার নিরঞ্জন নাম,
নামের কঠিন স্কারে লোহাও মোলাম
সেই এক নাম।
নামের তাজ্জব গুণে ধন্য হয় পাপের মোকাম;
চোরের আস্তানা হয় বড় কোনো পীরের মাজার।'

পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়— একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের নাটক নয়— এ নাটক আমি কল্পনা করেছি আরো বড়, আরো প্রয়োজনীয় একটি মুক্তিযুদ্ধের নাটক হিসেবে— সে জন্যেই এ নাটকের কথা প্রথম যখন ভাবি, যখন এর শরীর আমি প্রথম কল্পনা করি, করোটির ভেতরে শুরু করি মাতবরের মেয়ের সংলাপগুলো থেকে এবং সেই সংলাপকে ঘটনার চক্রে স্থাপিত করবার জন্যেই সজ্জিত করি অন্যান্য ঘটনা এবং সে ঘটনা— দখলদার বাহিনীর এক ক্যাপটেনের হাতে শেষ পর্যন্ত তাদেরই সাহায্যকারী এক ব্যক্তির বিনষ্টি— নতুন কোনো ঘটনা নয়, সে ঘটনা উদ্ভাবনের জন্যে প্রতিক্রিয়া প্রয়োজন হয় না, বাংলাদেশে বহুবার শোনা গেছে, পৃথিবীর সব দেশে সব যুগেই তা ঘটেছে, সংবাদ হিসেবে তা 'অতি সুলভ'।

নিজের সৃষ্টি হলেও বিনয় নিয়েই বলছি, সম্ভবত এই বৃহত্তর মাত্রাটির জন্যেই 'পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়' সমর্থ হয়ে উঠতে পেরেছে।

সৈয়দ শামসুল হক : বাংলাদেশের সব্যসাচী লেখক, অন্যতম প্রধান নাট্যকার।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

আমার নাট্যভাবনা

মমতাজউদ্দীন আহমদ

চতুর্দশ শতকের বঙ্গাব্দ শুরু হবার চল্লিশ বছর পরে আমি বঙ্গদেশের একটি অভিজাত গ্রামে জন্মগ্রহণ করি। আমার জন্মের আগে বাংলা নাটকের বড় বড় কাজগুলো হয়ে গেছে। বিশিষ্ট নাট্যকারদের উজ্জ্বল নাটকগুলো লেখাও হয়ে গেছে। রামনারায়ণ তর্করত্ন থেকে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত নাট্যকারদের প্রধান কাজ সম্পন্ন। অভিনয়ের একটা মান ও আকর্ষণও স্থির হয়েছে। শিক্ষিত অভিজাত পরিবার থেকে পুরুষ অভিনেতাও এসে গেছেন। বাংলা রঙ্গমঞ্চ তখন নাটকে ও নাট্যকর্মে খুবই মুখরিত। কুলীনকুল সর্বস্ব, কৃষ্ণকুমারী, বুড় সালিকের ঘাড়ে রোঁ, অবাক জলপান, অলীক বাবু, বিসর্জন, জনা, প্রফুল্ল, সাজাহান, কর্ণার্জুন, আলিবাবা, চিরকুমার সভা, সীতা, নীলদর্পণ প্রভৃতি নাটকের আয়োজনে তখন বঙ্গদেশ আলোড়িত।

তবে তখনো সিরাজউদ্দৌলাহ, পথের শেষে, নবান্ন, ছোঁড়াতার, নেমেসিস লেখা হয়নি। আমার জন্মের পরেই এসব নাটকের জন্ম।

আমার নাট্যচেতনার প্রাথমিক স্তর যখন চলছে, তখন লেখা হয়েছে কবর নাটকটি। বহিপীর, তরঙ্গভঙ্গ, প্রচ্ছদপট, মহুয়া, বেদের মেয়ে, ক্ষুধা, এবং ইন্দ্রজিৎ, অঙ্গার এগুলোর রচনা অনেক পরের কথা। আমি তখন নাট্যভাবনা ও কর্মের মধ্যে আচ্ছাদিত হয়ে আছি। ছেঁড়াতার, রক্তকরবী, টিনের তলোয়ার, বাকি ইতিহাস, মুখরা রমণী বশীকরণ ইত্যাদি বিষয়ে যখন তর্কবিতর্ক করি আর নাটকের প্রয়োজনা কর্মে নিজের চিন্তাভাবনা সঞ্চার করতে যাব, তখনই যুদ্ধ এসে গেল। বাংলাদেশ স্বাধীন হল।

আমি নিজে নাটক লিখছি ১৯৬০ সাল থেকে। অভিনয় করছি তারও আগে থেকে। নাটক নির্দেশনার শৃঙ্খলা সম্পর্কে সচেতন হয়েছি ১৯৭২-এর পর থেকে।

...ইউরেপীয় নাট্যসাহিত্য পাঠ করেছি। গ্রিক, জার্মান, ফরাসি, ইংরেজি নাট্যসাহিত্যের সঙ্গে বিভিন্ন সূত্রে আমার পরিচয়। ইউরোপ আমেরিকার বিভিন্ন দেশের নাট্য সম্পর্কেও আমার যোগাযোগ হয়েছে, চীনা জাপানি নাটক সম্পর্কেও প্রাথমিক পরিচয় আছে। সংস্কৃত নাট্যসাহিত্যের বিরাট ক্ষেত্র অনুবাদের মাধ্যমে পাঠ করার সুযোগ পেয়েছি। আর বাংলার পৌরাণিক, লৌকিক, ঐতিহাসিক, সামাজিক প্রায় হাজার দেড়েক নাটক পাঠ করা হয়েছে আমার। প্রায় একশ নাটকে অভিনয় করেছি। সব মিলিয়ে পঁচিশটি নাটকও লিখে ফেলেছি। আমার কালে বাংলাদেশের নাট্যচর্চা সম্পর্কে সবিশেষ অবহিত আছি। মঞ্চ, বেতার, টেলিভিশন ও সিনেমার চিত্রনাট্য প্রত্যেক ক্ষেত্রেই বিচরণ করার অধিকার অর্জন করেছি।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

...বাংলাদেশের নাট্যচর্চার অভিনব কোনো বিশেষ কিছু চাইনি আমি। তবে বাংলাদেশের নাটকে বাংলাদেশকে চেয়েছে আমার মন। আমি হৃদয় খুলে বসে আছি, দীর্ঘ ষাট বছর এমন নাটক দেখব আমি, যেখানে আমার প্রকৃতি, অরণ্য, পশু, মানুষ এবং আমার প্রেম কথা বলে। এমন ক্রন্দন দেখব, যেখানে আমার মায়ের ব্যাকুল দুটি আঁখি সজল হয়ে থাকে।

না, আমাদের নাটকে যত বেশি অনুসরণ, অনুকৃতি আর ছলনা যুক্ত হয়েছে, তত বেশি স্বদেশ যুক্ত হয়নি।

একটা দৃশ্য দেখার পরেই ভুলে যাই, শোনার পরেই সংলাপ হারিয়ে যায় এবং জীবনের আস্বাদ নেয়ার আগেই জীবন ভিন্ন হয়ে যায়। তাতেই আমি অধীর যন্ত্রণায় কাতর হয়ে উঠি।

আমাদের কি নিজের কোনো নাটক নেই? আমাদের নিজস্ব অভিনয় ধারা কি কোথায় সঞ্চিত নেই? আমাদের সংলাপ কি অনুচ্চারিত থেকে গেল? কিছু অভিজাত, কিছু সংস্কৃত এবং অধিকাংশ ইউরোপীয় নাট্যকৌশলের সমন্বয়ে গড়ে উঠেছে আমাদের দুশ' বছরের নাটক ও থিয়েটার।

মাত্র দুশ' বছর। তার আগে কি বাংলায় নাটক ছিল না, কোনো নাট্য স্বাদে আমাদের প্রাচীন দর্শকরা কি অভিভূত হতো না! আমাদের প্রায় জীর্ণ স্থবির জীবনে এমন কোন্ প্রলয় এসে আমাদের মরা গাঙকে চঞ্চল করে দিল যে, আমরা সকল প্রাণীহীনতাকে আগ্রাহ্য করে কালাপাহাড়ের শৌর্যে বেগবান হলাম? তাতে বাংলাদেশের নাটকেরই বা কী মুনাফা হল। কোন ফসলের আড়ম্বরে আমাদের শূন্য গোলা পূর্ণ হল?

আমি জানি নাটক নিয়ে বেশি কিছুই হয়নি। অনুমান করে বলছি, ১৮৫৪ থেকে ১৯৯৯ পর্যন্ত বাংলা ভাষায় প্রায় তিন হাজার নাটক রচিত হয়েছে। প্রায় ৫০০ জন নাট্যকার নাটক রচনা করেছেন। প্রায় ১০০টি নাটক মঞ্চে অসম্ভব রকম জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। কোনো কোনো নাটক হাজার রজনীর বেশি অভিনীত হয়েছে।

কর্ণার্জুন, মিশরকুমারী, রীতিমতো নাটক, কেরানির জীবন, সেতু এসব অতি জনপ্রিয় নাটকের সঙ্গে বাঙালির আদি নাট্যভাবনার সঙ্গে কতখানি যোগাযোগ ছিল? না অভিনয়, না বিষয়, না প্রযোজনা কোনো গুণেই এসব নাটক বাংলার মূল জীবন শক্তি ও ধারাবাহিক ভাবনার বিকাশ নয়। তবে কী হল এত কাল?

নিজস্ব নাট্যভাবনায় এই অতি জনপ্রিয় নাট্যকৌশলকে কখনই প্রশ্রয় দিইনি। আমার সাধ্য ও সাধনার অতীত ছিল জনপ্রিয়তা সংগ্রহের কলাকৌশল।

আমি সামাজিক সংলাপ এবং রাজনৈতিক পরিচয় সম্পর্কে শিকড়সন্ধানী এক সামান্য নাট্যকার। আমার কালকে যেমন গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করি তেমনি স্বদেশের দীর্ঘ সম্পদ ও শক্তিকেও সন্ধান করি। বিচ্ছিন্ন কোনো বোধ আমাকে তাড়িত করে না। বর্তমান ও অতীত আমার আয়ত্তে থাকলেই ভবিষ্যৎ আমার কাছে প্রদীপ্ত হবে। সেভাবেই আমার নাট্যসাধনা।

বাংলা নাট্যসাহিত্য সর্বতোভাবে আমাকে সুখী করেনি। আমাদের নাটকে সাহিত্য ও প্রয়োগের সমন্বয় ঘটেনি। নাটক ও থিয়েটারের বিবাহ না হলে ফল ভাল হবার নয়। নাটকবৃক্ষে সুফলটি এখনো ফলেনি।

গিরিশ ঘোষের [illegible] ত্রিশটি, রবীন্দ্রনাথের চল্লিশটি আর

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

দীনবন্ধু মিত্রের সাতটি নাটক। সকলই মহৎ নাটক নয়। বিচিত্র প্রয়োজন, উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যকে প্রধান করে এসব নাটক লেখা হয়েছে। মঞ্চ, দর্শক ও নাট্যকারের আনন্দের সহযোগ সর্বত্র সফলভাবে ঘটেনি বলে, আমাদের নাট্যসাহিত্য উজ্জ্বল হতে পারেনি। এর মধ্যে ব্যতিক্রম আছে। সবই বৃথা যায় নি। কিছু ফল অবশ্যই ফলেছে।

নাট্যরচনায় আমি এতসব উদ্যোগ, যোগ্যতা ও ব্যর্থতাকে দেখার ও উপলব্ধি করার সুযোগ পেয়েছি। গিরিশ ঘোষের সংকট, রবীন্দ্রনাথের দর্শন ও দীনবন্ধু মিত্রের জীবনবোধ সবই আমাকে আকৃষ্ট করেছে। নুরুল মোমেনের সংলাপ ও মুনীর চৌধুরীর নাট্যবোধ আমাকে প্রভাবিত করেছে। সবার মধ্যে বিচরণ করে চলার সুযোগ ছিল বলেই আমি ভালমন্দের বিশ্লেষণ করেছি। কিন্তু নাটক পাঠ করে, নাটকের প্রকৃত শক্তি উদ্ধার করা যেমন দুরূহ তেমনি নাটক দর্শন করে অন্যায় স্থানে মুগ্ধ হয়ে থাকার সংকটও কম নয়। পাঠ এবং দর্শনের বিভেদও সমন্বয় করার যোগ্যতা ও উপলব্ধি করার মধ্যেই প্রকৃত নাট্য সত্য লাভ করা যায়।

আমাকে দারুণভাবে আকর্ষণ করেছেন মধুসূদন, তাঁর প্রহসন দুটি দিয়ে। দীনবন্ধুর তিনটি নাটক আমার খুব প্রিয়—নীলদর্পণ, সধবার একাদশী ও নবীন তপস্বিনী। গিরিশ ঘোষের জনা, প্রফুল্ল ও বলিদান আমার ভাল লেগেছে। দ্বিজেন্দ্রলালের সাজাহানের সংলাপ আমাকে আকৃষ্ট করে। তুলসী লাহিড়ী আমার প্রিয় নাট্যকার। মুনীর চৌধুরীর কবর আমার খুবই প্রিয় নাটক তার নাট্যগুণের জন্য। উৎপল দত্ত অতি প্রিয় নাট্যকার, নাট্যসম্পদ ও সংলাপের অবারিত প্রকাশের জন্য।

আর আছেন মুকুন্দ দাস। তাঁর স্বদেশী যাত্রা খুব করে টেনে ধরে রাখে। এমন আত্মবিশ্বাসী সরল ও শক্ত রচয়িতার মতো অন্য কারো সন্ধান আমার জানা নেই। সর্বশেষে বলি রবীন্দ্রনাথের কথা। তাঁর সব নাটক নয়, অধিকাংশ নাটক আমাকে বড় বেশি রকম আচ্ছন্ন করে রাখে। ডাকঘর, রক্তকরবী তো অসংখ্যবার পাঠ করি। তাতে দেখি আমি আমাকে। আমার শব্দপ্রিয়তার যে যোগ্যতা, তাকে ছাপিয়ে কোথায় প্লাবিত করে দেয় আমাকে। রবীন্দ্রনাথের প্রহসন, শেষরক্ষা, চিরকুমার সভাও আমার প্রিয় সংলাপ। রবীন্দ্রনাথের রূপকগুলোর মধ্যেই বাংলার নিজস্ব নাটকের মৌল দৃশ্যের সন্ধান পাওয়া যাবে। হয় তো বলতে পারব, রবীন্দ্রনাথের মুক্তধারার পথ অনুসরণ করেই বাংলায় যথার্থ নাটক লেখা হবে। অবারিত পথ ও খোলা মঞ্চেই বসবে বাংলার নাট্যের আসর। অনেকটাই লোকনাট্যের ঢঙে।

আমি পথের সন্ধানে বের হয়েছি। কিছুদূর পথ অগ্রসরও হয়েছি। আমার সঙ্গে চতুর্দশ শতকের বাঙালি নাট্যকার ও বাংলা নাটক আছে। যতই সামনে তাকাই, সব আচ্ছন্ন ও মেঘ মেঘ দৃশ্যমান হয়।

পথচলার আনন্দে পথচলা আর ভাঙাচোরা পথে পা ফেলা এক কথা নয়। দুঃসহ কষ্ট হয়। হয়তো যন্ত্রণার অন্ধকার নিয়ে নিঃশব্দ হয়ে যাব।

পঞ্চদশ শতকের বাঙালি নাট্যকার কি মুক্তধারার পথে এগোতে পারবে? না পারার জন্য সংশয় তুলে ধরি না। পথই বলে দেবে পথ কোথায়। সে পথেই ধীরে অথচ সংকল্পের সাথে চলতে হবে বাংলার নাট্যসাধনাকে।

বাংলা নাটকের এবং বাংলাদেশের নাটকের বৃহত্তম ক্ষেত্র বাংলার লোকজীবন ও লোককাহিনীর মধ্যে। আর আছে সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনে বাঙালির জীবনধারার নিজস্ব

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

এ জাতির একটি গুণ, চরম বিপর্যয়ের সময়ও সহাস্য থাকে আর বড় সরস সংলাপ উচ্চারণ করে। এমন যে গুণ, তাকেই যোগান দিতে হবে যথার্থ উপাদান। নাট্যশক্তির সহায় হবে তেমন সব উপাদান।

বাংলাদেশের নাটকে ধর্মীয় পুরাণের ঐশ্বর্য বেশি পাওয়া যাবে না। কিন্তু পুরাণ ছাড়া কাহিনী হবে না। তাই লোকপুরাণের কাছেই আশ্রয় নিতে হবে। লোকপুরাণের মধ্যে যে আন্তরবিশ্বাস তাতে কোনো খাদ নেই। সব খাঁটি সোনা।

রবীন্দ্রনাথ লোকপুরাণ সন্ধান করতে সযত্ন ছিলেন। কিন্তু তাঁর এ বিষয়ে কাজ খুব বেশি নেই।

বঙ্গাব্দ শতাব্দীর বাঙালিকে খুব বেশি করে সে কাজটিই করতে হবে। নিজের জন্য, বাংলা নাটকের জন্য। আর তেমন কাজ করার জন্য বাংলাতে এখনি বড় এবং খাঁটি উদ্যোগ শুরু হয়েছে। সে বৃক্ষে পত্র এবং পুষ্পও এসেছে।

নাটক আর আমি

এক এক করে আমার কুড়িটি নাটকের বই বের হল। নানা বিষয় নিয়ে নাটক লেখার চেষ্টা করেছি। পুরাতন নাটক নতুন করে লিখেছি, উপন্যাস ছোটগল্পের নাট্যরূপ দিয়েছি, বিদেশী নাটকের রূপান্তর করেছি আর নিজের মতো করেও রচনা করেছি।

চিহ্নিত প্রতিপক্ষকে নির্দিষ্ট করে ভালবাসার নাটক, যুদ্ধের নাটক, সময়ের নাটক নানাভাবে কাজ করতে বসে বারবার মনে হয়েছে, দেশ আর দেশের কালসম্পদের মধ্যে নাটকের মূল শক্তি আছে। আরো মনে হয়েছে, প্রসেনিয়ম থিয়েটারের সীমানা অস্বীকার করতে পারলেই লোকনাট্য অসীম সম্ভাবনায় বিকশিত হবে।

ঘেরাটোপ মঞ্চ আমার ভাল লাগে না। মঞ্চের সীমানা ছেড়ে বাইরে এলেই নাটক লোকালয়কে আত্মীয় করে নেয়। তেমন অভিজ্ঞতা আছে আমার। একাত্তর সালের মার্চ মাসে সাত আট দিনের ব্যবধানে খোলামঞ্চ দুটো নাটক করলাম। একটি এবারের সংগ্রাম, অন্যটি স্বাধীনতার সংগ্রাম। দর্শক আর দর্শকে ময়দান উপচে পড়েছিল। এক লাখ দর্শক। সবার সে কি উল্লাস আর সহযোগিতা! সময়টা ছিল আবেগ আর উত্তেজনাময়। স্বাধীনতার জন্য বাংলা তখন প্রমত্ত। লিখেছিলাম, বিশেষভাবে লোকনাট্য ফর্মে তখনকার জন্য নাটক।

প্রমত্ত, উদ্দীপ্ত আর আবেগমণ্ডিত দর্শকের জন্য ভাষা ও ব্যঞ্জনা সংগ্রহ করতে পারলে সহমর্মিতার অভাব বাংলাতে কখনো হয় না। বাংলার দর্শক চিরকাল আবেগ উত্তেজনার নিকট আত্মীয়। নিজেদের কথা নিজেদের মতো করে শুনতে পেলে ভালবাসা ঢেলে দেয়। তাই সাতঘাটের কানাকড়ি ক'রে তেমন ঢেলে দেওয়া ভালবাসা পেয়েছি।

...দীনবন্ধু মিত্র ১৮৬০ সালে নীলদর্পণ লিখেছেন। আর একশ বছর পরে ১৯৬০ সালে মহাজলোচ্ছাস নিয়ে আমি লিখেছি প্রথম নাটক। তো তখন থেকে প্রায় তিন যুগ হয়ে গেল। লেখালেখি হল, অভিনয় হল, নির্দেশনা হল। সংগঠন হল, দেশবিদেশ ঘোরা হল। ভালই কেটে গেল আমার নাট্যকর্মের কাল।

...এখনো আমার চূড়ান্ত নাটকটি লেখা হয়নি। লিখতে চাই বাংলার নাটক, স্বাধীনতার নাটক। তিন খণ্ডে লেখার পরিকল্পনা আছে। লিখতে পারবো তো তেমন

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

একটি দীর্ঘ নাটক! একটি কাব্যধর্মী লোকনাট্য যদি লিখে যেতে পারতাম, যদি মাটির নিচে শুয়ে সে নাটকের অভিনয়ধ্বনি শুনতে পেতাম তাহলে জীবনমরণ ধন্য হতো। বেঁচে আছি জীবনে, মরণেও বেঁচে যেতে পারলে, আমার মতো ভাগ্যবান আর ক'জন হবে। যে কজন হবে, তাদের সবার নিচে আমার নামটাও যদি লেখা থাকে, মুগ্ধ হয়ে যাব।

আমার নাটকে আমি

নাটক রচনার যোগ্যতা যার নেই, সে বড় ভাগ্যবান। সব নেশা ছাড়া যায়, নাটকের নেশা ছাড়া যায় না। এ বড় মরণ নেশা, এ বড় জীবন নেশা। একবার এ নেশায় ধরলে আর পালাবার পথ নেই। সফোক্লেস পারল না, শেক্সপীয়র পারল না, রবীন্দ্রনাথ, গিরিশচন্দ্র, বিজন ভট্টাচার্য কেউ পারল না। এত বলি, ছাড় হে ছাড়, নাটক ততই সহৃদয় বন্ধুর মতো, অনুগতা পত্নীর মতো, নির্মম শত্রুর মতো পিছু ছাড়ে না। যেখানে যাব, সেখানে সেও যাবে। খেতে বসেছি, পাশে এসে বসবে। ঘুমোতে গেলাম, মাথা জুড়ে জায়গা খুঁজে নেবে। যেন অতি আদরের পোষা বিড়াল। এত বলি যারে যা, কিন্তু যায় না। কখনও এসে লেপের মধ্যে ঢুকে বসে আছে।

আমার নাটক লেখার তিল পরিমাণ যোগ্যতা নেই। কেমন করে হবে! আমি কি নিজেকে চিনি, আমি আমার দেশকে জানি, আমি কি আমার মাতৃভাষার শত রূপ আর সৌন্দর্যকে চিনি? বাপে বলল, চল তোর বিয়ে দিয়ে দিই, আর আমিও বিয়ে করতে বসে গেলাম—এমন ধরনের বসে যাওয়াতে বিয়ে হয়, বাসররাত্রিও ঘটে, কিন্তু এমনভাবে নাটক রচনা হয় না।

নাটক বড় অভিমানী, নাটক বড় পাপী-তাপী। জ্বালিয়ে মারে। প্রথমেই বলবে, কাহিনী খোঁজ, পরে বলবে চরিত্র বানাও, তারপর বলবে কথা দাও, শেষে বলবে মঞ্চ সাজাও। একটা মহাযুদ্ধ বানাতে যত আয়োজন আর আড়ম্বর, তার শতাধিক সম্ভার না হলে নাটক হবে না। ঈশ্বর যে রোজ রোজ এত এত জীবজন্তু প্রাণী আর লতাপাতা বানায়, তা কেবল একজন ঈশ্বর বলে বানাতে পারে। ঈশ্বর একবার দুবার বছরের জন্য মানুষ হয়ে মানুষের পৃথিবীতে আসুক, আর রাজা ইডিপাস ও হ্যামলেট বানিয়ে দেখাক, তখন বুঝবে কত ধানে কত চাল। অত সোজা নয়। ঈশ্বরগিরির একটা ফর্মেট বা ছাঁচ আছে। ধপাধপ সে ছাপ মেরে মানুষ আর জন্তু সৃজিত হয়, কিন্তু মানুষের পৃথিবীতে মানুষ এসে কত ক্রিয়াকাণ্ডের সংগে মিলেমিশে এমন সব মিশমার করে ফেলে যে, একটা ওথেলো কি একটা নোরা বানাতে গিয়ে শত রাত্রির আরাম হারাম হয়ে যাবে।

তবু যারা পারে, তারা বুঝি সৃষ্টির আলাদা সৃষ্টি। শেক্সপীয়র যে পাঁচশ রকম মানুষ বানাল, সে যে কত নির্মম, নির্মোহ আর নির্ভয় কাজ, যাদের সৃষ্টির কাজে সামান্য ধারণা নেই, তারা কিছুই জানতেও পারবে না।

মধুসূদন দত্ত তো বড় কবি। তার কাব্য থেকে নাটকের কাজ অনেক বড় কাজ। ভক্তপ্রসাদ বা ফতেমা চরিত্র, ভীমসিংহ আর ধনপতি সৃষ্টি করতে তিনি যত ভাবনা ভেবেছেন, তত মেঘনাদ আর সরমা নিয়ে ভাবতে চাননি। কাব্যের নায়ক আর নাট্যের নায়কের মধ্যে মহাদূর ব্যবধান। একজন সমুদ্রতীরে বসে মহানন্দে সাগরের ঢেউ

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

দেখছে, আর অন্যজন সংসার নদীতীরে এসে দুদণ্ড দাঁড়াবার পর্যন্ত সময় পায় না। খালি কাজ কাজ আর কাজ। চারদিকে ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার সীমাহীন দুঃখ বেদনা ও প্রেম ভালবাসার হাজার রকম ছলাকলা।

মানুষ যদি নিজেকেই খুঁজে নিতে না পারে, তবে নাট্যকার কোন্ মায়ামন্ত্র গুণে এত এত মানুষ আবিষ্কার করবে? যাদের দিয়ে পারা হয়, তারা সহজেই পারে। হয়তো কোনো অলৌকিক ক্ষমতার আশীর্বাদের গুণে তেমন ক্ষমতা এসে যায়। আর যারা জোর করে, জেদ করে, ঈর্ষা অথবা দম্ভ করে রচনা করতে বসে, তারা বারবার বিড়ম্বিত হয়। ঐ যে কথা আছে, পা থাকলে চলা যায়, চোখ থাকলে দেখা যায় কিন্তু হাত থাকলেই লেখা যায় না—তেমনি লিখতে বসলেই নাটক লেখা হয় না। এতো আর বউ এর গালে চুমা খাওয়া, বা মামার বাড়ির আব্দার নয় যে, বসলাম, লিখলাম আর জগৎ জয় করলাম।

নাটক রচনায় আমার অলৌকিক যোগ্যতার কোনো অধিকার নেই। আমি ঘর পালানো কোনো শেক্সপীয়র নই। আমি জমিদারের হরিণ চুরি করিনি অথবা গ্রামার স্কুলে মাত্র এবিসিডি শিখিনি। অথচ অতি সামান্য থেকে আশ্চর্য রকম অসামান্য হয়ে উঠেছেন শেক্সপীয়র। কেরানিগিরি করার গিরিশচন্দ্র হলেন মঞ্চাধ্যক্ষ, সেখান থেকেই নাট্যকার। আর রাজনীতির প্রাঙ্গণ থেকে বেরিয়ে এলেন বিজন ভট্টাচার্য। কেমন করে যে মুনীর চৌধুরী, উৎপল দত্ত আর সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ হওয়া যায়, সবটা আমার জানা নেই। এঁরা কঠোর তপস্যা করে নাট্যকার হয়েছেন, তেমন বলি না। তবে দিনরাত চব্বিশ ঘণ্টা ছিলেন নাটকের ঘোরে। আরো দশটা কাজ করছেন বটে, তার মধ্যেও নাটককে মন থেকে, ভাবনা থেকে কখনই মুছে ফেলতে পারেননি। তাতেই আমরা তাঁদের পেলাম। আমাদের নাট্যজগৎ ধনী হল।

আমার নাট্যকর্মের সংগে সাধনা হয়তো নেই, কিন্তু দিনরাত্রির মজদুরী আছে। যেখানে যাই সেখানে আমার সংগে নাটক যায়। পড়ছি উপন্যাস, কিন্তু ভাবছি নাটক। লিখছি নিবন্ধ, গুছিয়ে নিচ্ছি নাটক। কথা বলছি বিজ্ঞান, এসে গেল নাটক। এই নাটক আমাকে বারবার তারই ঘরে, আঙিনায়, কাছারি ঘরে, একরকম জোর করে, বাধ্য করে, লোভ দেখিয়ে ধরে নিয়ে আসে। সবার কাছে এত গালমন্দ খাই, এত নিন্দা শুনি, এত কলরব শুনি তবু নাটককে আমি ছাড়তে পারি না। নাটকও আমাকে ছাড়ে না।

নাটক কি আমার সতেলা ভাই না যমজ ভাই—এখনো বুঝে উঠতে পারলাম না। এই নিয়েই কেটে গেল পঞ্চাশ বছর। মঞ্চে, বেতারে, টেলিতে, সিনেমাতে এভাবেই নাটক নাটক করে জীবনপাত করলাম। মরলাম কি বাঁচলাম, তার হিসেব করার সহাস নাই। কালের হাতে বন্দি আমি। আমার দশা আমারই নিয়তি ও কর্মের সংগে জোট বেঁধেছে। তবে তারা যা করবে, করে নিক। আমি হাল ছেড়ে বসে আছি। আমার মা বলতে বলে গেছে, ওরে হতভাগা, নাটক তোকে সোনা দানা কিছুই দেবে না, তুই খালিখালি মরতে মরবি।

হ্যাঁ আমি মরেই আছি। এ মরণে যে কত সুখ, এ মরণে যে কত প্রণয় সে কথা জননীকে জানাব যদি পরকালে সত্যি তার দেখা পাই।

চুয়াত্তর সালে লিখলাম, ফলাফল নিম্নচাপ। শেষ দৃশ্যে এসে থমকে গেলাম। দুরন্ত যুবক রাজুর ফাঁসি হবে। অধ্যাপক বাবা জেলখানায় এসেছেন, শেষ সন্ধ্যায়

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

পুত্রকে শেষ দেখার জন্য। আর এখানে এসেই আটকে গেলাম। খুঁজে পাইনে সংলাপ। কে কী বলবে? পিতা বলবে প্রথমে, না পুত্র বলবে আগে? যেই বলুক, প্রথম বাক্যটি কী হবে, কেমন হবে! তোলপাড় আমার মনে মনে। সমগ্র চেতনালোকে সে বাক্যটির সন্ধান করলাম। কাব্য পড়লাম, ধর্মগ্রন্থ পড়লাম। রাত নটা থেকে রাত দুটা—মাত্র একটি অমোঘ বাক্য সন্ধানের আশায় বারান্দার এধার-ওধার ঘুরে মরলাম।

আমার রচনাকর্মের ভয়ংকর সমালোচক আমার প্রিয় পত্নীর কাছে বাক্যের আশায় ছুটে গেলাম। তিনি অঘোর ঘুমে নীরব রইলেন। আমিও ঘুমোতে গেলাম। বাক্যটি আমার জন্য কোনো মর্মানুভব জানাল না। ভোর রাত্রে যেন একজন এসে জানিয়ে গেল,—শেষ বাক্যটি গ্রহণ কর। আমি ব্যাকুল আগ্রহে কাগজ কলম নিলাম। তিনি কিছুক্ষণ নীরব থেকে বললেন, পিতা বলবে পুত্রকে, কেমন আছ।

দুর্লভ 'কেমন আছ' শুনে আমার চিত্ত আলোকিত হল। আমি বেঁচে গেলাম। আমার ফলাফল নিম্নচাপ নাটকের 'কেমন আছ' আজও আমার কাছে সর্বাধিক প্রিয় সংলাপ। এমন আলোড়িত অমোঘ ও অনুপম সংলাপ আমি আর রচনা করিনি। হয়তো আর পারব না।

উনিশ শো ষাট সালে লিখেছি জীবনের প্রথম নাটক তবু আমরা বাঁচব। সেবার প্রবল জলোচ্ছ্বাসে চট্টগ্রাম, নোয়াখালি মুহূর্তে অতলে তলিয়ে গেল। প্রবল তাড়ণে তীরের দুলাখ মানুষ নিমিষে লবণপানিতে ডুবে মরল। ঝাঁকে ঝাঁকে কইমাছ যেমন পড়ে থাকে, তেমনি ঝাঁক ঝাঁক লবণাক্ত মানুষের কালো লাশ কিনারে এসে বারবার ধাক্কা খেয়ে যায়।

ধাক্কা দেখে শুনে, আমার বারবার বিবমিষা হল। অন্যরকম হয়ে গেলাম। আমার স্বাভাবিক জীবনবোধ ভারসাম্য হারাতে বসল। দ্রুত সিদ্ধান্ত নিলাম, ভয়াবহ চট্টগ্রাম ছেড়ে পালিয়ে যাব।

যাওয়া হল না। অধ্যক্ষ সাহেব বললেন, সাহায্য তহবিলের জন্য নাট্য রচনা করে দিন, মনের ভার কিছুটা কমবে। লিখলাম অর্ধেক নাটক অর্ধেক শ্যাডো। সে নাটক রূপান্তর করলাম মঞ্চ থেকে বেতারে। দশ নম্বর মহাবিপদ সংকেত কথাটি বার দুয়েক নাটকে বসানো হল। বেতারে তা প্রচার হল নাটকের সংলাপ হিসেবে।

মুহূর্তে মহাকলরব পড়ে গেল। নির্মল আকাশের মধ্যে আকস্মিক মহাবিপদ সংকেত শুনে গভীর সমুদ্রের জাহাজ ও নৌকা নিরাপদ তীরের দিকে ছুটে এল। পরের দিন সংবাদপত্রে সে সংবাদ ছড়িয়ে গেল। বেতার কর্তৃপক্ষ নাটকের সংলাপের জন্য আরো বড় কর্তাদের কাছে কড়া শাসন পেলেন।

এত দর্শক, এত উৎসাহ, এমন প্রাণময়তা আর কখনো দেখিনি। একাত্তর সালের পনেরো মার্চের মধ্যরাতের কথা বলছি। লালদীঘি মাঠে, আশপাশে, পাহাড়ে উপত্যকায় খালি মানুষ আর মানুষ। সংখ্যাতে লাখের বেশি। এবারের সংগ্রাম নাটকটি অভিনীত হচ্ছে। এই আমার প্রথম রাজনৈতিক বিষয়ের নাটক। পাকিস্তানের জেনারেল আর সেনাপতির চরিত্র দুটিকে দর্শক নাজেহাল করে ছাড়ল। এ নাটক ট্র্যাকে নিয়ে প্রতি রাতে তিন চার জায়গায় সমগ্র সহস্র দর্শকের সামনেও অভিনীত হয়েছে।

লিখেছি সাতঘাটের কানাকড়ি। স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে প্রথম প্রবল কণ্ঠের নাটক। এক দর্শক দেখে গিয়ে [illegible] ঠায়। এক মহিলা এসেছিলেন বিদেশ

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

থেকে। নাটক শেষে আমাকে কাছে পেয়ে কদমবুসী করে বললেন, স্বৈরাচার শাসক আমার স্বামীকে অপমানিত করেছিল। অন্যায়ের বিরুদ্ধে এতদিন কথা বলতে পারিনি, আজ নাটক দেখে সে প্রতিবাদ করার সাহস সঞ্চয় করলাম।

আবার সুবিধাবাদী কিছু অনাবশ্যক আগ্রহী বুদ্ধিবাদী মানুষ দেখা হলেই বলতো, টিকিট পাঠাবেন তো, সাতঘাটের কানাকড়ি দেখব। পাঠিয়েছিলাম টিকিট, কিন্তু ওরা আসেনি। পাছে নাটক দেখার অপরাধে এরশাদের বিরাগভাজন হয়। এরশাদের আমল যাবার পর অবশ্য এরা এসেছিল। নাটক দেখেছিল। আর ফিসফিস করে অভিনন্দন জানিয়ে বলেছিল, শো চালিয়ে যান, আর কোনো ভয় নেই। এই সুযোগবাদী মানুষগুলো এখন হরহামেশা নাটকে নন্দনতত্ত্ব আর বস্তুতন্ত্র নিয়ে বড় বড় উপদেশ বিতরণ করে। আমি নির্বাক শ্রোতা, মজা করে তাদের উপদেশামৃত পান করি।

লিখেছি বটবৃক্ষের ধরম করম। সবে মঞ্চে এসেছে। আমার রাজনৈতিক চেতনার বড় রকমের প্রকাশ। মৌলবাদ ও সুযোগবাদের বিরুদ্ধে আমার অসংকোচ প্রকাশ। ভালকে ভাল আর মন্দকে মন্দ বলেছি। শ্রেণী-সমাজ চরিত্রের প্রাথমিক পাঠে আমি দেশ ও মানুষকে যেভাবে অভিজ্ঞতা, অভিমান, রুষ্টতা ও নির্ভয়তা দিয়ে চিনেছি, এ নাটকে সবকিছু তেমনভাবে অকপটে কথা বলেছি।

নন্দনতত্ত্ব ও শিল্পতত্ত্বের মন গড়া ছলনা ও চাতুরি আমার কাছে মূল্যহীন। আমি নাটকের প্রয়োজনে নাটক লিখি কিন্তু জীবনের প্রার্থনা ও সত্যকে গোপন করি না। নাই বা বাঁচলাম এ জীবনে। কী হবে কৃত্রিম বায়ু নিয়ে বেঁচে থেকে। নাটকে আমি বর্তমানকেই সর্বকাল বিবেচনা করি। চিরন্তন তাই হবে, যা বর্তমানকে ধারণ করবে। আমার জননী, আমার সহচর, আমার শত্রু আমারই কালের। তাদের অতীত আর ভবিষ্যৎ নেই। বর্তমানই আমার নাটক। তাকে নিয়েই আমার কারবার। বর্তমানে বাঁচলেই আমার নাটক ভবিষ্যতের হবে।

আমার নাটকে আমি আছি, আমার সাম্প্রতিক আছে। তাতেই আমার সাধনা। যদি আমি সত্য হই, তাহলে আমি বাঁচব। যেমন শেক্সপীয়র, ইবসেন, মিলার বেঁচে আছে। তেমনি আমিও বাঁচব। মৃত্যুর পরে বেঁচে থাকলেই আমি ধন্য হব। তেমন না হলে কী লাভ আমার নাট্যরচনার। আমি তো বর্তমানের এক চারণ। যে বর্তমান আমার দেশের কান্না আছে, হাহাকার আছে, রৌদ্র আছে, সেই দেশেরই নাট্যকার আমি।

অন্য হবার সাধ নেই আমার।

আমার নাটকের নায়িকা

একটি নাটক নিয়ে কিছু স্বপ্নের কথা বলব।

একুশের ভাষা আন্দোলন আর সেজন্য যে মহৎ কিছু মৃত্যু হয়েছে তার মধ্যে একটি মৃত্যুকে নিয়ে একটি নাটক লিখেছি। নাটকটি টেলিভিশনে অভিনীত হয়েছে, রেডিওতে হয়েছে। সে বই ছাপিয়ে বের হয়েছে।

নাকটটি পশ্চিমবাংলা থেকেও পুনর্মুদ্রিত হয়েছে। একুশের বিষয় নিয়ে লেখা বলেই লেখাটার এক রকম সমসাময়িকতার গুণ আছে। একুশের সাহিত্য নিয়ে আলোচনা করার উদ্দেশ্যে, টেলিফোনে এ নাটকটি নিয়ে তথ্য সংগ্রহ করে নিয়েছেন

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

একজন গবেষক।

লেখাটির সাহিত্য মূল্য বিচারের জন্য একটি কথাও বলছি না। আমার সে উদ্দেশ্যও নেই। রচনাটি নিয়ে আমার মধ্যে কী কী স্বপ্ন দানা বেঁধে আছে, তার দু একটা কথা বলব।

নাটকটির নাম বিবাহ। একুশের আন্দোলনে রফিক নামে জনৈক ছাত্র নিহত হয়েছেন। শোনা গেছে রফিক মানিকগঞ্জ কলেজের ছাত্র। তার বিয়ে ঠিক হয়েছিল। তিনি বিবাহের কেনাকাটা করার জন্য রাজধানী ঢাকাতে এসেছিলেন।

ভাষা আন্দোলনের জন্য ১৪৪ ধারা ভাঙা আর মিছিলের সংবাদ পেয়ে মহকুমা শহরের যুবক ছাত্র রফিক বিয়ের কথা ভুলে গেলেন। বিয়ের বাজার করতে গেলেন না। সরাসরি মেডিক্যাল কলেজের কাছে চলে এলেন। মিছিলে যোগ দিলেন গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে ভাষার জন্য শ্লোগান দিলেন। সরকারি পুলিশের মৃত্যুদূত এক গুলি এসে তার মাথায় ঢুকে গেল। রফিক পড়ে গেলেন। ছাত্ররা ধরাধরি করে রফিককে হাসপাতালে নিয়ে এল। শরীর রক্তে ভিজে গেছে। মগজ গলে পড়ছে। নার্স ছুটে এল, ডাক্তার এল।

রফিক অনেক আগেই মরে গেছেন। ভাষার জন্য মফস্বল শহরের একজন ছাত্র জীবন দিলেন। সম্ভবত তিনি প্রথম শহীদ।

সেদিন রাত্রে তার দুলাভাই, জানালার ফাঁক দিয়ে মরা রাখা ঘরে রফিকের নির্জীব দেহটা দেখলেন। চিনলেন, হ্যাঁ, তাঁরই শ্যালক, বিবাহের বর রফিক। রফিকের বুক পকেটে একটি রাজা ঝর্ণা কলম ছিল। কলম দেখে দুলাভাই নিশ্চিত হলেন। তারপর কী হল! রফিকের লাশ নিয়ে পুলিশ চলে গেল। গভীর রাতে নামহীন একটি জায়গায় রফিকের সে কবর সত্যি সত্যি হয়েছে কিনা, সঠিক বলতে পারব না। রফিক হারিয়ে গেলেন। রফিকের কবরের কোনো চিহ্ন নেই।

আলো অন্ধকার, সাদাকালো, জানাঅজানা ঘটনা মিশিয়ে, রফিককে প্রধান চরিত্র করে একটি নাটক লিখেছি, নাটকের নাম বিবাহ।

রফিক সম্পর্কে তথ্যের সন্ধান করিনি। রফিকের গ্রামের বাড়ি যাই নি, তার বৃদ্ধা মায়ের সঙ্গে দেখা করিনি। ভাইবোনদের সঙ্গে পরিচিত হইনি।

ঢাকা থেকে মানিকগঞ্জ এখন মোটেই দূরের পথ নয়। দিনে গিয়ে দিনেই ফেরা যায়। মানিকগঞ্জ কলেজের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক রফিক সম্পর্কে একটি তথ্যনিষ্ঠ মোটা বই রচনা করেছেন। আমি সে বইটি পড়ে দেখি নি। তার আগেই বিবাহ রচনা করা হয়েছে। ঘটনার কঠিন স্থূল বাস্তবাতার কাছে যেতে চাইনে। সেখানে যাব না।

নাটকের বিষয় ভাষা আন্দোলন। অধিক বিষয় হল, রফিকের সঙ্গে যে মেয়েটির বিবাহ স্থির হয়েছিল, সেই মেয়েটিকে গভীরভাবে সযত্ন পরিচর্যা করে আমার নাটকে এনেছি।

আমি যেভাবে এনেছি, তার সঙ্গে কঠিন বাস্তবের হয়তো কোন মিলই নেই। আমি যে সংলাপ তার মুখে তুলে দিয়েছি, তার সঙ্গে সে মেয়ের বাস্তব জীবনের সংলাপের কোন সম্পর্কই হয়তো নেই। সম্ভাব্য সত্য এবং বাস্তব সত্যের মধ্যে কোন যুদ্ধ করার ইচ্ছাই পোষণ করি নি।

মনে মনে ধরে নিয়েছি, মেয়েটির নাম নিশ্চয় সখিনা। সখিনা ছাড়া ওকে জুলেখা, রাবেয়া বা সাবেরা কিছুই ভাবতে পারি নি।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

আমার নাটকের সখিনা, মহকুমা হাকিমের অফিসের কেরানির মেয়ে। সখিনা দশম শ্রেণীর ছাত্রী। তার পাগলা গোছের রাজনীতি-পাগল এক মামা আছে। লোকটি প্রগতিশীল। নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারে আর যেমন হয় তার মধ্যে সব আছে। সখিনার গায়ে হলুদ হয়ে গেছে। মাত্র দু দিন পরে বিয়ে হবে। বর রফিক গেছে ঢাকা শহরে বিয়ের জামা-কাপড় কিনতে। সেখানেই সে মারা গেছে।

সখিনার গায়ের হলুদের রঙ তখনো ম্লান হয়নি। শাড়িতে ছোপ ছোপ হলুদ লেগে আছে। তখনই খবর এল হবু স্বামী রফিক মারা গেছে।

এখানে মেয়েটিকে মূর্ছিতা করেছি, তাতে নাটকের প্রথম অংক শেষ। দ্বিতীয় অংকে যখন নাটকের দৃশ্য উত্তোলন, তখন অনেক বছর কেটে গেছে। সখিনা তার বড় মামার মেয়ের বিয়েতে এসেছে। সখিনা আর সেই কিশোরী নয়। এখন পরিপূর্ণা রমণী। এক এক করে মামাতো বোন দোলার বিয়ের সমস্ত আয়োজন করে দিল। দোলা বিয়ের পরে স্বামীর ঘর করতে চলে গেল। ভোরের ট্রেন স্টেশন ছেড়ে চলে যাচ্ছে।

পুকুরপাড়ে সখিনা একা বসে আছে।

ছোট মামা রাজনীতি-পাগল সেই লোকটি এল। সখিনা ছোট মামাকে দেখে ম্লান হাসি হাসল। মামা বলল, হ্যাঁরে সখিনা, দোলার বিয়েতে তুইতো সবকিছু বিলিয়ে দিলি। কী নিয়ে থাকবি এখন?

সখিনা বলল, আমি স্মৃতি নিয়ে থাকব মামা। সেই এক দিনের স্মৃতি। আমার বিয়ের স্মৃতি।

মামা বলল, তোর তো সেদিন বিয়েই হয়নি রে সখিনা।

সখিনা বলল, হয়েছিল মামা, আমার বিয়ে হয়েছিল।

আমার নাটকের কাহিনী অনুসারে শহীদ রফিকের বউ আর বিয়ে করে নি। ভাষা আন্দোলনের অন্যতম শহীদ বীর রফিকের সম্ভাব্য স্ত্রী যে কিনা, বিয়ে না করে চির বৈধব্যের মহিমা নিয়ে নাটকে দীপ্তিময়ী হয়ে বেঁচে আছে। আমি সে মেয়েটির বাস্তব অবস্থার খোঁজ নিতে আগ্রহী নই।

না, ভুল বললাম। খোঁজ নিয়েছিলাম। রফিকের দুলাভাই এর সঙ্গে, রফিকের ছোট ভাই রশীদের সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে। তাদের সঙ্গে বসে বিস্তর আলোচনা করেছি। রফিকের কবর কেন চিহ্নিত হল না, সে বিষয়ে ওদের কথোপকথন শুনেছি। মনে হয়েছে, কী একটা রহস্য ঘেরা অবস্থার হাতে ওরা তখন বন্দি হয়েছিল। রফিকের জন্য কবর নির্দিষ্ট করতে ওদের অসুবিধা ছিল। আর রফিকের জন্য মনোনীতা সে কিশোরী মেয়েটি, যে মেয়ের গায়ে হলুদ হয়েছিল—সে মেয়ের বিষয়ে ওরা আমাকে কি কিছু বলেছিল?

হ্যাঁ বলেছিল, কিছু কথা নিশ্চয় বলেছিল।

আমি কিছুই মনে রাখতে চাইনে। এখন আমার নাটকের সখিনা আমার কাছে চিরকাল সখিনা হয়েই থাকুক। সে অবস্থান থেকে তাকে বিচ্যুত করতে চাইনে। আমার স্বপ্নের মধ্যে সখিনা অবিনশ্বর হয়ে আছে। আমি তাই নিয়ে সুখদুঃখ রচনা করছি। অন্য আর কিছু চাইনে আমি। নাট্যকার হিসেবে আমার কাছে সেই রক্ত স্নাত স্মৃতি সম্পদে অনন্যা অসামান্যা এক প্রিয় রমণী হয়ে থাকুক।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

আমার নাটক লেখা

আমি প্রথম নাটক লিখি ১৯৬০ সালে। তখন চট্টগ্রামে ছিলাম।

ঘূর্ণিঝড় হয়ে গেল। লাখের ওপর মানুষ মারা গেল। অবিশ্বাস্য রকম ক্ষয়ক্ষতি। না দেখলে, আর সে প্রলয়ের মধ্যে না থাকলে বুঝাই যাবে না, কী ভয়াবহ কাণ্ড হয়ে গেল।

আমার মনকে আলোড়িত করে গেল সেই ঝড়। মনে হয়েছিল, সব ফেলে চট্টগ্রাম থেকে চলে যাব। কিন্তু যাওয়া হয়নি। তখনই মঞ্চের জন্য লিখেছিলাম, নাটক জাতীয় একটা কিছু। ঠিক নাটক নয়, কিছুটা প্রামাণ্য ঘটনার মতো। কিছু অংশে ছায়ানাট্য ছিল।

টিকিট করে নাটক। ছাত্ররা বাড়ি বাড়ি ঘুরে টিকিট বিক্রি করেছিল। সে নাটক দেখানো হল দু দিন। টাকাও উঠল। টাকা রিলিফ কাজের জন্য জমা দেওয়া হল। নাটকের নাম ছিল, তবুও আমরা বাঁচব। কিছুতেই যথার্থ নাটক বলা যাবে না এ রচনাকে।

এল বেতারের জন্য নাটক লেখার আহ্বান। চট্টগ্রামে বেতার বসেছে। অনুষ্ঠানও শুরু হয়েছে। বেতারের প্রথম নাটকটি লেখার আহ্বান পেলাম। লিখলাম, সাগর থেকে এলাম। সে পাণ্ডুলিপি কোথায় হারিয়ে গেছে। প্রথম বেতার নাটক লেখার সে বিচিত্র অভিজ্ঞতা আছে।

তখন থেকে লিখেই যাচ্ছি। মঞ্চের জন্য, বেতারের জন্য, টেলিভিশনের জন্য। রাজনীতির জন্যও লিখেছি। ১৯৭১ সালে মার্চ মাসে খোলা মঞ্চের জন্য দুটি নাটিকা লিখেছিলাম। এক লাখের মতো দর্শক নিশ্চয় হবে। আর এক নাটক লিখেছিলাম ২৩ মার্চের জন্য। অভিনীত হয়েছিল ২৪ মার্চ।

এবারের সংগ্রাম, স্বাধীনতার সংগ্রাম—দুটি নাটকেই বহু দর্শক সমাগম হয়েছিল। বর্ণচোরা বলে একটা নাটক লিখেছিলাম মঞ্চের জন্য। তাতে বর্ণচোরার অভিনয় করে খুব লাঞ্ছিত হয়েছিলাম। কে যেন স্যাণ্ডেল ছুঁড়ে মেরেছিল? লেগেছিল তলপেটে।

হাসির নাটক লিখেছি। আবার নাটক অনুবাদ করেছি, রূপান্তর করেছি। কঠিন বিষয় নিয়ে আধুনিক নাটকও লিখলাম। গল্প উপন্যাসকেও নাট্যরূপ দিয়েছি। মঞ্চে, বেতারে ও টেলিভিশনে সব মিলিয়ে ছোট বড়সহ অনেক নাটক লেখা হয়ে গেছে। তিন তিনটা মাধ্যমের জন্য লিখতে হয়েছে তো।

এত লেখার মধ্যে ভাল লেখা কটি হয়েছে? কটি রচনা সমকাল ছাড়িয়ে পরের কালে যাবে বলতে পারব না। যখন লিখি, তখন তো হেলাফেলা করে লিখতে পারি না। সে সময় যা ভাল লাগে, যা লিখে আনন্দ পাই, তাইতো লিখি। কালের পর বাঁচব কিনা, কি করে বলব।

একটা নাটকের কথা জানি, তার একটা এক লাইনের সংলাপ লেখার জন্য রাত দশটা থেকে রাত তিনটা পর্যন্ত খুব ভাবছিলাম। কী হবে সেই এক লাইনের সংলাপ—

আজ ভোরেই ছেলের ফাঁসি হয়ে যাবে। বাবা সন্ধ্যায় ছেলেকে দেখতে গিয়েছেন। তো শেষ দেখার সময় বাবা ছেলেকে কী বলবেন? ছেলেই বা কী বলবে বাবাকে?

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

কত-কী পড়লাম, কবিতা, গদ্য, কোরান, হাদিস, কিছুতেই মনে ঠিক কথাটা স্ট্রাইক করছে না। কী বলা হবে, কিছুতেই আসছিল না আমার মধ্যে। শেষে প্রায় কেঁদে ফেলেছিলাম। শেষে পেলাম সংক্ষিপ্ত সংলাপের কথাটা।

বাবা বললেন ছেলেকে, কেমন আছিস?

আর একটা নাটক। সেটা বেশ শক্তই ছিল। কিন্তু কেমন সরসর করে সংলাপ এসে গেল। তিনটা বসায় লেখা হয়ে গেল। বেশি কাটাকুটি করতে হল না। এ দুটো নাটকই আমাকে দেশ জুড়ে সবখানে পরিচিতি করিয়েছে। প্রথমটা ফলাফল নিম্নচাপ, দ্বিতীয়টা স্পার্টাকাস বিষয়ক জটিলতা।

আর একটা নাটকের কথা বলি সেটা কী চাহ শঙ্খচিল। নাটকটি লিখেছি বেতারের জন্য।

বেশ কয়েকদিন খুব ভাবলাম। আর অন্য কিছুই ভাবি নি। আমার স্ত্রী টের পেয়ে যায়, যখন আমি এমনি ধারা চুপ করে থাকি। এ রকম চুপ করে থাকা সময়ে আমাকে কিছুই বলে না।

কয়েকদিন একা একা ভেবে নিয়ে যখন লিখতে বসলাম, শাঁ শাঁ করে সংলাপ এল। অনেকটা বৃষ্টির মতো। তবে আমি যদি জানি যে, আমার এই চরিত্রটা অমুক শিল্পী রূপদান করবেই, তখন বেশ সাহস পেয়ে যাই। তরতর করে লিখে যাই।

আরো একটা নাটকের কথা বলি, নাটকটি সম্পর্কে আমার মনে খুব আবেগ আছে। আবার উচ্চাশাও আছে। এই নাটক রাজা অনুস্বারের পালা, হয়তো শেষমেষ আমাকে বাঁচিয়ে রাখবে।

তবে রাজা অনুস্বার আমাকে খুব ভুগিয়েছে। অনেক কয়বার লিখেছি। বার দশকে তো বটে। যতবার লিখি ততবারই মনে হয়, আরো সংস্কার করা দরকার। যাঁরা প্রথম অভিনয় করেছিলেন, তাঁরা পরের পাণ্ডুলিপি পড়ে আমাকে খুব দুয়ো করেন। তাঁদের মতে, প্রথম পাণ্ডুলিপিই ভাল ছিল। কিন্তু আমি পরেরটাতে স্থির হয়ে থাকি। এ-রকম বুঝি হয় লেখার ক্ষেত্রে।

নজরুলের রাক্ষুসী নিয়ে কাজ করেছি। সে নাটকও আমাকে খুব যন্ত্রণা দিয়েছে। প্রথম দৃশ্যটা এখনো একবার করে লিখি আর কাটি। কিছুতেই মনের মতো হয় না। শিল্পীরাও মনে মনে হাঁসফাঁস করে। সামনে যদিও কিছু বলতে পারে না, তবে ভেতরে ভেতরে জ্বালাতন বোধ করে।

তবে যদি নাট্যরূপ দিতে হয়, তবে বড় মাপের কোনো উপন্যাসের কাজ নিয়ে বসাই বেশ নিরাপদ।

নাটক লিখে আমি আনন্দ পাই। খুব পাই কিনা সে কথা নিশ্চয় করে বলতে পারব না। চরিত্রগুলো যখন নিজের সংলাপ নিজেই আমার কলম থেকে কেড়ে কেড়ে নিয়ে যায়, তখন বেশ ভাল লাগে শুনেছি, গিরিশবাবুকে তাঁর চরিত্ররা এভাবে নাজেহাল করতো। তিনি মজা পেতেন।

নাটক লেখায় একটা ক্ষেত্রে খুব নার্ভাস হয়ে পড়ি। যখন নাটকের সনাতন ফর্ম ও নির্দিষ্ট ছক দণ্ডমুণ্ডের কর্তা হয়ে আমাকে নিয়ন্ত্রণ করে। তারা আমার কাছে সংঘাত চায়, আমার হাত দিয়েই একটা ভয়ংকর ঘটনা ঘটিয়ে নিতে বাধ্য করে। আমি অসহায় শিশুর মতো তাদের সে সব মেনে নিতে বাধ্য হই। সে সব নিয়ন্ত্রণ আমাকে খুব ব্যথা দেয়। যদি ঔপন্যাসিক হতাম, তবে সে নিয়ন্ত্রণ কিছুতে মেনে নিতাম না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

উপন্যাস একশ ভাগ নিজের। আর নাটক সকলের। নাটকের কাছে নাট্যকার দাস থাকে।

একটা বিষয় ইদানীংকালে আমাকে খুব শঙ্কিত ও পীড়িত করে যাচ্ছে। নাটক যে লিখছি, সে নাটক দর্শককুল মনের আনন্দে গপাগপ করে খাবে তো?

যে রকম ধারা বেচাল কথা বোধহয় স্থূল হয়ে গেল। তাই আমার কলম দিয়ে, গপাগপ করে খাওয়া জাতের কথাবার্তা আসা ঠিক হচ্ছে না। আমাকে আরো পরিশীলিত হতে হবে মনে হয়।

আসলে তো তাই হচ্ছে। যাঁর নাটক যত জনপ্রিয়, তিনিই বাজারে তত সফল বা কৃতী নাট্যকার বলে বিবেচিত হচ্ছেন। বাংলাদেশের সাহিত্যে, উপন্যাস ও গল্পের রাজ্যে এই রকম খাওয়াতে পারা চালু হতে আর দোষ কী ?

ধরা যাক যে, আমি একটা ভারি মাপের নাটক লিখলাম, অথবা সমস্যা ও ফর্মে খুব তীক্ষ্ণ ও তীব্র আধুনিক বা ইউরোপীয় ঢং রঙ দিলাম, কিন্তু আমাদের সরস, সজীব ও কম বুদ্ধির দর্শক সে নাটক নিলই না। তাহলে সে সব বুদ্ধির বড়াই দেখে, আমার যে নাট্য গ্রুপ সে তো নাচবে না। তারা নাটক চায় ঠিকই, কিন্তু একই সঙ্গে অভিজাত নাটক এবং বাজার মাৎ করা নাটকই তারা চাচ্ছে। যেন ঝাঁকে ঝাঁকে দর্শক আসে আর প্রেক্ষাগৃহ পূর্ণ হয়ে থাকে।

তাহলে আমি একই সঙ্গে পরমাসুন্দরী, পরমাগুণবতী এবং পরমা নৃত্যপটীয়সী বউ মানে লক্ষ্মীমন্ত নাটক পাব কোথা? একটা বউ এর মধ্যে এত সব কি একসঙ্গে আশা করা যায়? আশা করলেও কি পাওয়া যায়? আমি হয় অর্থ পিপাসু ব্রডওয়ে হব, না হয় নিরীক্ষাবাদী অফব্রডওয়ে হব। কিন্তু দুটোকে মিলিয়ে নেব কোন অলৌকিক যোগ্যতায়? গাছেরটা খাব আর নিচেরটা কুড়োব, তাতো কখনো হবে না। পেশাদারি ও সৌখিন দুটাই এক মঞ্চে চলবে না।

দর্শকের তাৎক্ষণিক চাহিদা কী? যদি সেই চাহিদা মেটাতে পারি তাহলে আমি নাট্যকার হিসাবে বাঁচব, না হয় মঞ্চ ছাড়তে বাধ্য হব।

এ কী দুর্দৈব কালে আমার নাট্যজীবনের অপরাহ্ণকাল এসেছে! আমি বুঝি এই কঠিন চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করে নাটক লেখায় ব্যাপৃত থাকতে পারব! সে যোগ্যতা ও মন কি আমার তৈরি হয়েছে?

মমতাজউদ্দীন আহমদ : বাংলাদেশের অন্যতম প্রধান নাট্যকার, অভিনেতা, নির্দেশক।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

নাটকের আমি

আবদুল্লাহ আল মামুন

আমি তখন নাটকের নাট্যরীতি, নাটকের স্বভাব চরিত্র কিছুই জানি না। নাটক লেখার কৌশল কি, কিভাবে তা রপ্ত করা যায়, এতসব ভাববার সময়ই বা কোথায়? একটি অভিজ্ঞতা ছিল সে সময়। যথেষ্ট সিনেমা দেখার অভিজ্ঞতা ছিল।

সিনেমা দেখে-দেখে এটুকু জ্ঞান আমার হয়েছিল যে, অভিনয়টা হয় কথা বিনিময় ক'রে—অর্থাৎ, সংলাপের মাধ্যমেই অভিনয় হতে হয়। নাটক সিনেমার লোকেরা পরস্পরের সঙ্গে কথা বলবেই। ঠিক করলাম আমাকেও নাটকের চরিত্রগুলোকে কথা বলাতে হবে। গেল একটি সমস্যা। কিন্তু কথা যে বলাব, কি বিষয়ে কথা বলাব? অর্থাৎ, নাটকের জন্যে তাহলে বিষয় বা কাহিনী দরকার। কাহিনী খুঁজি কিন্তু মেলে না। এরই মধ্যে একদিন বাসায় বাবার কাছে একটি গল্প শুনলাম। গল্পটি তিনি পারিবারিক পরিবেশে শোনালেন। এক কৃষক উদয়াস্ত পরিশ্রম করে ছেলেকে উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত করে। মেধাবী কৃষকপুত্র চাকরির সর্বোচ্চ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে পরবর্তীতে সিএসপি অফিসার হয়ে মহকুমার এসডিও হয়। ততদিনে সে এক ধনীর দুলালীকে বিয়ে করেছে। বাড়িতে বাবাকে কোনো সংবাদ দেয়নি।

দীর্ঘদিন ছেলের কোনো সংবাদ না পেয়ে কৃষক পিতা প্রায় মৃত্যুশয্যায়। এরই মধ্যে তিনি খবর পান, তার ছেলে অমুক মহকুমার এসডিও হয়েছে। প্রচণ্ড আশায় বুক বেঁধে কৃষকপিতা একদিন সোজা পুত্রের গৃহে উপস্থিত হন। এসডিও পুত্র তখন বন্ধুদের সঙ্গে খোশগল্পে মশগুল। আচমকা ওই পরিবেশে ছেঁড়া লুঙ্গি, পাঞ্জাবি পরা, খালি পায়ে এক কৃষককে দেখে বন্ধুরা মুখ চাওয়াচাউয়ি করে। পিতা দীর্ঘকাল পরে পুত্রকে দেখে ভাবাবেগে আকুল হন এবং পুত্রকে সম্বোধন করেন। পুত্র সম্বোধনের জবাব তো দেয়ই না, উলটো বন্ধুরা যখন কৃষকের পরিচয় জানতে চায় তখন সে নিঃসংকোচে বলে কৃষক তার গ্রামের লোক। সাহায্যের আশায় এসেছে। এই কথা শুনেই কৃষক পিতার মাথা ঘুরে যায় এবং সেখানেই তিনি জ্ঞান হারান। বর্তমানে কৃষক পিতা পাগল হয়ে রাস্তায়-রাস্তায় ঘুরে বেড়ান। এই গল্পটা শোনামাত্র আমার মনের মধ্যে কে যেন কথা বলে ওঠে। এই তো কাহিনী, এই তো বিষয়, এই তো নাটক। আমার জীবনের প্রথম নাটকের কাহিনী এভাবেই আমার কলমের দোড়গোড়ায় এসে দাঁড়ায়।

লক্ষণীয় যে, প্রথম নাটকের বিষয়টিই আমি তুলে নেই নিরেট বাস্তব জগৎ থেকে। বাস্তবতার সঙ্গে, সমাজের অসঙ্গতির সঙ্গে, নাটকের যে গভীর যোগাযোগ সেটা একরকম না জেনেই আমি জীবনের প্রথম নাটকটিরই বিষয়বস্তু নির্বাচন করি সামাজিক বাস্তবতার চৌহদ্দি থেকে। সম্ভবত এ কারণেই সমসাময়িক জীবন এবং সে

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

জীবনের নানা প্রকার অসঙ্গতি আজতক আমার নাট্যরচনার প্রিয় বিষয়বস্তু হয়ে আছে। এখনও স্পষ্ট মনে আছে নাটকটির নাম দিয়েছিলাম 'নিয়তির পরিহাস'।

আমি আমার শিল্পীজীবনে এমন বহু নির্দেশকের সাক্ষাৎ পেয়েছি যারা আসলে শিল্পীর প্রতিভার উপর আস্থা স্থাপন করতে পারেন না। বিপদটা বেড়ে যায় যদি নির্দেশক নিজেই নাট্যকার হন। নাট্যকার হিসেবে তিনি নিজেই নিজের নাটককে বিশ্লেষণ করেন। চরিত্র রূপায়ণের সময় তাঁর নিজের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণই চূড়ান্ত হয়ে যা। ফলে সামগ্রিক প্রযোজনাটি মার খায়। নতুন কোনো মাত্রা আবিষ্কৃত হয় না। কলকাতার বিখ্যাত নাট্যদল বহুরূপীর শুরুর দিককার প্রযোজনাগুলোর কথা স্মরণ করা যেতে পারে। নাট্যকার নির্দেশক শম্ভু মিত্র যে স্টাইল প্রবর্তন করলেন, আঙ্গিক এবং বাচিক অভিনয়ে, তা একদিকে যেমন দারুণভাবে চমকিত করল, তেমনি একসময় তা দুঃখজনকভাবে একঘেয়ে এবং ক্লান্তিকর হয়ে উঠল। শম্ভু মিত্র মহাশয়ের বিস্ময়কর বাচিক অভিনয় ঢং সংক্রামিত হয়ে গেল তাঁর দলের ছোটবড় সবার অভিনয়ে। যদিও এ কাজটা মোটেও ছোট কাজ নয়, সহজ কাজ নয়, তথাপি এ-কথা কি বলা যাবে এটাই উৎকৃষ্ট কাজ?

আমি নিজেও এই ঝুঁকির মধ্যে কাজ করে এসেছি। এখনও করছি। আমারও বেশিরভাগ নাটকেরই আমি নির্দেশক। অস্বীকার করব না, প্রথম দিকে আমি আসলেই ভাবতাম, আমার নিজের নাটকের আমিই হব শ্রেষ্ঠ নির্দেশক। আমার নাটক আমিই সব থেকে ভাল বুঝব। আমার এই ভুল অবশ্য অনেক আগেই ভেঙে গেছে। কেননা আমি নিজেই উপলব্ধি করেছি, আমার কোনো কোনো নাটক অন্য নির্দেশকের হাতে পড়ে এমন এমন মাত্রা যোগ করেছে যা আমি নাট্যকার হিসেবে কখনো ভাবিনি। আমার এই উপলব্ধি অর্জনে বেতার এবং টিভি, এই দুটো মাধ্যম আমাকে খুবই সাহায্য করেছে। আমার লেখা কোনো নাটক প্রযোজনার সময় প্রথমবারের মতন আমার হাতছাড়া হয়ে যায় ঢাকা বেতারের নাটক বিভাগের হাতে পড়ে। ঢাকা বেতারে আমি প্রথম নাটক লিখি ষাটের দশকেই, বিশ্ববিদ্যালয় জীবনে। সেসময় ঢাকা বেতারে নাট্য প্রযোজক ছিলেন স্বনামখ্যাত, নাট্যব্যক্তিত্ব, টিভিতে আমার দীর্ঘকালের ঘনিষ্ঠ সহকর্মী জনাব আতিকুল হক চৌধুরী। তাঁরই অনুপ্রেরণায় আমি একটি বেতার নাটক লিখি "আকাশের রঙ কালো" নামে। তিনিই নাটকটি প্রযোজনা করেন। তখনও আমি যেহেতু বেতারের নাট্যশিল্পীই হইনি, প্রযোজক তো বহুদূরের কথা, সেহেতু নাটকটি প্রযোজনারও প্রশ্নই ওঠে না। সেই থেকে অন্যের নির্দশনায় আমার লেখা নাটকের উপস্থাপনা শুরু হলো। অর্থাৎ, ভিন্ন নির্দেশকের হাতে পড়ে আমার নাটক পাখা মেলতে শুরু হলো। পরবর্তীকালে এই আতিকুল হক চৌধুরী টেলিভিশনে আমার বহু নাটক প্রযোজনা করেছেন। অন্য প্রযোজকরাও প্রযোজনা করেছেন। সবক্ষেত্রেই যে আমি সন্তুষ্ট হয়েছি, তা বলা যাবে না। কিন্তু ভিন্ন নির্দেশকের নির্দেশনায় নিজের লেখা নাটকের পরিবেশনা আমাকে কমবেশি উদ্দীপিতই করেছে এবং এখনও করে।

পরে শুনেছি ফেরদৌসী মজুমদারের কাছে যে, মুনীর চৌধুরী কোনো কোনো সদ্য সমাপ্ত পাণ্ডুলিপি নিয়ে সুবেহ সাদেকের সময় চলে যেতেন ফুলার রোডের বাসা থেকে সেন্ট্রাল রোডে পিতৃ আবাসে। তাঁর গুণমুগ্ধ ভাই বোনদের ডেকে বসিয়ে নাটক শুনিয়ে তবে তিনি শান্ত হতেন। শ্রোতাকে শোনানোর এই যে তীব্র আকাঙ্ক্ষা এ থেকেই বোঝা যায়, নাট্যকার হিসেবে মুনীর চৌধুরী কতখানি দর্শকসচেতন ছিলেন। তিনি

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

চাইতেন দর্শক শ্রোতা তাঁর নাটক পছন্দ করুক, তাঁর সংলাপে উদ্দীপিত আমোদিত হোক, এক মুহূর্তের জন্যেও বিরক্ত না হোক। মুনীর চৌধুরী শ্রোতাদের মতামত নিতেন, গ্রহণযোগ্য হলে গ্রহণ করতেন। এ বিষয়ে তাঁর কোনো সংকোচ ছিল না।

ক্রমশ টেলিভিশন নাটক আমাকে আচ্ছন্ন করতে থাকে। আমি টিভি নাটকের মৌলিকত্ব খুঁজে পেতে চেষ্টা করি। তখনকার দিনে আমাদের কোনো ট্রেনিং- এর ব্যবস্থা ছিল না। বিদেশী টিভি নাটক বা ফিল্ম তখন পর্যন্ত খুব একটা আসতে শুরু করেনি। তাই অন্তত দেখে যে শিক্ষা তারও কোনো উপায় ছিল না। তখন পর্যন্ত টিভি অনুষ্ঠানের বিশেষ করে টিভি নাটকের মৌলিকত্ব চিহ্নিত করে কোনো বইপুস্তকও আসা শুরু করেনি। এর ফলে নিজেই ভাবতে শুরু করলাম কি করে টিভি নাটককে মঞ্চনাটক এবং চলচ্চিত্র থেকে পৃথকভাবে উপস্থাপিত করা যায়। টিভি নাটকের পাণ্ডুলিপিতে ততদিনে কিছুটা মৌলিকত্ব এসে গেছে। নাট্যকারেরা মঞ্চনাটকের রীতির বাইরে আসতে পারছেন। অপরদিকে চলচ্চিত্রের চিত্রনাট্যের কাছাকাছিও যাচ্ছেন। মুনীর চৌধুরীর মতো বিশাল নাট্যপ্রতিভাও টিভির জন্যে নাটক লিখতে গিয়ে অকপটে বহুবার স্বীকার করেছেন টিভি নাটক অনেক বেশি টেকনিক্যাল। নাট্যকার মাত্রই এই নাটক লিখতে পারবেন না। মুনীর চৌধুরী আমাদের টেলিভিশনের প্রথম নাট্যকার হয়েও তাঁর জীবনের শেষদিন পর্যন্ত টিভির জন্যে নাটক লিখতে গিয়ে পূর্ণ স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন নি। বাংলাদেশে টেলিভিশনের প্রথম পূর্ণাঙ্গ নাটক শেক্সপিয়ারের টেমিং অব দ্য শ্রু-র টিভি পাণ্ডুলিপি লিখতে গিয়ে মুনীর চৌধুরী বারেবারে থমকে গেছেন। প্রযোজক মুস্তাফা মনোয়ারের সঙ্গে দিনের পর দিন বৈঠক করেছেন। এমনও ঘটনা ঘটেছে যে, মুনীর চৌধুরী গভীর রাতে প্রযোজক মুস্তাফা মনোয়ারকে ফোন করেছেন, মন্টু, এই রকম একটা দৃশ্য লিখতে চাই। যেখানে এই-এই ব্যাপার থাকবে। আনা যাবে তো? মুস্তাফা মনোয়ার স্বাভাবিক বিনয় ও শ্রদ্ধায় বলেছেন, মুনীর ভাই, আপনি যা মনে আসে লিখুন। আপনাকে অমি কি সাজেশন দেব? মুনীর চৌধুরী মুস্তাফা মনোয়ারের ওই বিনয় বা শ্রদ্ধায় বিন্দুমাত্র গলে না গিয়ে বলেছেন, না না আমার যা মনে আসে তাই লিখলে চলবে না। তুমি প্রযোজক। টেলিভিশনের নাটক সম্পর্কে তুমি আমার চেয়ে বেশি জানো, বোঝ। আমি মঞ্চের নাটক লিখে অভ্যস্ত। এই মিডিয়াম সম্পর্কে আমি এখনও কিছুই বুঝি না। মুনীর চৌধুরীর মতো অত বড় মাপের একজন মানুষের পক্ষেই এমন স্বীকারোক্তি সম্ভব।

আরো কিছু স্মৃতি

স্কুলজীবনে প্রথম নাটক লিখতে গিয়ে প্রাণেশ স্যারকে বললাম, স্যার কিভাবে নাটক লিখবো? স্যার বললেন, একটা গল্প লেখ। বর্ণনা না করে সংলাপ আকারে লিখবে; আর গল্পটাকে বিভিন্ন দৃশ্যে ভাগ করে দেবে। প্রাণেশ স্যারের বক্তব্য থেকে প্রথমবারের মত আমি কিছুটা বুঝতে পারলাম, সংলাপ আর দৃশ্য বিভাজনের গুরুত্ব।...

আমি তখন ঢাকা কলেজের ছাত্র। বাংলার অধ্যাপক হিশাম উদ্দিন স্যার বললেন, তোমরা কেউ নাটক লিখতে পার না? আমি লিখতে চেষ্টা করলাম, কিন্তু আমার লেখা বড় হয়ে যেত। হিশাম উদ্দিন স্যার বললেন, নাটকে 'চরিত্র' সৃষ্টি করবে। আমি

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

বললাম স্যার 'চরিত্র/ Character, কি? স্যার বললেন— "ইঞ্জিনিয়ার আর ডাক্তার দেখেছো? ইঞ্জিনিয়ার আর ডাক্তারের পেশা আর চালচলন আলাদা। তুমি যখন ইঞ্জিনিয়ারের চরিত্র সৃষ্টি করবে তখন নিশ্চয়ই ডাক্তারের চাইতে আলাদা সৃষ্টি করবে। আবার যখন ডাক্তার চরিত্র সৃষ্টি করবে তখন ইঞ্জিনিয়ার থেকে আলাদা করবে। হঠাৎ মনে হলো নাটকের চরিত্র সম্পর্কে এবং চরিত্র সৃষ্টি সম্পর্কে একটা ধারণা পেয়ে গেলাম। ...

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক, নাট্যকার, অভিনেতা আসকার ইবনে শাইখ একদিন আমাকে জীবনধর্মী নাটক লিখতে বললেন— হকারের জীবন নিয়ে নাটক লিখবে। আরো বললেন, একজন হকারও নায়ক হতে পারে। তার জীবননাট্যের নায়ক সে নিজেই। সেদিন আমি কেন্দ্রীয় চরিত্র সম্পর্কে একটা ধারণা পেলাম। ...

সংলাপ শিখলাম মুনীর চৌধুরীর কাছে। সাধারণ কথা আর সংলাপের তফাত কি? মুনীর চৌধুরী বললেন— সাধারণ কথা এই ধর তুমি আমি যা বলছি তাই। আর সংলাপে কিন্তু তৃতীয় পক্ষ দরকার। অর্থাৎ, সংলাপ তৃতীয় পক্ষকে শোনাতে হবে। মুনীর স্যার একদিন বললেন— "ঢাকার ফুটপাতের একদিনের জীবন ও বিভিন্ন চরিত্র নিয়ে একটি নাটক লিখতে। আমি লিখেছিলাম— "নেপথ্যে"। ...

একজন অভিনেতা যদি নাট্যকার হন তাহলে সুবিধে কি? নাট্যকার উৎপল দত্ত বললেন— আমি অভিনয়-পাগল মানুষ, কিন্তু অনেক নাটকে আমি আমার চরিত্র খুঁজে পাই না। ফলে আমি নাটক লিখবো। অভিনেতা যদি নাট্যকার হন তাহলে তিনি মঞ্চের সীমাবদ্ধতা বুঝতে পারবেন। আমি ঐ দৃশ্য লিখবোনা, যে দৃশ্য আমাদের নির্ধারিত মঞ্চে করা সম্ভব নয়। ঐ সংলাপ আমি লিখবো না— যে সংলাপ আমাদের নির্ধারিত শিল্পী করতে পারবে না। ...

আমি তৃতীয় পক্ষ অর্থাৎ, দর্শককে বাদ দিয়ে নাটক লিখতে চাই না। দর্শককে আন্দোলিত না করলে নাটক লিখে কি লাভ? বিষয় বস্তুর ওজন নিয়ে আমি ভাবি নি। সন্ত্রাস নিয়ে নাটক লিখতে আমার আপত্তি নেই; কিন্তু সে নাটকে আমি কমপক্ষে তিনটি হাল্কা দৃশ্য ঢুকিয়ে দেবো; ড্রামাটিক রিলিফের জন্য বা হাল্কা বিনোদনের জন্য। এমনও হতে পারে— তিনটি হাল্কা দৃশ্য শেষে আমি সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে মোক্ষম একটি সংলাপ জুড়ে দেবো যেমন করতেন চার্লি চ্যাপলিন ...

আমার নাটকের সব সংলাপই আমার প্রিয়। এই মুহূর্তে বিশেষ করে দুটি সংলাপ মনে পড়ছে,

০১. "দে আমারে টোস বিস্কুট দে। আমি চুবাইয়া চুবাইয়া খামু।" (এখনো ক্রীতদাস)।

০২. "স্যার আপনি ব্যায়ামও করবেন হাঁফা-হাঁফিও করবেন, আমি On duty থাকতে এ-রকম অনাচার হতে দেবো না।" (সেনাপতি)।

আবদুল্লাহ আল মামুন : বাংলাদেশের অন্যতম প্রধান নাট্যকার, অভিনেতা, নির্দেশক।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

আমার নাটকের কথা

মামুনুর রশীদ

লেখা মানেই লেখা। কালি দিয়ে কাগজের উপর দাগ কাটা। দাগ কাটতে কাটতে একসময় তা অর্থবহ কিছু হয়ে উঠতে পারে। আবার নাও হতে পারে। নাটক লেখাও তাই। কিন্তু স্বতন্ত্র হচ্ছে এর প্রয়োগের দিকটা। তাই কবিতা, গল্প, উপন্যাসের কাজটা লেখকের দিক থেকে যেখানে শেষ (মানে ছাপার অক্ষরে বেরিয়ে যাওয়া) নাটকের কাজটা সেখানে শেষ হয় না। লেখককে টেনে নিয়ে যায় মহড়াকক্ষে, মঞ্চে, দর্শকের মুখোমুখি করে। তারপর ছাড়ে। দর্শকের মুখোমুখি আবার লেখক একলা দাঁড়ায় না। অভিনেতা-অভিনেত্রী-কলাকুশলীসহ একজন নির্দেশকও থাকেন। অবশ্য এইসব প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে নাটকটির লেখক হয়ে যায় ভীষণ গৌণ। একপ্রকার নিজের লেখার একজন সাধারণ দর্শক।

আমি যখন নাটক লেখার কস্‌রত শুরু করি তখন আমি কলেজের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র। তখন লেখা এসে গেলো। প্রেমপত্র লিখি নিজের জন্যে, অন্যের জন্যে, দুকাপ চা বা চৌদ্দআনার এক প্যাকেট সিগারেটের জন্যে। গল্প লিখি, উপন্যাস লেখার চেষ্টা করি। ধৈর্যে কুলায় না। তারপর নাটক লিখি, লিখেই চলি। বন্ধুরা উৎসাহ দেয়। কিন্তু শুধু উৎসাহেই তো নাটক হয় না। দু একটা যাত্রাপালা, মাঝে মধ্যে দু একটা নাটক দেখাই মাত্র অভিজ্ঞতা। তাই নিয়ে নাটক লেখার মকশো।

একটা নাটক একাংক লিখে ফেললাম। শিক্ষকরা বল্লেন, খুব ভালো লিখেছো। অভিনয়ও হয়ে গেলো। নাটকশেষের সবগুলি করতালির উপর মনে মনে নিজের একলা অধিকার প্রতিষ্ঠা করলাম।

তারপর থেকেই নাটক লেখার চেষ্টা। নিয়মিত নাট্যচর্চা ছিল না। টেলিভিশনের জন্যে লিখতাম। সে সময় অনেক নাটক লিখেছি। শহীদুল্লা কায়সারের সংশপ্তকের নাট্যরূপও দিলাম।

সবকিছু পালটে গেলো

মুক্তিযুদ্ধ শুরু হল। মার্চের শেষে ঢাকা ত্যাগ করে খুঁজছি আশ্রয়, খুঁজছি কিভাবে প্রত্যাঘাত করা যায়। দেশের বাড়ি গিয়ে কাদের সিদ্দীকীর সাথে দেখা হয়। যুদ্ধের সূচনা হল। এ-সময়ই আবার ডাক আসে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের। বাঙালির ইতিহাসকে আশ্রয় করে একটি মঞ্চনাটক করার স্বপ্ন দেখি। স্বপ্ন দেখান মুস্তফা মনোয়ার। রাতদিন লেখা, কাটাকুটি আবার লেখা, এই করে তৈরি হয় 'পশ্চিমের সিঁড়ি'র পাণ্ডুলিপি। মহড়া হয়, কিন্তু কলকাতায় অভিনীত হয় না। অবশ্য পরে স্বাধীন

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

বাংলাদেশে তা অভিনীত হয়।

এ নাটকটি ছিল বেশ বিমূর্ত। নানা ধরনের প্রভাব এসে পড়েছিল। প্রাচ্যের এবং পাশ্চাত্যের। সংলাপ নির্মাণের কায়দাটা ছিল কাব্যিক। রবীন্দ্রনাথ ভর করেছিল একেবারে বাড়াবাড়ি রকমে। 'পশ্চিমের সিঁড়ি'র পর 'গন্ধর্ব নগরী' বলে একটি নাটক লিখেছিলাম। সেটাও একটু রূপকধর্মী। সংলাপের চমক ছিলো কিন্তু সবটা মিলিয়ে কিছু একটা দাঁড়িয়েছিল কিনা আমার সন্দেহ আছে। '৭১ থেকে '৭৪ পর্যন্ত ভীষণভাবে মার্কসবাদ অধ্যয়ন এবং এর প্রায়োগিক দিকের প্রতি ঝুঁকে পড়েছিলাম। মুক্তিযুদ্ধ বা স্বাধীনতা সংগ্রাম যে গণমানুষের কোন কাজে লাগছে না এটাই বুঝতে পারছিলাম। নাটক যে এখানে একটা দারুণ ভূমিকা নিতে পারে তা মনেপ্রাণে বিশ্বাস করতে শুরু করলাম। পাঠাভ্যাসটাও পাল্টে গেলো। ষাটের দশকে যেখানে কাম্যু, বোদলেয়ার, লোরকা, আলবী, আয়োনোস্কা ভর করেছিল সেখান থেকে এ-সময় আবার নতুন করে আবিষ্কার করলাম টলস্টয়, দস্তয়েভস্কি, নিকোলাই অস্ত্রভস্কি, লুসুন, গোর্কি, ক্রিস্টফার কডওয়েল। বিমূর্ত জায়গাটা ত্যাগ করতে হল।

আশ্রয় কদম আলী

আশ্রয় নিলাম কদম আলীর কাছে। আমি একটা মধ্যবিত্ত টানাপোড়েনের মানুষ। Vacillating middle class. পুরানা পল্টন থেকে উৎখাত হয়ে নারিন্দা তারপর বাবুবাজার, বাদামতলী। প্রতিদিন উদ্বাস্তু মানুষের ভীড়, এই ভিড়ে চরিত্র খুঁজি, কথা বলি। ওরা অবিশ্বাস নিয়ে কথা বলে। পেয়ে যাই খাদ্য ও খাদকের চরিত্র।

সুকান্ত, মানিক, মাথার মধ্যে ঘুরপাক খায়। বদরুদ্দীন উমর-আহমদ শরীফ কখনো ভর করে। চুয়াত্তর সালের দুর্ভিক্ষটা ওদের সাথে প্রত্যক্ষ করি, অনুভব করি। একদিন দুধের জন্যে আমার নবজাতক পুত্রের মাতাকে কসকর-এ লাইন দিয়ে দাঁড়াতে হয়। পুত্র কখনো দুধের অভাবে গমবাটা খায়।

কদম আলীকে খুঁজে পাই কিন্তু সে কদম আলী বোবা। সংলাপ নেই কদম আলীর। খাদকের সংলাপ আছে, প্রশাসনের সংলাপ আছে। পার্শ্বচরিত্রের সংলাপ আছে কিন্তু সংলাপ নেই কেন্দ্রীয় চরিত্রের। বোবা কদম আলী তাই ভেঙে চুরমার করে দিলো। এই ভেঙে চুরমার করে দেয়াটাই চাইছিল দর্শক। নৃশংস রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ডের পর সামরিক শাসন চলছে। কোথাও কিছু একটা হোক। থাক্ কদম আলী, ওরা কদম আলী। সেই আশ্রয়টি হয়তো আমার আকাঙ্ক্ষিত আশ্রয় ছিল। এরপর 'ওরা আছে বলেই'। তারপর 'ইবলিশ'। একই বৃন্তে তিনটি ফুল। কিন্তু অতিবাস্তবতা দোষে দুষ্ট হচ্ছে কি? জীবন্ত সংলাপ বটে, কিন্তু প্রতিবেশটা কি?

নাটকগুলি আমাদের দল ছাড়াও বিভিন্ন জায়গায় অভিনীত হয়েছে। হয়তো এগুলি বাংলাদেশের নাট্য ইতিহাসে সর্বাধিক অভিনীত নাটক। বাইরে কয়েক জায়গায় নাটকটি দেখতে গিয়ে বেশ অবাক হলাম। অতিবাস্তবতা নির্মাণ করতে গিয়ে শিল্পের যেটুকু প্রাণ ভোমরা ছিল সে নিহত হয়ে গেছে। সহজে অভিনয় করা যায় বলে একটা ধারণা হয়তো জন্মেছিল। তাই সহজটা অতি সহজ করতে গিয়ে শিল্পের ক্ষেত্রে নানা শর্টকাটও তৈরি হয়ে গিয়েছিল।

আসলে ইবলিশের চরিত্রগুলি বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে ঘুরে বেড়াবার সময়

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

খুঁজে পেয়েছিলাম। তাই চরিত্রগুলি যাঁরা অভিনয় করেন আর যাঁরা দেখেন তাঁদের সবারই চেনা। চেনা বলেই হয়তো সমস্যা। খুব সহজ মনে হয়, আর এই সহজ থেকেই একটা স্থূল শিল্প নির্মিত হয়। কিন্তু এসবই এখন নানা ব্যাখ্যা খুঁজে, কষ্ট করে ঢাকা-কলকাতা-বার্লিন-রোমের মঞ্চে অভিনয় করে তখন দর্শক আবার হয়তো দুটোই পায়। জীবন আর শিল্প।

কদম আলীর কাছে আশ্রয় নেবার পর আমার সামনে থেকে মহিলা সমিতির মঞ্চটি জায়গা দখল করে বিশাল এক মঞ্চ। সে মঞ্চের মাপ ছাপ্পান্ন হাজার বর্গমাইল। একটা নাট্য উন্মাদনায় উজ্জীবিত হলাম। নতুন আঙ্গিকের সন্ধানে নেমে পড়ি।

মুক্তনাটক। গ্রামে-গঞ্জে মানুষের কাছে যাই, গল্প শুনি, তারপর সেই সব মানুষকে দিয়েই নাটকের অভিনয় করাই। অসাধারণ সব অভিনেতা, জীবন ঘষে আগুনের মতো সংলাপ। ঝরঝরে জীবনবোধ। এক গভীর আত্মীয়তার বন্ধনে আবদ্ধ হই। এই একটা বড় শিখবার জায়গা খুঁজে পাই।

আমার শিক্ষকেরা

সফোক্লিস, শেক্সপিয়ার, ব্রেখট, মাইকেল, গিরীশ, রবীন্দ্রনাথ, দীনবন্ধু, ওয়ালীউল্লাহ, মিলার, বিজন, উৎপলের সাথে এবার পাই শতশত শিক্ষক। এরা জীবন থেকে শিক্ষা পেয়ে মাস্টার হয়েছে। সহসাই সংলাপ নির্মাণ করে ফেলে। নাট্য পরিস্থিতির চমৎকার আভাস দেয়। ভীষণ মৌলিক তাঁদের ভাবনা। কৃষিপ্রধান সমাজেই যে ময়মনসিংহ গীতিকা থেকে শুরু করে তাবৎ শিল্প আঙ্গিকের জন্ম হয়, কিভাবে জন্ম হয়, তা অনুভব করতে পারি।

এই অনুভবটাই সবচেয়ে বড় পাওয়া, বড় অভিজ্ঞতা। এক বর্ণাঢ্য জীবন সম্ভারের উপর দাঁড়িয়ে বাংলার শিল্পভূমির আস্বাদ পাই নিরন্তর ঘুরে বেড়ানো থেকে। চরিত্র আসে, সংলাপ আসে ইবলিশের, এখানে নোঙরের। মাত্র তিনরাতের মধ্যেই লিখে ফেলি 'এখানে নোঙর'। তারপর 'অববাহিকা'ও সুদীর্ঘ দিন ধরে লিখতে হয় নি।

জীবন দেখা,
জীবন কথা শোনা,
ভাবনার গভীরে তাকে ডুবিয়ে ডুবিয়ে—
একসময় বের করে আনা।

কাগজের উপর কলম ঘষতে ঘষতেই জীবন্ত হয়ে ওঠে চরিত্র। কখনো ঘটনা আগে, কখনো চরিত্র আগে। এভাবেই চলতে থাকে দিনরাত। দিবারাত্রির কাব্য হয়তো হয় না কিন্তু দিবারাত্রির লড়াইটাকে আনবার একটা চেষ্টা করতে পারি।

বুঝে বা না বুঝে অতিবাস্তবতা দোষে দুষ্ট হোক নাট্যশিল্প এটা মানা যায় না। একটা নিরীক্ষার পথে যাত্রা। 'গিনিপিগ', সাধারণ গল্প কিন্তু আঙ্গিকের নিরীক্ষা করা যাক্। করা হল। জমলো বেশ। মধ্যবিত্তের হাততালি। কিন্তু মানার মধ্যেই একমাত্র পাওয়া যায় দেশটাকে।

সামরিক শাসনের অস্থিরতার কালে কি করা যায়? 'সমতট'। মধ্যবিত্তের মূল্যবোধগুলিকে কিভাবে ধ্বংস করা হল। এই মধ্যবিত্তকে নিয়ে নাটক লেখা। সংলাপ, পরিমিতিবোধ, ঘটনার বুদ্ধিদীপ্ত ব্যাখ্যা এগুলো চলে এখানে। চেষ্টা করলাম।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

কতটা হল বুঝতে পারলাম না। নাটকে লেখকের হাতে তো সবটা থাকে না। কোথায় জট পাকিয়ে যায়, কেউ জানে না।

আশির দশকে মুক্তনাটকের জন্যে যেরকম ঘুরে বেড়িয়েছি সেই রকমই আবার নেমেছি পথে। পথনাটক। মনের নাটক, হাজার হাজার মানুষ সে নাটক দেখে। উজ্জীবিত হয়। সামরিক স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে এ নাটক। আবার মৌলবাদের বিরুদ্ধে, সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে। যেহেতু নিমজ্জিত থাকি জনতার মধ্যে, আন্দোলনে, সংগ্রামে তাই ঘটনা চোখে পড়ে, সংলাপ আসে, লিখেও ফেলি।

বাবরি মসজিদ ভাঙলো, দাঙ্গা শুরু হল। কলকাতার বিভাস চক্রবর্তীই অনুপ্রাণিত করলো একটা-কিছু করা দরকার। করলাম। মাজার নির্মাণ ও ভণ্ড বকধার্মিকদের কাহিনী। পাথর। গ্রামীণ জীবনে একটি 'পাথর' কত কিছু পাল্টে দিতে পারে। আপাতত অবিশ্বাস্য মনে মহলেও ভীষণ সত্য। ভাবনার শুরুতেই সন্ধ্যাবেলায় ঘটনাটি ঘটুক। ঘটে গেলোও, একটা পাথর প্রোথিত হল ছিঁচকে চোর মগরেব আলীর হাতে। তারপর একে-একে আসে ঘটনার স্থপতি, ঘটনায় আক্রান্ত সমাজ। সংলাপও বলে গেলো। 'পাথর' দাঁড়িয়ে গেলো।

ইতিহাসের কিছু ব্যক্তিত্ব নিয়ে নাটক লিখতে ইচ্ছে করে। খুবই Interesting মনে হয় যখন দেখি ১৭৭৫ সালে এক রুশ পর্যটক, চেলোবাদক গেরাসিম লেবেদফ এখানে নাটকের যাত্রা শুরু করেন এবং দুটি অভিনয় হবার পর নিঃস্ব হয়ে ভারত ত্যাগ করেন। কার্যকারণ জানতে ইচ্ছে করে। কিন্তু তেমন একটা বইপুস্তক পাওয়া যায় না। হঠাৎ আনন্দ সংবাদ আসে। হায়াৎ মামুদ তার ডক্টরেট থিসিস করেছেন লেবেদেফের ওপর। পড়তে থাকি, প্রশ্ন করতে থাকি। এদিকে ১৯৭৫ সালে আসে, প্রসেনিয়াম নাটকের দ্বিশতবর্ষ পূর্তি। এক জেদ চেপে যায়। ২৭ নভেম্বর ১৯৭৫, যেদিন প্রথম নাটক নেমেছিল সেদিন আমার লেবেদেফও নামবে। হ্যাঁ অসংখ্য তথ্য সংগ্রহ করেছেন হায়াৎ মামুদ। কিন্তু আমি কোথা থেকে শুরু করবো?

সিদ্ধান্তে পৌঁছাই, শুধু কলকাতা, কলকাতায় আগমন, নাটক মঞ্চায়ন, মঞ্চে আগুন, ষড়যন্ত্র, বিদায়। সেই সময়কার কলকাতা, তার সমাজ, শিল্পচেতনা সেটা আবার অন্যদিক। ঐ সময়কার লেখকদের বুঝতে। ভারতচন্দ্র রায়, নিধুবাবু, ঈশ্বর গুপ্তের কাছ থেকে কিছু বার করার চেষ্টা করি। ইতিহাসের কাছে যাই। মধ্যযুগের উপর অগাধ পাণ্ডিত্যের অধিকারী ডঃ আহমদ শরীফের সাথে পরামর্শ করি। এইভাবেই একটা শেষ অষ্টাদশ শতকের কলকাতাকে ধারণ করার চেষ্টা করি। এরপর চরিত্র আসে অবলীলায়। ঘটনার শুরু ১৭৮৯ সাল। তার কয়েকবছর আগে হয়ে গেছে মন্বন্তর। মন্বন্তরের সময় অভাবী মানুষের দল কলকাতায় এসেছে। সেই সময়ই লেবেদেফ নামছে জাহাজ থেকে। দেখা হয় একজন ভিক্ষুকের। তারপর কলকাতা, কলকাতার শাসক, ইংরেজি থিয়েটারের লোক, তথাকথিত ইংরেজের বিচার, পণ্ডিত শ্রেণী, পতিতা এবং প্রমোদজীবীদের সাথেও পরিচয় হয়। মাথার বিষয়টা আসতে এবং গোছাতে সময় লাগে কারণ তথ্য বেঁকে বসে আছে মাথায়। তথ্য মাথায় নিয়ে নাটক লেখা আমার প্রথম। বসে গেলাম টেবিলে। প্রথম দিন-দ্বিতীয় দিন, তৃতীয় দিন থেকে কলম চলতে থাকে সাবলীল, স্বচ্ছ একটা জগৎ দেখতে পাওয়া গেছে। কোম্পানিকালের মতো, গ্যালিলিওর মতো। লেখা হয়ে গেলো। তারপর এক সন্ধ্যেয় হায়াৎ মামুদকে শোনালাম নাটকটি। তথ্যের কোনো বিভ্রান্তি হয়নি এ-কথা হায়াৎ

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

মামুদের কাছ থেকে শুনে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম।

নাটকটি যথাসময়ে ২৭ নভেম্বর ১৯৭৫ তেই থামলো। একজন রুশের প্রতি বাংলা নাটকের ঋণ কিছুটা শোধ হলো।

অনুজপ্রতিম বৃন্দাবন দাস। আমার সহকর্মী। তার স্ত্রী খুশিও ভগ্নিপ্রতিম। বৃন্দাবনের পিতা দয়াল বাবাজি উত্তরবঙ্গের বিখ্যাত পদাবলি কীর্তনিয়া। সারাদেশে তিনি পদাবলি কীর্তন করে বেড়ান। প্রায়ই বৃন্দাবনের কাছ থেকে তার গ্রামের গল্প, বিশেষ করে তার বাবার গল্প শুনতাম। একদিন সে আমাকে একটি সত্য ঘটনা শোনায়। তার বাবা যাচ্ছিলেন কীর্তন করতে চাঁদপুরের দিকে। বাবরি মসজিদ ভাঙার পরের ঘটনা। লঞ্চে করে যাচ্ছিলো দল। ধর্মান্ধ মানুষের হাতে পড়ে দলটি। যে ছেলেটি বেহালা বাজাতো তাকে হত্যা করে বেহালা দিয়ে মাথায় আঘাত করতে করতে। অন্যদের হাত বেঁধে ফেলে দেয় নদীতে। প্রধান কীর্তনিয়া দয়াল বাবাজিকে অজ্ঞান অবস্থায় পাওয়া যায় নদীতীরে।

তারপর দরিদ্র গ্রামবাসীরা একটা কাপড় দেয় নগ্ন কীর্তনিয়াকে। কোনোমতে বেঁচে যায়। কিন্তু গ্রামে রটে যায় তাদের সলিল সমাধি হয়েছে।

ঘটনাটি হৃদয় বিদারক কিন্তু তার চেয়েও তাৎপর্যপূর্ণ যে পাকিস্তানি মিলিটারিরা বা আলবদররা যা করতো সেই একইভাবে ভরা লঞ্চের যাত্রীদের সামনে এ ঘটনা কি করে ঘটলো? আর কীর্তনিয়ারা কি হিন্দু সম্প্রদায়ের?

ঘটনাটি শোনার পর কেবলই মনে হচ্ছিলো, এখানে আমরা কি কোন ভূমিকা নেই? কি সূক্ষ্মভাবে সাম্প্রদায়িকতার বীজ বপন করা হয়েছে! খুব খারাপ লাগলো। আর তখনই ভাবতে থাকি নাটক কি হতে পারে না?

লিখতে বসি 'জয়-জয়ন্তী'। কালটা পিছিয়ে দিলাম। ঊনসত্তর সাল। সেখান থেকে একাত্তরের ডিসেম্বর। বেদনা ভারাক্রান্ত হৃদয় নিয়ে টেবিলে বসি। আমার চারপাশে চরিত্রের ভিড়। রক্তাক্ত জনপদ। তারমধ্যেই আসে ঘটনা, আলো-ছায়া, সঙ্গীত। বাঁশি, বেহালা, করতাল, ঢোল, কীর্তনিয়ার ভক্তিরসে ভরা গান থেকে যুদ্ধ, জীবনের চিত্র। ব্যাখ্যার অতীত কি করে মাত্র পাঁচদিনের মধ্যে নাটকটির রচনা সম্পূর্ণ হয় এবং কোন পরিমার্জনও প্রয়োজন হয় নি। প্রথম পাণ্ডুলিপিটিই চূড়ান্ত, মঞ্চায়নেও অক্ষত থাকে।

আমি অলৌকিকতায় বিশ্বাস করি না। কিন্তু লেখার ক্ষেত্রে কিছু একটা ঘটে। বলতে পারি তাকে। একধরনের Energy অথবা impulse অথবা Reflex (কোনটারই সঠিক বাংলা জানি না) জন্ম নেয় যা দিয়ে লেখক কারো আজ্ঞাবহ হতে শেখে। সেই আজ্ঞাদাতা হয়তো লেখকেরই চরিত্র।

মামুনুর রশীদ : বাংলাদেশের অন্যতম প্রধান নাট্যকার, অভিনেতা, নির্দেশক। সভাপতি, বাংলাদেশ গ্রুপ থিয়েটার ফেডারেশন।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

কথানাট্য, কথাপুচ্ছ

সেলিম আল দীন

শুধু নাটক রচনা করলেও শিল্পমাধ্যম সম্পর্কে আমি দ্বৈতাদ্বৈতবাদী। কেননা শিল্পের সমস্ত রঙ, শব্দ, চিত্র, পাথর, নীলিমা, অগ্নি ও বরফ, শেষ পর্যন্ত পুরুষ অর্থাৎ, মানবাভিসারী।

আমি এই প্রত্যয়ে বদ্ধমূল যে হাজার বছরের বাঙলা নাটকের আঙ্গিক সাধনাতেই আমাদের জাতীয় নাট্যরীতির প্রকৃত উজ্জীবন সম্ভব। পূর্বাঞ্চলীয় জনপদের প্রাকৃত ও কর্মমুখর ভাষাতেই রচিত হবে আগামী দিনের মহানাটক।

প্রসঙ্গ : কিত্তনখোলা

কিত্তনখোলা নাটকের রচনাকাল ১৯৭৮-৮০। এ নাটকের গঠনপদ্ধতিতে আমরা প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় পূজাউৎসবকেন্দ্রিক অলিখিত বাংলা নাটকের সম্ভাব্য আঙ্গিক রীতিকে ব্যবহার করতে চেয়েছি। এক্ষেত্রে ইউরোপীয় নাটকের প্রচলিত রীতির নাটকের মুখোমুখি দাঁড়াতে হয়েছে আমাদের। বাংলা নাটকে দেশজ রীতি প্রয়োগের ক্ষেত্রে মধ্যযুগীয় মঙ্গলকাব্যসমূহ, শাবারিদ খান-এর বিদ্যাসুন্দর, শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, পাঁচালি, যাত্রা ইত্যাদি ছিল আমাদের আশ্রয়স্থল।

এ প্রসঙ্গে আমরা বিনীতভাবে নিবেদন করতে চাই যে গ্রাম গ্রামান্তরে শ্রমজীবী নাট্যকর্মীরাও আজ জানেন বাংলাদেশের মানুষ ও তাদের জীবনের বহুমুখী অভিব্যক্তির কথা ঢাকা থিয়েটার জাতীয় রীতিতেই বলতে চায়। ইতিমধ্যে মফঃস্বল ও গ্রাম অঞ্চলে ইউরোপীয় রীতির অক্ষমঅনুকরণপ্রসূত মঞ্চগুলিকে আমাদের সৃষ্ট সংগঠনগুলি প্রায় অকেজো করে দিয়েছে। যে আঙ্গিক নির্মাণের জন্য আমরা পরিশ্রম করছি তার খবর ঢাকা পৌঁছে দিচ্ছে সংগঠন সৃষ্ট মেলাগুলিতে, গ্রামে ও গঞ্জে। গ্রাম থিয়েটারের শত শত ও হাজার হাজার দর্শক জাতীয় নাট্য আঙ্গিকের ইতিহাস ও প্রয়োগ পদ্ধতির সঙ্গে ক্রমশ পরিচিত হয়ে উঠেছে।

কিত্তনখোলা নাটকের রচনা ও মঞ্চায়ন প্রস্তুতি ঢাকা থিয়েটার-এর আগের নাটকগুলিতেই ছিল। 'মুনতাসীর'— এই নামের গীতিরঙ্গ নাটকটির ক্ষেত্রে বিভিন্ন দৃশ্যপট সৃষ্টির ব্যাপারটি একটিমাত্র মঞ্চদৃশ্যে সাধারণীকৃত হয়েছিল। পরের নাটকটি ছিল শকুন্তলা। তাতে আমরা 'নাটক' কথাটির বদলে ব্যবহার করেছিলাম 'দৃশ্যকাব্য'। 'রাস্তা নাচাও' আন্দোলনের নাটক 'চর কাঁকরায়' সচেতনভাবে বর্ণনাত্মক ভঙ্গির প্রয়োগ করি। (নাসির উদ্দিন ইউসুফ সে নাটকে গদ্যসংলাপের পটভূমিতে ঢোলের ব্যবহার করেছিলেন)। চর কাঁকরার ডকুমেন্টারি মুখ্যত আঞ্চলিক ভাষায় রচিত হয়েছিল।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

এভাবে দৃশ্য, মঞ্চ, ভঙ্গি ও ভাষা বিষয়ক ভাবনা থেকে আমরা খুব সচেতনভাবে উৎসপ্রবণ হয়ে উঠি। 'কিত্তনখোলা'য় আমাদের অভিপ্রায় ছিল বৃহত্তর। এজন্য নাটকের নয়টি সময়গত বিভাজনকে আমরা 'সর্গ' নামে চিহ্নিত করেছি। সর্গের বহুবিধ অর্থের মধ্যে সৃষ্টি বা নির্মাণ কথা দুটি ছিল আমাদের উদ্দিষ্ট। এদিক থেকে প্রথমত, কাহিনী বিভাজন নয়, সর্গ শব্দটি দ্বারা মূল চরিত্র সোনাই'র ক্রমপরিণতির ইঙ্গিত দেবার চেষ্টা ছিল। এক জনমে নানান রূপান্তরের নায়িকা মৃগী রোগাক্রান্ত সোনাই কিত্তনখোলার মেলায় এসে আমাদের সংস্কৃতির objective রূপের সঙ্গে পরিচিত হয়। প্রতিটি নতুন ঘটনার মুখোমুখি হলে সে নিজেকে অভূতপূর্ব অভিজ্ঞতায় সৃষ্টি করে। সে নায়কসুলভ কোন গুণ নিয়ে কিত্তনখোলায় আসেনি, তবে পূর্বপুরুষের রূপান্তরের কথা তার বুকের ভেতর আবৃত ছিল। এখানে এসে সে পরিচিত হয় লাউয়া সম্প্রদায়, যাত্রাদল ও মহাজনী নৌকার মাঝিদের সঙ্গে। ইদু যেন তার জন্মান্তরের রূপান্তরিত অসুর। অন্যদিক থেকেও 'কিত্তনখোলা'য় ব্যবহৃত সর্গ কথাটির তাৎপর্য দর্শকদের চোখে পড়ে থাকবে হয়তো। রূপান্তরকে আমরা এই নাটকে আবহমানকালের বাংলায় সর্বগ্রাসী বিষয় হিসেবে প্রত্যক্ষ করেছি। বৌদ্ধ জাতকের গল্পে কি জিনপরীর গল্পে রূপান্তর একটি frequent (ফ্রিকোয়েন্ট) ব্যাপার। ওভিদের মেটামরফসিস কাব্যে এই রূপান্তর র‍্যাডিক্যাল। এজন্য ভূমিকায় আমরা পূর্বঋণ স্বীকারকল্পে বলেছি,

: পূর্বেত এই কিস্‌সা কইছে নানা মহাজন।

শুরুতেই আমাদের মনে হয়েছিল যে এ বিষয়টি নিয়ে বাংলা চলতি আঙ্গিকে নাটক রচনা করা সম্ভব নয়, বরং এ বিষয়টি অনেকাংশে মহাকাব্যের। এমনকি এ নিয়ে একটি উপন্যাসও রচনা করা যায়। সুতরাং স্বভাবতই চাইলাম যে ঐসব বিভিন্ন আঙ্গিকের বিস্তৃততর পটভূমিসমূহ কিত্তনখোলা নাটকের কাজে লাগাতে। মহাকাব্যে স্বভাবজ শিল্প ও আঙ্গিকের বৈশিষ্ট্যকে নাটকের ভেতরে স্থাপনেরও দুর্মর বাসনা ছিল।

প্রিয় কাব্য ঈনিদ-এ স্থান ও ব্যক্তির নামের এক বিশাল মিছিল দেখেছি। ঈনিদ-এ স্থান ও ব্যক্তির এক বিচিত্র বিশাল জনপদ অতীত বর্তমান থেকে বিস্তৃত হয়ে ভবিষ্যতে পৌঁছেছে। 'কিত্তনখোলা'য় আমরা এই নাম ও ব্যক্তির একটি বিস্তৃততর পটভূমি রচনা করতে চেয়েছি। এর সঙ্গে যোগ করবার চেষ্টা করেছি— মধ্যযুগীয় ও সাম্প্রতিক জনপদের কাব্য, গল্পগাঁথা, প্রবচন, রূপকথা।

আমরা সব সময়ে মনে রেখেছি অজস্রতা যেন বৈশিষ্ট্যবিহীন না হয়। আমাদের মাটিতে ধানের অজস্র প্রজাতি ফলে। আমরা সে রকম অজস্রতা চেয়েছি। এসবের উদ্দেশ্য ছিল দুটি:

ক. নাটকের চলতি পরিসরকে ভেঙে ফেলা ও

খ. ইউরোপীয় নাটকের তীব্র ঘটনাবৃত্তের বদলে এ নাটকের কাহিনীকে মঙ্গলকাব্য বা গাজীর গানের গল্প গাঁথুনির সমান্তরাল করে তোলা।

'কিত্তনখোলা'য় সর্গ বিভাজন, দৃশ্য বিভাজন নয়। উপরন্তু সর্গকে অঙ্ক ধরলেও দেখব যে এতে কোন গর্ভাঙ্ক বা দৃশ্যভাগ নেই। আমাদের মতে দৃশ্য বিভাজন ইউরোপীয় নাটকের জন্য যেমন প্রয়োজনীয় ও যতটুকু দরকারি ভারতীয় রীতির নাটক বা বাংলাদেশী নাটকের জন্য ঠিক ততটুকু প্রয়োজনীয় বা দরকারি নয়। দুঅঞ্চলের আঙ্গিক ও ঘটনা উপস্থাপনার আদর্শ ও রীতিগত বৈপরীত্য এর মূল কারণ।

আমাদের রীতির গল্প দৃশ্য-বিভাজন কাহিনীর গায়ে অনাবশ্যক কর্তনের দাগ

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

ফেলে। দৃশ্য বিভাগের প্রয়োজন হয় ঘটনার ঐক্য, সময়ের ঐক্যের কারণে। ভারতীয় ঘটনার ঐক্যে দৃশ্যভাগের দরকার হতে দেখিনি। সময়ের ঐক্যকে তো ধর্তব্যের মধ্যেই আনা হয় নি। উপরন্তু মঞ্চে দেখেছি দৃশ্য ও দৃশ্যপটের ভিন্ন ভিন্ন ব্যবহার। আলো নেভাবার এমন যে তাগিদ দেখি ঢাকা কলকাতার নাটকে তার কারণও একটাই। মূলত পাশ্চাত্য রীতিতে রচিত দৃশ্য বিভাজিত নাটকের জন্যই পরিচালক আমাদের চোখের ওপর এ-রকম স্বেচ্ছাচারী কাজটা করেন।

আমি তরুণ বয়সে যখন একবার কলকাতা যাই, আকাদেমী মঞ্চে বেরটল্ট ব্রেখট- এর ককেশীয়ান চক সার্কেল-এর বাংলা রূপান্তর দেখছিলাম। চমৎকার অভিনয়কুশলতা সত্ত্বেও অজস্রবার সিনেমেটিক কায়দায় আলো জ্বালানো নেভানোর ফলে নাটক দেখার পুরো আনন্দটাই মৃত্তিকা লুণ্ঠিত হয়। আমি তখন কাউকে এ-কথা বলেছিলাম, যে মঞ্চে এতবার আলো যদি নিভল তবে তা আদৌ জ্বালাবারই বা কি দরকার ছিল।

'কিত্তনখোলা'য় দৃশ্য বিভাজনের কাজটি সতর্কতার সঙ্গে আমরা পরিহার করেছি। একই সঙ্গে একাধিক দৃশ্য ও প্রসঙ্গ আনলে বোধ হয় নতুন নতুন দৃশ্য সৃষ্টির দায় এড়ানো যেতে পারে। আমরা আগের নিষ্ক্রমণের পেছনের একটি প্রবেশ যোগ করে অতি সংক্ষেপে এমনকি একটি সংলাপেই একটি দৃশ্য সৃষ্টির কাজ সেরে ফেলতে পারি। দৃশ্যপটের বৈচিত্র্য ইউরোপীয় নাটকের বৈশিষ্ট্য হলেও অনেক ক্ষেত্রে তা Superficial. আমাদের রবীন্দ্রনাথ নাটকে যে দৃশ্যপটের বাহুল্য সইতে পারতেন না এ তো আমাদের সবারই জানা। বিসর্জন-এর পরবর্তী নাটকগুলি দেখলে এ-কথা স্পষ্ট হয়ে যায়।

অবশ্য রূপক সাংকেতিক নাটকের শরীর, প্রচলিত নাটকের শরীর এক নয়। সেখানে দৃশ্য ও দৃশ্যান্তরকে সহজে এড়ানো যায়। একটি রিয়ালিস্টিক নাটকে একাজ খুব সহজ নয়। পট পরিবর্তনের বাস্তবতাকে রক্ষা করেই দৃশ্যভাগহীন নাটক রচনা করা যেতে পারে। বাংলাদেশের যাত্রা নাটকের দিকে তাকালেই সব জটিল প্রশ্নের উত্তর মেলে। যাত্রার আঙ্গিক কতই না নির্ভার, সরল। দৃশ্য নয় দর্শন-ঘটনা নয় বর্ণনামুখীন সে। যাত্রা আমাদের চোখের চেয়ে মনকে সজাগ করে। কৃষ্ণ থাকেন দূরে, শুধু তাঁর সুরটি এসে রাধার মনে আলোকলতার বাঁধন দেয়। সে বাঁধন দেখার অধিক বাঁধন। যাত্রার দর্শকের কান তাই চোখের চেয়ে বেশি তীক্ষ্ণ হয়।

এবার ঢাকা থিয়েটার-এর নাট্য-আঙ্গিকের ভিন্ন চেতনার উৎসের কথা নিবেদন করতে চাই। আমরা মূলত উনিশ শতকে ইউরোপ প্রভাবিত শহুরে নাটকের যে ধারা বাংলা নাটকে সৃষ্টি হয়েছিল সে সম্পর্কে কম উৎসাহী। আমাদের ঢাকা থিয়েটার আদি ও মধ্যযুগের বাংলা নাটকের গঠন স্বরূপটি আবিষ্কার করতে চায়। আদি বাংলা নাটকের গঠন কেমনতর ছিল? এ প্রশ্নের উত্তরে তর্জনী তুলে নমুনা দেখাতে পারি না বটে, কিন্তু সে নাটকের সম্ভাব্য রূপটির চিত্র তুলে ধরতে পারে।

নাট্যশাস্ত্রে ওড্রমাগধী রীতির কথা ভারতমুনি উল্লেখ মাত্র করেছেন; এর কোন বিস্তৃত বিবরণ দেননি। কেন দেননি? কারণ হতে পারে দুটি :

ক. হয়তো এদেশীয় নাট্যরীতি অনার্য বিধায় তা ভারতমুনির অপরিজ্ঞাত ছিল।

খ. হয়তো এদেশীয় নাটকগুলি নিতান্তই লোকজ স্তরে ছিল। এসব নাটক লেখা হতো না (যেমন পৃথিবীর বহু প্রাচীন ও কালজয়ী গ্রন্থও পাণ্ডুলিপি ছাড়াই

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

মুখে মুখে রচিত হয়েছিল)। এসব নাটক ছিল শুধুমাত্র অভিনয়ভিত্তিক। চরিত্রভিত্তিক হলে তার লেখ্যরূপ থাকত। এর জন্য কাউকে দায়ী করা চলে না। কারণ, বাংলাভাষা তখনও সাযুজ্যমান যুগে ছিল। এ ভাষার লেখ্যরূপই ছিল না। কাজেই ভারতমুনি ওই ওদ্ভ্রমাগধী নাটক ও তার বৃত্ত সম্পর্কে কিছুই বলেননি।

১৩৫০-এর লেখা শ্রীকৃষ্ণ কীর্তনের মধ্যে একটা নাটকের সম্পূর্ণ বৈশিষ্ট্যই খুঁজে পাওয়া যায়। এতে পাই তিনটি চরিত্র। নিশ্চয় তদ্দিন বাংলা নাটকে এক চরিত্র ও দুই চরিত্র বিশিষ্ট নাট্যরীতির স্তর অতিক্রম করেছিল।

আমরা বাংলা নাটকের সামগ্রিক বৈশিষ্ট্যের মধ্যে একটা জিনিস বিশেষভাবে লক্ষ করেছি যে, বাংলা নাটকে বর্ণনাধর্মিতা ও সংলাপমুখীনতা পরস্পরের পরিপূরক। অথচ ইউরোপীয় সংজ্ঞায় উৎকৃষ্ট নাটকে এটা হবে নিতান্ত দোষাবহ। এজন্যই বোধ হয় বাংলা নাটকে ঘটনার তাড়া থাকে না, নৃত্যে ও সঙ্গীতের প্রয়োগে নাটক হয়ে ওঠে মঞ্চের অলঙ্কার।

গান দর্শককে চিত্র ও ভাবের দিকে, পরিবেশ ও অনুভূতির দিকে টেনে নিয়ে যায়। রবীন্দ্রনাথের নাটকেও তাই দেখি গানের উজ্জ্বল ব্যবহার। সে গানে শুধু সঙ্গীত স্রষ্টা এক পিতৃপ্রতিম দার্শনিককে দেখি।

অভিনয়ভিত্তিক অলিখিত নাটকের কথা উল্লেখ করেছি আগে। মধ্যযুগেও আমরা লিখিতরূপে অভিনয়ভিত্তিক নাটক দেখি। মঙ্গলকাব্যগুলি তার প্রমাণ। মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গলের ভূমিকায় কবি দেবীকে আহ্বান করে বলেন :

বিশ্রাম দিবস আট শুন গীত দেখ নাট
আসরে করহ অধিষ্ঠান।

শুধু পাঠ নয়— গান নাচের যুগল সম্মিলন দেখতে বলেছেন কবি দেবীকে। অষ্টমঙ্গলা কি মনোটোনাস পাঠের বৃত্তে আবদ্ধ হতে পারে? পরিবেশনের প্রয়োজনই তার অন্তর্গত আঙ্গিকের নাট্য বৈশিষ্ট্যকে performance-এর মাধ্যমে ফুটিয়ে তোলা হতো। এক অধ্যায়েই দর্শকের মনের মধ্যে কালকেতু বেড়ে উঠত শিশু থেকে কৈশোরে। 'কিত্তনখোলা'র বর্ণনাত্মক ভঙ্গি আমরা উৎস থেকে গ্রহণ করেছি। কবির লড়াই, বায়োস্কোপঅলা, মাঝিদের সমুদ্রযাত্রার কাব্য সয়ফুলমুলুক পাঠ কি বনশ্রীর মনসা-কল্পনা ও মনসার সাযুজ্যে সর্পাভরণের স্পৃহা ইত্যাদি ক্ষেত্রে সঙ্গীতের সচেতন ব্যবহার করেছি।

আদি রীতিতে চমৎকার সুযোগ ছিল পরিস্থিতি বর্ণনার। আমরা কিত্তনখোলা নাটকে এ জন্য কোনো কোনো ক্ষেত্রে সরাসরি বর্ণনার আশ্রয় নিয়েছি। মূল পাণ্ডুলিপিতে দেখা যাবে সংলাপের অতিরিক্ত বর্ণনাও আমরা এ নাটকে যোগ করেছি। মুখোশের রঙ ও চাষী মনে তার প্রতিক্রিয়া, পূর্ণিমার নিচে মেলা, লাউয়া সম্প্রদায়, ডালিমন— বনশ্রীর প্রাকৃতিক রূপান্তর, সোনাইর অনুভব— এসবকিছু কোনোক্রমেই সংলাপযোগ্য করা সম্ভব হয়নি। যদি হতো কৃষি ও শ্রমজীবী জীবনের ভাষান্তরের জন্য তা হয়ে উঠত নিদারুণ ভারী এবং কৃত্রিম।

কিত্তনখোলার দর্শক ও পাঠকবৃন্দ সহৃদয় চিত্তে নিশ্চয়ই লক্ষ করেছেন যে শিল্প-মাধ্যম হিসেবে নাটককে আমরা বিস্তৃততর তাৎপর্য দান করতে চাই। যমুনা ও বঙ্গোপসাগরের কূলে কূলে ধ্বংস ও সৃষ্টির যে লীলা — নাটকের যথার্থ আঙ্গিক তো

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

সেখানে। রৌদ্রে নূনে রক্তে ঘামে সে জীবন হয়ে ওঠে আমাদের নাট্যবস্তু।

আমরা মুক্তিযুদ্ধ করেছি। সাম্প্রদায়িক মূল্যবোধের বদলে আমরা চাই আধুনিক ও সাবলীল জীবনের নবীন ভাষা। দক্ষিণে গর্জায়মান সমুদ্র। কাকে ভয়? ঢাকা থিয়েটার নিশ্চিত পৌঁছে যাবে আদি নাট্যমাতৃকার উৎসমূলে।

এখানে আমার একটি ব্যক্তিগত নিবেদন আছে। কিত্তনখোলা ও নতুন নাটক 'কেরামত মঙ্গল' লেখার সময় নাটককে আমার কাছে নাটকের চেয়ে বেশি কিছু বলে মনে হয়েছে। আমাদের নাটক লিখিয়েদের উচিত নাটকের সঙ্গে অন্যান্য শিল্প-মাধ্যমের দ্বৈতাদ্বৈত সম্পর্কটি বুঝে নেয়া। রবীন্দ্রনাথের পর্বত তো বৈশাখের নিরুদ্দেশ মেঘ হতে চায়। নাটকের আঙ্গিক-চেতনা সংকীর্ণ হলে এ মাধ্যমে মানুষ ভাস্কর্যের আনন্দ আর সঙ্গীতের দ্যোতনা পাবে না। রঁদার ভাস্কর্য নির্মাণপদ্ধতির পরোক্ষ উপস্থিত কি রিলকের কবিতায় নেই? ওভিদের রূপান্তর কি ভাস্কর্যের দিকে মুখ ফেরানো নয়? দান্তের নরক বর্ণনা কি চিত্রকলার অধিক নয়? ওফেলিয়ার কবর খননের দৃশ্য কি নাটকের সীমা ছাড়িয়ে যায়নি?

'কিত্তনখোলা'র ভাষা আঞ্চলিক ভঙ্গিতে রচিত। এ নাটক রচনাকালে আমি বাংলা ভাষার গীতল রূপটির সঙ্গে আরও নিবিড়ভাবে পরিচিত হই। প্রথমত, গ্রামাঞ্চলে গিয়ে আমি দৈনন্দিন জীবনের ভাষা ব্যবহারের ভঙ্গি প্রত্যক্ষ করি। পরে টেপ করে স্বর ও শব্দ সংস্থানের বৈশিষ্ট্যগুলি বের করে আনি। নায়েব বয়াতি, মরহুম মিনহাজ— আরও অনেকের কাছে এ বিষয়ে আমি ঋণী। আঞ্চলিক ভাষা নিয়ে কাজ করতে গিয়ে একদা চমকে উঠে লক্ষ করি যে আমাদের সূক্ষ্মতম আধ্যাত্মিক গানগুলির ভাষা গ্রামীণ জীবনের দৈনন্দিন ভাষা-সম্পদেরই বিমূর্ত স্পন্দন। অতি সাধারণ প্রাকৃতজনের ভাষা একতারা দোতরা আর সরোদের স্পর্শে হয়ে ওঠে নীলাভ্রমুখী। ফলে আঞ্চলিক ভাষার ওপর বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা আরও গাঢ়তর হয়। গ্রামীণ চরিত্রগুলির সূক্ষ্ম অনুভবের ভাষা রূপায়ণে আমার আর কোন বাধা রইল না।

গীতিসুর বাংলা সৃষ্টিশীল গদ্যের ক্ষেত্রে ভাল কি মন্দ— এ প্রশ্নে এখন আর আমরা আলোড়িত হই না। সকল ভাষারই নিজস্ব একটি চলনভঙ্গি আছে। এ চলনভঙ্গি সে ভাষা অর্জন করে তার ইতিহাস ও ঐতিহ্য থেকে। জনপদের চরিত্র, আদর্শ, দর্শন ও ব্যবহারভঙ্গির সঙ্গেও ভাষার চরিত্র অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। কাজেই ভিন্ন ভাষার নিরিখে আপন ভাষা স্বভাবকে পাল্টে দেবার চেষ্টা ব্যর্থ হতে বাধ্য। বাংলা পয়ার ছন্দের সঙ্গে গদ্যের বিরোধ নেই। সমগ্র মধ্যযুগে গদ্যের ব্যাপক প্রচলন হয়নি এ কারণে যে সেকালে বাংলা পয়ার ছিল গদ্যের পরিপূরক ভঙ্গি। বাংলা গদ্যে স্বভাবজই মাত্রা আছে, ছন্দ আছে। এক নিশ্বাসে কথা বললেই বাংলা গদ্য পেয়ে যায় ছন্দরূপ। 'কিত্তনখোলা'র ভাষা নির্মাণের সময়ে আমরা বাংলা গদ্যের উৎস ও বিবর্তন বিষয়ে সচেতন ছিলাম। শতাধিক বছর পূর্বে আধুনিক বাংলা নাটকের স্রাষ্টিক পুরুষ শ্রীমধুসূদন স্বসৃষ্ট অমিত্রাক্ষর ছন্দের অনুকূল মত প্রদান করেও রঙ্গভূমিতে গদ্য ব্যবহার সম্পর্কে বলেছেন :

"অথচ ইহাও বক্তব্য যে, আমাদিগের সুমিষ্ট মাতৃভাষার রঙ্গভূমিতে গদ্য অতীব সুশ্রাব্য হয়। এমনকি, বোধ করি, অন্য কোন ভাষায় তদ্রূপ হওয়া সুকঠিন।"

(মঙ্গলাচরণ : কৃষ্ণকুমারী)

সুমিষ্ট বলতে মধুসূদন বাংলা গদ্যের গীতলতাকেই নির্দেশ করেছেন। মনে

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

রাখতে হবে এ শুধু মাতৃভাষা-প্রেমিকের উক্তি নয়। বহুভাষায় অভিজ্ঞ মধুসূদন সচেতনভাবেই এ মন্তব্য করেছেন।

স্বভাবজ গীতসুর বাংলা নাট্যভাষার যদি গুণ হয় তবে আরোপিত গীতলতা হবে দোষাবহ। কারণ, তা নাট্যভাষা বিনাশী ও ব্যক্তিগত প্রবণতাপ্রসূত। সংক্ষেপে এই হচ্ছে 'কিত্তনখোলা'র ভাষা বিষয়ে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি।

বিষয় : কেরামত মঙ্গল

কিত্তনখোলার ভাষা ও অভিনয় রীতির সঙ্গে কেরামত মঙ্গল নাটকে যোগ হয়েছে লোকজ জীবনের বিস্তৃত জীবনভাষ্য। হিন্দু, মুসলমান, গারো, হাজং, ক্যাথলিক খ্রিস্টান, মুণি, ঋষি, হিজড়া, জমিদার, জেলে, মাঝি, জেল, রাজনৈতিক অস্থিরতা, মুক্তিযুদ্ধ, যুদ্ধোত্তর অবক্ষয় প্রভৃতি অজস্র জাতি, উপজাতি, ধর্ম, মানুষ ও প্রসঙ্গ নিয়ে গড়ে উঠেছে নাটকটির বিশাল আখ্যানভাগ। এর সাথে লোকজ উপাখ্যান, উপকথা, কিংবদন্তির সমন্বয় ঘটেছে। লোকজ ভাষার দক্ষ প্রয়োগে নাটকটি জাতিধর্মনির্বিশেষে একটি পুরো ভূ-খণ্ডের অধিবাসীদের জীবনচিত্রকে তুলে ধরতে পেরেছে। আঞ্চলিক ভাষার চরম সংবেদনশীলতা এখানে পরীক্ষিত সত্য। লোকজ ভাষাভঙ্গির প্রধান বৈশিষ্ট্য তার অন্তর্নিহিত সুরতরঙ্গ ও গতিশীলতা। এই দুটি গুণের সমন্বয়ে কেরামত মঙ্গলের ভাষার স্থিতিস্থাপকতা বেড়েছে।

বাংলা নাটকের কাহিনী বহুক্ষেত্রে দীর্ঘকাল যাবৎ পঞ্চাঙ্করীতির ভয়াবহ অনুবর্তনে ক্লিষ্ট। কিন্তু কেরামত মঙ্গল নাটকে মধ্যযুগীয় বাংলা নাট্য আঙ্গিক ও সমৃদ্ধ উপাখ্যানের ধারা একীভূত। এই নাটকের বিষয়বস্তুর কোনো তুলনা আধুনিক বাংলা নাটকে নেই। শুধু মধ্যযুগের মঙ্গলকাব্যের বিস্তৃত কাহিনীর সঙ্গে অংশত তুলনা চলে। মঙ্গলকাব্যও তৎকালীন সমাজের প্রেক্ষিতে লিখিত হয়েছে। মানুষের মঙ্গল কামনায় দেবতার জয়গান মঙ্গলকাব্যের সাধারণ বৈশিষ্ট্য। কেরামত মঙ্গল নাটকের দেবতা আদমসুরত। কেরামতকে পথের নিশানা দেয়। দশরথ তার অব্যক্ত কথা নেশার ঘোরে আদম সুরতকে শোনায়। অনেকটা দেবীর কাছে (চণ্ডীমঙ্গল) নির্যাতিত পশুসমাজের আর্তনাদের প্রতিধ্বনিত আধুনিক রূপায়ণ যেন।

কেরামত মঙ্গল নাটকটি উপখণ্ডসহ মোট এগারোটি খণ্ডে বিভক্ত এবং বৃত্ত পরিকল্পনায় রচিত। আমরা এতে ইউরোপীয় নাটকের ঘটনা সংঘাতের রীতি থেকে কিত্তনখোলার মতই একটি ভিন্ন আবহ পাই। প্রতিটি উপকাহিনী আলাদা বৈশিষ্ট্যের হলেও ঘটনা ও কালগত ঐক্য বর্তমান। কেরামতের জন্ম থেকে অন্ধত্ব পর্যন্ত প্রায় সমগ্র জীবনকাহিনী এতে বিবৃত হয়েছে। ১৯৪৬ থেকে শুরু করে বাংলাদেশের স্বাধীনতা পরবর্তী জনপদের মূল্যবোধের অবক্ষয় কাল পর্যন্ত দীর্ঘ সময়ের ব্যবচ্ছেদ হয়েছে কেরামত মঙ্গল-এ। পান্থজন কেরামতের চোখে দেখে ক্লিষ্ট ক্রূর জীবন দোজখ একের পরে এক। এ জীবনের শেষ কোথায়? কোথায় সত্য, মানুষের মঙ্গল কোথায়? এগারো দোজখ অতিক্রম করেছে সে। হাঙ্গরের ধারালো মুখগহ্বরের মত জীবনবৃত্তে ঘূর্ণায়মান ছিন্নভিন্ন কেরামতের চোখ দেখে।

সংস্কৃত আলঙ্কারিকরা আট থেকে অতোধিক খণ্ডে সমাপিত যুদ্ধকাব্যকে মহাকাব্য বলেছেন। তেমনি ১০ অঙ্কে সমাপিত নাটককে বলেছেন মহানাটক। কাজেই সংস্কৃত

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

সাহিত্যতত্ত্ব অনুযায়ী মহাকাব্যে একটি মৌল ধারণায় উপনীত হয়ে তাকে কাব্য এবং নাটকের ক্ষেত্রে একীভূত করে দেখেছেন। যদিও রামায়ণ মহাভারতের মত নাটকের নজির একটিও নেই। তবে ভবভূতির উত্তররামচরিত ৭ অঙ্কে সমাপিত বিশাল একটি পটভূমিকে ধারণ করার মত নাটক। কেরামত মঙ্গলও শতাধিক চরিত্র নিয়ে এগারোটি খণ্ডে সমাপিত নাটক।

বর্ণনা বনাম সংলাপ

In comparison to narrative form, dialogue is a loose form of expression. Think about the sufferings of an individual. It cannot be adequately expressed by a dialogue. So, now-a-days, I prefer narration to dialogue.

My trilogy comprises three plays— Kittonkhola (1980), Keramatmangal (1983) and Haat Hadai (1987). I have written these plays in the narrative form after being inspired by the ancient classical world of myths, religions and epics. I have tried to create the picture of modern world from the classical perspective. The story of Buddha Jataka, Mangal Kabya, the Koran, the Bible, the Ramayana, the Mahbaharata, the Odyssey, the Aeneid, the Divine Comedy and Metamorphosis— all these great works have been a source of inspiration in my search for an eternal truth which is being reflected in the life of the modern times. While I was writing Kittonkhola I remembered the stories in the Buddha Jataka (Buddha's Reincarnation) and Ovid's Metamorphosis. The transfiguration and transmigration of diferent figures and souls that I found in these wonderful books can be seen in another dimension in the present world. In Kittonkhola I have narrated the story of different characters who change their profession because of the extreme socio-economic pressures of which they are the prey. This is a modern phenomenon. In my play I have made a parallal between the changes in those classical books and the changes that I really encounter today.

ক থা পু চ্ছ ০১

কথানাট্য নামে যে বিশেষ শিল্পরীতির আশ্রয়ে দু'বছর আগে নাটক রচনা শুরু করি যৈবতী কন্যার মন সে ধারায় রচিত দ্বিতীয় নাটক।

চাকা নাটকের ভূমিকায় কথানাট্য নামকরণের কারণ ব্যাখ্যা করেছিলাম, বক্ষ্যমাণ

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

কথাপুচ্ছ তারই বিস্তার। এবং সম্প্রতি সমাপিত আমার তৃতীয় কথানাট্য হরগজের অন্ত্যে অনুক্ত অবশিষ্ট কথাগুলো আবার বলব।

পাঠকমণ্ডলী! ইতোমধ্যে ঢাকা থিয়েটার ও আমার প্রয়াসে যে-সকল নাট্যপরিভাষা প্রচলিত হতে শুরু করেছে এই গ্রন্থপুচ্ছে সেগুলোর একটি প্রাসঙ্গিক তালিকা লিপিবদ্ধ করেছি। নামকরণ সততই জ্ঞানের উৎস—প্রাচীন দার্শনিকেরা এই মত ব্যক্ত করেছেন। নামকরণের মাধ্যমেই শ্রেণীকরণের রীতি সহজতর হয়। সহস্র বছরের বাংলা নাট্যশিল্পীরীতি নিয়ে কাজ করতে করতে এই পরিভাষাগুলো সৃষ্টি হয়েছে। বাংলা নাটকে নিজস্ব আঙ্গিক ও অভিনয়রীতির দিকে যেতে হলে বাংলা নাটকের নিজস্ব পরিভাষারও প্রয়োজন। সেই তাগিদ থেকেই এর জন্ম।

১৯৮০ সাল থেকে একযুগ ধরে আমাদের নাট্যপ্রয়াসের নানান প্রসঙ্গে উচ্চারিত এই পরিভাষাগুলো হচ্ছে—

(১) বর্ণনাত্মক নাট্যরীতি— বর্ণনাত্মক অভিনয়রীতি—বর্ণনাত্মক নাট্যআঙ্গিক (২) জাতীয় নাট্যআঙ্গিক (৩) দেশজ নাট্যরীতি (৪) উপাখ্যানরীতির নাটক (৫) কৃত্য নাটক (৬) গায়েনরীতি (৭) গৃহাঙ্গন থিয়েটার (৮) ভূমি সমতল বৃত্তমঞ্চ (৯) কিসসাকথনরীতি (১০) চৌকোণ খোলা মঞ্চ— চৌপথ খোলা মঞ্চ (১১) মহাকাব্যিক বা দ্রুপদী বাস্তবতাবাদ (১২) কথানাট্য।

এ নামগুলো পাশ্চাতের নাট্যনন্দনতত্ত্ব বা নৈয়ায়িক সূত্র থেকে প্রত্যক্ষভাবে গৃহীত হয়নি। প্রদত্ত নামের তালিকায় কথানাট্য প্রসঙ্গে প্রাসঙ্গিক পরিভাষাগুলোই উদ্ধৃত হয়েছে। বাংলা নাটকের নিজস্ব পন্থায় কাজ করতে গিয়ে পাওয়া এই ভাষা আমাদের অভিজ্ঞতালব্ধ। কী কারণে, কোন অভিজ্ঞতায়, কোন প্রসঙ্গে এই কাজের ভাষানিবহ তৈরি হল তা নাটক-কর্মীদের জানা থাকলে ভাল। তাতে প্রায় একযুগ ধরে নির্বাহিত আমাদের কাজের ধারাটা বুঝতে পারা যাবে। নানা পারম্পর্যে এই পরিভাষা সমকালে উচ্চারিত হচ্ছে, অথচ এগুলো সংজ্ঞাবদ্ধ হয়নি। তাই এগুলো ব্যবহারের ক্ষেত্রে নানা রকমের ব্যাখ্যা তৈরি হচ্ছে। বিপত্তিটা সেখানে।

আমি বর্তমানে এই বিশ্বাসে বদ্ধমূল যে প্রাকবুদ্ধকাল, চর্যাপদ ও উত্তরকাল থেকে উনিশ শতকের প্রারম্ভ পর্যন্ত বাংলা গান, নাট্যপালা, উপাখ্যান, চিত্রকলা, ভাস্কর্য—এমনকি এদেশে প্রচলিত নানা ধর্মদর্শনের মধ্যে একটি পারস্পরিক সাধারণীকৃত নন্দনতাত্ত্বিক ঐক্য অনুধাবন করা যায়। তাতে একথা প্রমাণিত হতে পারে যে, এদেশের প্রাচীন ও মধ্যযুগের নানান শিল্পমাধ্যমে সমাজ-সম্প্রদায় বা গোষ্ঠীগত শিল্পরুচি ও সৌন্দর্যবিচারের একটি সাধারণ সূত্র ছিল। বাঙালির নন্দনতাত্ত্বিক চিন্তার সূত্রবদ্ধ কোনও গ্রন্থ মেলে না এ যেমন সত্য, তেমনি মেলে না বলেই যে একালেও অনাবিষ্কৃত থাকবে—তা উচিত হয় না। এই আলোচনার রশ্মি ধরে বলা যায়—নানা মাধ্যমে ধর্মতত্ত্ব বা মুক্ত মানব রসের স্বতঃস্ফূর্ত প্রেরণায় প্রাচীন ও মধ্যযুগে জীবন-জগতের যে অলঙ্করণরীতি ও শৈলী তা সংস্কৃত নন্দনতত্ত্বের আশ্রয়ী নয়। কিন্তু সহস্র বছর ধরে গড়ে ওঠা আমাদের শিল্প-সৌন্দর্য বিচাররীতির ক্ষেত্রে উনিশ শতক থেকে সংস্কৃত ও পাশ্চাত্য নন্দনতত্ত্বের প্রভাব হয়ে উঠে নিরঙ্কুশ। ক্রমে কুড়িশতকে পাশ্চাত্যপ্রভাব অপ্রতিরোধ্য বলেই স্বীকৃত ও চর্চিত হয়ে আসছে। এর ফলে সহস্রবছরের শিল্পকর্মের যে দেশজ ধারাবাহিকতা আমরা দেখি তার বিচারের ক্ষেত্রে একটি অনপনেয় সঙ্কটের সৃজন হল। সহস্র বছর ধরে যে সব রচনা আমাদের

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

জাতির চিত্তজয়ী বলে কালজয়ী হয়ে উঠেছিল—অ্যারিস্টটল, হোরেস, লনজাইনাসের নন্দনতত্ত্বের বিচারে সেগুলো অকিঞ্চিৎকর ঠেকে। আমাদের পালানাটকগুলো নাটকই নয়। লীলানাটক না কমেডি না ট্র্যাজেডি। গাজীর গান তো নাটক নয়, কাব্য। বিশাল মঙ্গলকাব্য আট দিবস ধরে যে পরিবেশিত হতো তা নিতান্ত পুচ্ছ পল্লবিত রচনা। আমাদের শিল্পরুচির ক্রমবিবর্তনের ইতিহাসে এই মধ্যখণ্ডন নাটকের কতদূর ক্ষতি করেছে সে বিচারের ভার ভবিষ্যতের হাতে ছেড়ে দিলেও মর্মের অন্তরে এক বিষমচ্ছেদের কষ্ট পাই।

আমাদের জাতির শিল্পবিচারে নন্দনতত্ত্ব স্বতন্ত্র কিন্তু সর্বভারতীয় শিল্পরীতি, ইরান, গান্ধার ও সংশ্লিষ্ট কালের নানান দেশ থেকে তো কোনও অর্থেই বিচ্ছিন্ন ছিল একথা বলা হয়নি। এ সত্ত্বেও আমাদের শিল্পকর্ম যে জাতীয় মানস ও অনুধ্যানের ধারাবাহিকতায় গড়ে উঠেছিল সেকথা অনস্বীকার্য। উপরন্তু আমি এ বিষয়েও সচেতন যে, আধুনিকালের শিল্পরুচি-রীতি ও নন্দনতত্ত্ব ক্রমেই দেশকালের অতীত বিশ্বমুখীনতার দিকে ক্রমপ্রসারী। কিন্তু আমাদের ক্ষেত্রে তা কি শুধু আত্মবিস্তৃত অনুকরণ বা অনুসরণ মাত্র নয়?

ইরানি রীতির শাস্ত্রকথনের সঙ্গে আমাদের দেশের শাস্ত্রকথনের একটা চমৎকার মিল দেখে আমি উচ্ছ্বসিত হয়েছি। পঞ্চদশ থেকে ষোড়শ শতাব্দির মিনিয়েচার পেইন্টিং-এ সেকালের ইরানীয় কথানাট্য রীতির পরিচয় পাওয়া যায়। চাকা নাটকের কথাপুচ্ছে এ বিষয়ে খানিকটা ইঙ্গিত দেয়া হয়েছে।

Dr. R. Gelpke কৃত নিযামীর হপ্তপয়করের ইংরেজি ভাষান্তর The story of seven princess গ্রন্থে সন্নিবেশিত মিনিয়েচারে কথানাট্য পরিবেশনের রীতিটা সুস্পষ্টভাবেই আমাদের হাস্তরকথনের সঙ্গে মিলে যায়। মিনিয়েচারগুলোর একটি The Indian princess in the black pavilion of Saturnus গল্পের দ্বিতীয় চিত্র Scene from the story of unfulfilled love-এ দেখা যায়, রাজা বাহরাম গোর রাজকীয় শয্যায় হেলান দিয়ে ভারতীয় রাজকন্যার গল্প শুনছেন। মঞ্চের বামে কথক, ডানে দু'জন বাদক। সম্ভবত তারা দোহারও।

The Greek princess in the yellow pavilion of the Sun নামাঙ্কিত ছবিতে দেখা যায়, কথক রাজকন্যার গল্প বলার সঙ্গে চারপাশে যুক্ত হয়েছে আঠার থেকে কুড়িজন দোহার দর্শক। The Chinese princess in the sandalwood-coloured pavilion of Jupiter ছবিটতে গল্পগীতের মঞ্চে দর্শক—ডানে তিনজন নারী নমনীয় ভঙ্গীতে দাঁড়ানো। রাজা সেদিকেই তাকানো। হয়তো বা এই নারীরা গল্পগীতের নানা অংশ অভিনয় করে দেখাত। অন্য চিত্র The Persian princess of the white pavilion of Vanus-এ সরাসরি রাজা ও রাজকন্যার সামনে নৃত্যপরা অভিনেত্রী এবং পরিবেশনস্থলের ডানে ও বামে বাদক-দোহার দেখা যায়। এই রীতিতে গায়েনকে দাঁড়িয়ে বা বসে গীতে-পদে গল্প বলতে দেখেছি চুটকি, বিষাদ জারী ও মাধব মালঞ্চ শ্রেণীর গীতিকা-নাটকে। বিষাদ ও চুটকি জারীতে গায়েন একপাশে দাঁড়িয়ে ছড়া বা গান বলে যান এবং নৃত্যপর দোহারগণ সে অনুযায়ী নানা ভাব ফুটিয়ে তোলেন। জারী আদ্যোপান্ত এক আশ্চর্য দেহছন্দের মিশ্রণে সৃষ্ট বর্ণনাত্মক নাট্যরীতি। কথানাট্যের ইরান-প্রসঙ্গ অবতারিত হল এই জন্য যে, যৈবতী কন্যার মন রচনাকালে নিযামীর গ্রন্থে নারীর গল্পকথন আমাকে খানিকটা অনুপ্রাণিত করেছে।

যৈবতীর কন্যার মন কথানাট্যর দুই খণ্ডে মৃতনারীর ফিরে আসা ও জীবনকাহিনী বলার মধ্যে সময়গত কৌশল প্রয়োগ করতে চেয়েছি। এই গল্পকথনে সময়ের ঐক্য এবং ভাঙন

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

রয়েছে। এর ফলে এই কথানাট্য মহাজাগতিক আবর্তনে সময়হীনতার একটি বোধ হয়তো বা দর্শকমনে তৈরি হতে পারে। অবশ্য তা না হলেও গল্পরস আস্বাদের জন্য বাধা হবে না।

বক্ষ্যমাণ নাটকে চাকার লম্বক ও তরঙ্গ বিভাজন রক্ষিত হয়নি। চাকার জন্য যা অনিবার্য ছিল, যৈবতী কন্যার মনে তার প্রয়োগ হয়ত-বা যান্ত্রিক ঠেকত। মুদ্রণের জটিলতা বিশেষত আমাদের পঠনরুচির কারণে অনেকটা বাধ্য হয়ে আবার দাঁড়ি-কমার বিলাতী নিয়মে প্রত্যাবর্তন করতে হল। তবু এবার অর্ধযতি হিসেবে শুধু কমা ও দাঁড়ি চিহ্ন ব্যবহৃত হয়েছে। সংলাপের প্রারম্ভে কোলন পরিত্যক্ত হয়েছে, তবে ড্যাশের ব্যবহার রেখেছি। আমি বিশ্বাস করি যে, বাংলা বাক্যরীতির স্বাভাবিক ধারায় অর্ধযতি ও পূর্ণযতির ব্যবহারই যথেষ্ট। চাকা ও যৈবতী কন্যার মনের ভাষা কমা, কোলন, সেমিকোলন কণ্টকিত হলে আমার বলা আর ভাষার বলা এক হয়ে উঠবে না—এই আশঙ্কা থেকে আমি বাক্যের নানাস্থলে দাঁড়ি-কমা, সেমিকোলন ব্যবহারের সর্বজনস্বীকৃত রীতি পরিত্যাগ করতে চেয়েছি।

আমার লেখা নাটকে বিশেষত কিত্তনখোলা থেকে হরগজ পর্যন্ত আমি সজ্ঞানে বাংলা নাটকের চিরাচরিত রুগ্নবাস্তবতার রীতি পরিহার করতে চেয়েছি। জীবন, জগৎ ও মানবিক বোধের যে সকল নতুন স্পর্শে বাংলা গান, কবিতা, উপন্যাস দুই শতবর্ষে ব্যাপ্তি ও বিস্তার লাভ করেছে, তার তুলনায় ক্লিশে সমাজচিন্তনের অতিগুরুভার বহন করতে গিয়ে বাংলা নাটক বহু ক্ষেত্রে শিল্পপথ বিচ্যুত হয়েছে। পাশ্চাত্যে প্রায় পরিত্যক্ত বিস্মৃত উনিশশতকীয় রিয়ালিজমের বাংলা নাটক বা উপন্যাস এখন যাকে বলে দোর্দণ্ড বা মধ্যাহ্নের মার্তণ্ড প্রতাপে বিদ্যমান।

কিত্তনখোলা, কেরামত মঙ্গল ও হাতহদাই—এই ত্রয়ী নাটকের অনুপ্রেরণার স্থল চিরায়ত এপিক ও ধর্ম-বিশেষত প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের জীবনচেতনা এমন কি আঙ্গিক পর্যন্ত যে সকল কাব্যে, এপিক বা মহাকাব্যে প্রায় এক শীর্ষবিন্দুতে মিশে গেছে। এপিক বা প্রাচ্য ধর্মদর্শন আমাকে ঐ ত্রয়ীতে অনুপ্রাণিত করেছে, একালের জীবনের সঙ্গে তাকে মিলিয়ে দেখার প্রেরণা দিয়েছে। আমার কাছে মনে হয়েছে, বৌদ্ধ জাতকের গল্প, ওভিদের মেটামরফসিস পাপ ও কর্মফলের শ্লাঘ্য শিল্প-লেখা, কোরান, ডিভাইন কমেডিয়া ও মহাভারতের নরক কল্পনা একালের সঙ্গে মেলানো যায়। আমার কাছে মনে হয়েছে, ওডিসি, ইনিড, সিন্দাবাদের সমুদ্রভ্রমণ কোথাও অদ্বৈতের টংকার দেয় অন্তরে। এই ত্রয়ী রচনা শেষে এও মনে হয়েছে বাস্তবতা আমার লক্ষ্য নয়, এমনকি বর্তমানও অবলম্বন মাত্র। আমি বরং কিত্তনখোলা, কেরামতমঙ্গল, হাতহদাই-এর মধ্যে চিরায়ত বাঙালি তথা প্রাচ্য মানবের আকার অঙ্কনে প্রয়াসী ছিলাম। এই নিয়মটাকে মহাকাব্যিক বা ধ্রুপদী বাস্তবতাবাদ যদি বলি হয়তো তা সমালোচকরা নাকচ করে দেবেন না। সে সঙ্গে আবারও স্মরণ করিয়ে দিতে চাই—আমি শিল্পে আঙ্গিক লোপের প্রেরণায় কাজ করি এবং নীরবলম্ব আঙ্গিক-বুদ্ধিতে শিল্পের নানা মাধ্যমে পৃথকীকরণের বিরোধী। শিল্পে আমি দ্বৈতের মধ্য দিয়ে অদ্বৈতে উপনীত হতে চাই। আমি জানি আঙ্গিকের বন্ধন শেষ পর্যন্ত পেরী-হাইপসুতে পৌঁছাতে পারে না। রীতি, ভাষা, অলঙ্করণ ও মাধ্যমকে অতিক্রম করে শিল্প যেখানে পৌঁছে যায় সেখানে হোমার, প্লেটো, এস্কিলুস, ডোমাস্থিনিস কিংবা কালিদাস, ফিরদৌসী, হাফিজ, রবীন্দ্রনাথ, গ্যেটে এক। আঙ্গিকের ভেতরেই আঙ্গিক বিনাশী শক্তি আছে। তাকে চিনতে গেলেই দেখা যায় সর্বত্র সে অবিনীত দৃঢ় মূর্তি। শিল্পের নিয়মে তার জন্ম অথচ সে শিল্পসংহারী। শিল্পী ও আঙ্গিকের মিলনে নয় বরং দ্বান্দ্বিকতায় শিল্পের সৃষ্টি।

চাকা বা যৈবতী কন্যার মনের ভাষা-শিল্পে দ্বৈতাদ্বৈতবাদীতায় উপনীত হবার যে ইচ্ছা

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

তার সহায়ক করে তুলতে চেয়েছি। এই ভাষা ঐতিহ্যবাহী লোককথার সরলরেখায় প্রসারিত হয়নি। এই ভাষা গায়েন বা কথকরীতির সঙ্গে চরিত্রের নিজস্ব মনোভঙ্গীর একটি সাঁকো তৈরি করতে চায়। কাব্য ও কথা যখন একত্রে আদি শিল্পীদের হোমাগ্নিতে জ্বলত, তখন তা গদ্য-পদ্যের ভেদ ছিল না। আমি তাই কথানাট্যের ভাষারীতিতে গদ্য ও পদ্যকে অভেদাত্মা করার প্রয়াসী। আমার ভাষা-চৈতন্যে গদ্য-পদ্যের ভেদ অবলুপ্ত। গদ্য যখন কাজের ভাষা তখন তা গদ্যই কিন্তু যখন তা লেখকের আঙ্গুলে চলে আসে তখন সে সৃষ্টিশীলতার ঘাট ছুঁয়ে আসে। হোক তা উপন্যাস বা ছোটগল্প। সৃষ্টিশীল শিল্পকর্মের বাহন হবামাত্র কি গদ্য থাকে? যা লেখকের সৃষ্টি তা গদ্য হয় কি করে? অবশ্য এ মত আমার নিজের। এবং আমার ভাষাবুদ্ধি আমার নিজের কাজের নিমেত্তে। অন্যের জন্য তা অনুকরণীয় সে কথা বলি না।

যৈবতী কন্যার মন কথানাট্যর প্রথম খণ্ডে অষ্টাদশ শতকে ধর্মকাব্যের সঙ্গে গীতিকাপালার দ্বন্দ্বের ছবি আঁকতে চেয়েছি। সেই শতকে মঙ্গলকাব্যধারা ক্ষীণ হয়ে এলেও তা লোক আচার-বিশ্বাসের নানান স্তরে বেঁচেছিল। গীতিকার মতো পূর্ণাঙ্গ মানবরসসিক্ত প্রবল ধারার কালে এদেশে পিরাদিপূজার প্রচলন হয়েছিল। কেন? কোন্ পশ্চাদমুখী টানে ক্ষয়িষ্ণু ধর্মতান্ত্রিকতা গীতিকার প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে উঠেছিল ইতিহাস সে সম্পর্কে নীরব। কালিন্দী ধর্মবিশ্বাসে থেকে বেরিয়ে এসেছিল প্রাণ ও প্রণয়ের টানে অথচ সেখানে অবিচল বিশ্বাস নিয়ে সে দাঁড়াতে পারল না।

দ্বিতীয় খণ্ডে প্রাকৃত জীবনের গন্ধমাখা এক নারী-পরী-শিল্পের ভেতর দিয়ে যে অহং তৈরি করল তা আত্মবিনাশী। শিল্প ও জীবনকে প্রায় এক বিন্দুতে মেলাতে চেয়েছিল সে।

কিন্তু দুই নারী এক নারীকল্প কেন? এ প্রশ্নের উত্তর আমার জানা নেই। হয়ত-বা এ রকম উত্তর দিতে পারি যে, এক নারী কিন্তু দুই ভিন্নকাল বিধায় দুনারী বলে ভ্রমের উৎপাদন হয়। অথবা নারীচিত্তের বিচিত্র ঐশ্বর্যের সৌন্দর্য আস্বাদের আবেগ জেগেছিল কবির।

যৈবতী কন্যার মনে তৃতীয় পুরুষ ও উত্তম পুরুষ মিশিয়ে দেয়া হয়েছে। মনে রাখতে হয়েছে অবিরল উত্তম পুরুষ বা তৃতীয় পুরুষে রচিত বচন দর্শক শ্রোতার কানকে ক্লিষ্ট করতে পারে। অবশ্য এই মিশ্রণ কোন আনুপাতিক হারে করা হয়নি।

যৈবতী কন্যার মন নামটি প্রয়াত ক্ষিতিশচন্দ্র মৌলিকের প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকার 'কাঞ্চন কন্যার পালা'র সূচনা অংশ থেকে গৃহীত হয়েছে। তবে সেখানে 'যইবতী' এইরূপ বানান আছে।

ক থা পু চ্ছ ০২

ক. ১৯৮১ সালের গ্রীষ্মকালে মানিকগঞ্জ জেলার হরগজ নামক স্থলে এক প্রলয়সদৃশ টর্নেডো হয়। সে টর্নেডোর ফলে তদঞ্চলে এক সমৃদ্ধ কৃষিজীবী জনপদের প্রায় সামগ্রিক বিনষ্টি ঘটে। উড়ন্ত ঘরের চাল টিন বৃক্ষ ছিন্ন শাখা মৃতপাখি-পশ্বাদি সহস্র হত আহত মানবের দেহ ও খণ্ডাংশ প্রভৃতি প্রাক্কালিক স্বাক্ষরে পরিপূর্ণ ছিল টর্নেডো-উত্তর সে স্থলের সমগ্র প্রান্তর।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

সকল প্রণাশী এই ঝড়ে সৃষ্ট ক্ষয়ক্ষতি সম্পর্কে প্রাপ্ত তথ্যনিবহ দৃষ্টে হতবিহ্বলতা জাগে। এ ছিল প্রায় আণবিক বিস্ফোরণকল্প ঝড়—দুই একটা দৃষ্টান্তে অন্তত তা মনে হতেও পারে। চাক্ষুষ দেখেছে যারা তাদের বর্ণনামতে হরগজের ঝড়ের যেন বা হাত পা চোখ বুদ্ধি এবং মস্তিষ্ক সবই ছিল।

একটা বিপুলকায় মহিষ উড়ে এসে আটকে ছিল এক আমগাছের উপর তিনদিন। প্রলয়ংকরী সেই ঝড়ে একটা পুষ্করণীর সমস্ত সঞ্চিত পানি ডাঙায় উঠে এসেছিল। কোন কোন গাছের শুঁড়িতে বিদ্ধ হয়েছিল মানবদেহের নানান খণ্ডিতাংশ। একটা ট্রাক নদীর এপার থেকে ওইপারে উড়ে গিয়ে পড়েছিল।

মনোয়ারা বেগম (২৫) নামে এক গৃহবধূর লাশ বাড়ি থেকে বহুদূরে গাছের ডালে মৃত ও ঝুলন্ত অবস্থায় পাওয়া যায়। লোকমান মোল্লা (৬৫) বেলগাছের শাখায় মৃত ও লম্বমান ছিল। পাহালী (৫০)—বাড়ি থেকে সিকি মাইল দূরে তার ছিন্ন ভিন্ন শরীর পাওয়া যায়। ছায়াদুর রহমান—সপ্তম শ্রেণীর ছাত্র—বিশালকায় কাঠ বিদ্ধ হয়ে নিহত হয়। কাদের মিয়া (৩৫) স্যালোমেশিন ঘরে কাজ করত—দূরে ধানক্ষেতে তার শরীর ছেঁড়াখোঁড়া অবস্থায় পাওয়া গিয়েছিল। ফিরোজা বেগম (৩৫)—পেট বরাবর উড়ন্ত টিন এসে আঘাত করে—ফলে সে দ্বিখণ্ডিত হয়ে যায়। রাবিয়া খাতুন (৪০)—উড়ন্ত ঢেউটিনের আঘাতে মাথা থেকে ধড় বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়।

দক্ষিণ বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলে আমার জন্ম—ঝড় জলোচ্ছ্বাসের ব্যাপকতা সম্পর্কে আবাল্য চাক্ষুষ অভিজ্ঞতা রয়েছে। আমাদের লোকালয়ে হ্যারিকেন ও টর্নেডো এক জীবন্ত সত্তা। তাদের দৈহিক আকার আকৃতি সম্পর্কে আমার পিতামহী মরহুমা আঞ্জুমান আরা ভয়ঙ্কর বর্ণনা উপস্থাপন করতেন। প্রচণ্ড অগ্রমেয় ঝড় চূড়ায় আরোহণের আগে অপদেবতার ক্রোধোপশমের নিমিত্তে বাড়ির উঠানে শিলপাটা এবং রসুন ছুঁড়ে দেয়া হতো। ঝড় নিবারণকৃত্যে আরও ছিল আযান। দিগ্‌পুর ঝড়ের হা হা বাতাসে আযান মানবিক সুরে করুণ করে তুলত আমাদের মন।

হরগজের ঝড়ের তৃতীয় কি চতুর্থ দিনের কোমল ও রাঙা সায়াহ্নে একাকী ভ্রমণরত আমার মনে এই রকম একটা দৃশ্যের উদয় হল যে সেই অঞ্চলে উদ্ধারপর্বে সর্বপ্রথম গিয়েছে এমন একটা ত্রাণের দলের সঙ্গে আমিও ছিলাম। যতই গন্তব্যের দিকে যাচ্ছি অবাক হতবাক হচ্ছি প্রকৃতি ও প্রাণিজগতের নানান স্তরে টর্নেডোর ছিঁড়েখুঁড়ে ফেলার অভূতপূর্ব চিহ্ন দেখে। মনে হল—যে আকৃতির জগৎ থেকে এখানে এলাম তাকে তো আমি চিনি না। যদিবা চিনি—মানতে তো পারি না। বৃক্ষমানব প্রাণিকুল খেচর ও ভূমিচারী—নানান স্তরে জন্মে বাড়ে। তারপর ক্রুদ্ধ এক হাওয়া এসে তাকে ছিন্ন ভিন্ন করে দেয়।

এ নাটকে অবরুদ্ধ জগৎ থেকে আবিদ শেষ অবধি যেখানে এসে দাঁড়ায় তা ভাঙনের নিখিল-নদীর স্রোতের কূল—ইছামতি। এ কিন্তু রূপ থেকে অরূপের জগতে আসা নয়। এ হচ্ছে আকৃতির জগৎ থেকে নিরাকৃত বিশ্বে অভিপ্রয়াণ।

খ. বর্ণনাত্মক অভিনয়রীতি পাশ্চাত্যের স্বীকৃত রীতি পদ্ধতি ও কৌশল থেকে ভিন্ন। পাশ্চাত্যের অভিনয় প্রাচীনকাল থেকে অনুকরণতত্ত্বের আশ্রয়ে গড়ে উঠেছে অনুকরণাত্মক অভিনয় হচ্ছে ঘটনা কাহিনী ও চরিত্রে বস্তুজগতের ক্রিয়া ও দৃশ্যমূল্যের এমনতর আরোপ যা দর্শকের সর্বোচ্চ বিশ্বাসযোগ্যতা অর্জনে সক্ষম। এজন্য এ রীতিতে আহার্য বচন চরিত্র

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

সর্বত্র বাস্তব জগতের প্রতিভঙ্গীকরণ প্রত্যক্ষ করা যায়।

পক্ষান্তরে বর্ণনাত্মক অভিনয় হচ্ছে বর্ণনার মাধ্যমে চরিত্র ঘটনা ও কাহিনীর উপস্থাপনা। এর দার্শনিক অভিপ্রায় হচ্ছে ব্যাখ্যা-প্রতিভঙ্গী সৃষ্টি করা নয়। এর বাহ্যিক অবলম্বন তাই অভিনয় নয়—বর্ণনা।

বর্ণনার অর্থ বিবরণ। বিবরণ অভিনয়ের অঙ্গে মক্ষিত ও লিপ্ত থাকে বলেই একে বলা যায় বর্ণনাত্মক অভিনয়। আধুনিক অর্থে বাস্তবতা এ রীতির লক্ষ্য নয় বরং বর্ণনাকে শিল্পিত করার প্রয়াসই বর্ণনাত্মক অভিনয়ের প্রধান লক্ষ্য। শিল্পিত করার নিমিত্ত তাই গায়েন এ রীতিতে আশ্রয় নেয় নৃত্য সুর তাল ছন্দের।

পাশ্চাত্য ও প্রাচ্যের অভিনয় একেবারে বিপরীতমুখী। বাস্তবের অনুকরণের ক্রিয়া-কাহিনীকে সেখানে পাওয়া যাবে চরিত্রের ক্রিয়ার ধারাবাহিকতা হিসাবে। পক্ষান্তরে প্রাচ্যের অভিনয় হচ্ছে বর্ণনাকে ক্রিয়াতে রূপান্তর। অর্থাৎ, বর্ণনাত্মক অভিনয়ের যে সকল রীতিতে কথক বা গায়েন আছে—তার কাজ বর্ণনাকে এমন একটা চলমানতা দান করা যা অনুকরণসঞ্জাত ক্রিয়া নয়—যা সুর ও ছন্দের অবলম্বনে ব্যাখ্যাধর্মী।

সেক্ষেত্রে বর্ণনাত্মক অভিনয়ে চরিত্র বা ঘটনা দোহার-গায়েনের বর্ণনা থেকে স্বতন্ত্র কিছু নয়। গায়েন চরিত্রকে এমন মাত্রায় স্বাতন্ত্র্য দেন যা বর্ণনার সুরকে ছিন্ন করে না অথচ তাকে করে তোলে কৌতূহলোদ্দীপক। এ অভিনয় রীতিতে নানান চরিত্রের ক্রিয়া ও বক্তব্য গায়েন কাহিনী কথনের অনুষঙ্গেই বর্ণনা করেন।

ভাষারীতিতে বলার নানান ধরন আছে। বিবরণের সুরে চরিত্রের সংলাপে উপনীত হতে বর্ণনাত্মক রীতিতে বিবরণের প্রবাহ থেকে কথক বিচ্ছিন্ন হন না। এমনকি প্রত্যক্ষ সংলাপকেও গায়েন নিষ্ক্রিয় সংলাপে রূপান্তরিত করতে পারেন। ফলে তার বর্ণনায় তিন ধরনের কৌশল থাকে—বিশুদ্ধ বর্ণনা-সংলাপকে নিষ্ক্রিয় করে বলা এবং সরাসরি বিদিত পন্থায় সংলাপের প্রয়োগ। কিন্তু যদি গায়েনের মুখে পুরা কাহিনীটাকেই একটা সংলাপ হিসাবে বিবেচনা করি—তাতে বর্ণনা—সক্রিয় ও নিষ্ক্রিয় সংলাপের ব্যবহার—সংগীত প্রভৃতি নানান স্তর মিশ্র ও অবিমিশ্র রূপে দেখতে পাই।

বর্ণনাত্মক অভিনয়ের নানান ভেদ আছে। কতক অভিনয়ে (১) গায়েন বিশুদ্ধ বর্ণনাত্মক রীতির আশ্রয় নেন (২) কতক অভিনয়ে গায়েন কাহিনীর অন্তর্গত চরিত্রগুলোকে নানা ভঙ্গিতে ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করেন। আবার (৩) দোহার সহযোগে সরাসরি চরিত্রাভিনয়ের রীতিও রয়েছে লীলাযাত্রা জারী প্রভৃতি শ্রেণীর নাটকে। এ ছাড়া আছে আধুনিককালে যাত্রার শুদ্ধ চরিত্রাভিনয় রীতি।

শুদ্ধ বর্ণনাত্মক অভিনয় রীতির নমুনা এখনও গাজীরগান, হাস্তরগান প্রভৃতি শ্রেণীর কৃত্যনাট্য ও লোকনাট্য রয়েছে।

এই ৯১ সালে কোন এক শীতের রাতে জামশা গাঁয়ের মরহুম হাকিম আলীর পুত্র চানমিয়ার অভিনয় দেখতে-দেখতে মনে হয়েছে—বস্তুজগতের ঘটনা বা ক্রিয়ার প্রতিভঙ্গীকরণের তাগিদ কেন এ ধরনের বিশুদ্ধবর্ণনাত্মক অভিনয় রীতিতে নাই। আবার হাস্তরগানে বসে বসেও অভিনয় হয়—গীতিকাপালা বহু অঞ্চলে ঐ একই রকম বৈঠকী রীতিতে অভিনীত হয়। এই বৈঠকী রীতিতে চরিত্রাভিনয় কিংবা বাস্তব ক্রিয়াশীল দৃশ্য রচনা তো প্রায় অসম্ভব।

গাজীর গানের একটা অংশে যেখানে লৌকিক ও পৌরাণিক পাখির অজস্র নাম বিবৃত হয়—গায়েন গানের সুরে ললিত ভঙ্গিতে কোমরে দুই হাত ন্যস্ত করে মাত্র তার নৃত্যপরতা

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

দেখান। পাখিদের আকার আকৃতি বা ওড়াউড়ির অনকৃত দৃশ্যের পরিবর্তে আমরা গায়েনের অভিনয়ে পাই পাখিদের নামে বাঁধা নাচের ছন্দ--সুবর্ণিল নানা পাখির নাম ছন্দে তালে সুরে অনুধাবনের আনন্দ। জারী গানের যে ধারায় কারবালার শোকাবহ কাহিনী বিবৃত হয়--সেখানেও দেখি আবৃত্তি ও সঙ্গীত নির্ভর কাহিনীতে যৌথ নৃত্যের বিচিত্র বিভঙ্গ। মূল ঘটনা বেদনার অনুকৃতির সাক্ষাৎ সেখানে প্রায় মেলেই না অথচ তা দৃশ্যনন্দন ও রসসঞ্চারী।

কেন এমন হয়। উত্তরে বলা যায় যে বর্ণনাত্মক রীতির অভিনয়ে গায়েন যা দেখান তা আসলে এক ধরনের ব্যাখ্যা মাত্র। তার কাজ কাহিনীর বস্তুগত দিকটাকে অনুকরণ করা নয় বরং কাহিনীর অন্তর্গত গতি ও আবেগ দর্শকের মনে ধরিয়ে দেয়া। দর্শকের কল্পনাশক্তি বস্তু বা ঘটনার সম্ভাব্য রূপ আপনাতেই খুঁজে নেয়—বর্ণনাত্মক অভিনেতার কাজ হচ্ছে অন্তর্গত সুরটি তৈরি করে দর্শকের চোখ কান মনে ধরিয়ে দেয়া। বস্তু নয় বস্তুর আবেগটাকে সঞ্চারিত করাটাই যদি শিল্পের অভীষ্ট হয় তবে বর্ণনাত্মক অভিনয়ও তাই করে। এর সঙ্গে পাশ্চাত্যের একটি শিল্পরীতির অন্তত দর্শনগত মিল আছে তা হচ্ছে ব্যালে। ব্যালেতে অনুকরণাত্মক অভিনয়ের স্থান নেই—একটা কাহিনীর গতি ও মূর্ছনা সেখানে সুরে নৃত্যে ফুটিয়ে তোলা হয়।

আরেক ধরনের বর্ণনাত্মক অভিনয় আছে যা চরিত্রাভিনয় নয় অথচ গায়েন চরিত্র বা ঘটনা বর্ণনার ক্ষেত্রে ন্যূনতম অনুকৃতির আশ্রয় নিয়ে থাকেন। সেখানে হস্তবাহিত সম্ভার ও আহার্যের খানিক ব্যবস্থা আছে। এ ব্যবস্থাটা খুব পুরানা কালের নয়। এর উদ্ভবের পেছনে খানিক কালের ও খানিক ব্যক্তি প্রতিভার অবদান আছে। নেত্রকোণার কেন্দুয়া অঞ্চলের প্রখ্যাত অভিনেতা কুদ্দুস বয়াতী মনসুর বয়াতীর শিষ্য। মনসুর বয়াতী দুইপাশে দুটা বালিশ দিয়ে বৈঠকী রীতিতে গীতিকা পালা পরিবেশন করতেন। ৮৯ সালে ৯১ বছর বয়সে তিনি প্রয়াত হন। তিনি কাহিনী বলতেন হাত চোখ এবং বালিশের ব্যবহার করে পুরাটাই বসে বসে। কিন্তু তার প্রত্যক্ষ শিষ্য কুদ্দুস বয়াতী দাঁড় রীতিতে অভিনয় করেন। কুদ্দুস হস্তবাহিত দ্রব্যসম্ভার ব্যবহার করেন এবং চরিত্র ভেদে তদ্রূপ অভিনয়ও করে থাকেন।

আলমেস নামক বাগদাদী গল্পে তিনি নারী-পুরুষ-রাজা-উজির-গণক-ছদ্মবেশী-ফেরেশতা প্রভৃতি নানা চরিত্রের অনুকরণে অভিনয় করেন। নারীচরিত্রের হাবভাব প্রকাশের জন্য লুঙ্গী ফতুয়া পরা অবস্থায় কোমর থেকে উর্ধ্বাংশে রঙিন শাড়ি জড়িয়ে নেন। কুদ্দুস বয়াতীর সাক্ষ্যমত—তিনি নিজে এর উদ্ভাবক। কথাটা পুরা সত্য না হলেও বর্ণনাত্মক অভিনয়কে একালে দর্শকের কাছে অধিকতর গ্রহণযোগ্য করে তোলার জন্য গায়েনের ব্যক্তিগত একটা সৃষ্টিশীল ভূমিকা যে এর নেপথ্যে রয়েছে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। অবশ্য বর্ণনার ভিতরে অঞ্চলভেদে এমনকি গাজীর গানেও গায়েন দোহার-সহযোগে নানা চরিত্রে ভূমিকায় রূপদান করে থাকেন।

এ ধরনের চরিত্রানুগ অভিনয়ের প্রয়াসে চরিত্রগুলার আশ্রয় শুধু দোহার ও গায়েন বলে—শেষ পর্যন্ত সেগুলা বর্ণনারই অংশ হয়ে ওঠে। অন্যদিকে নানা চরিত্রের হাব ও ভাব দেখাতে গিয়ে গায়েন চরিত্র সৃষ্টি করেও শেষ পর্যন্ত চরিত্র নিরপেক্ষ অবস্থানে থেকে যান। বর্ণনাত্মক অভিনয়ের তৃতীয় ধারা হচ্ছে দেশজ রীতির চরিত্রাভিনয়। ঘাটু বা লিটো প্রভৃতি নাট্যরীতি দ্বি-চরিত্র বিশিষ্ট এবং তা চরিত্রাভিনয় নয় এইজন্যে যে সেখানে চরিত্রের ধাচটা ঐতিহ্য থেকে গৃহীত। অন্যদিকে এই দুই নাট্যরীতির বিষয় হচ্ছে কৃষ্ণপ্রেম বা অনুরূপ প্রেমকথা যা নৃত্যে ও সঙ্গীতে দোহার সহযোগে পরিবেশিত হয়। এখানে চরিত্র আত্মপ্রবুদ্ধ নয় লোকরুচির প্রেক্ষাপটে বাঁধা এবং এর তাল সুর লয় [illegible] দেয়া আছে। এ ধরনের

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

চরিত্রের কাজ মূলত কাহিনীর রূপদান করা নয়, কাহিনীর অন্তর্গত রস নৃত্যে সঙ্গীতে ফুটিয়ে তোলা। লীলা বা যাত্রা শ্রেণীর নাটকে চরিত্রাভিনয় রীতি অষ্টাদশ শতকের পূর্বে ছিল এমত প্রমাণ পাওয়া যায় না। এসব নাটকে আজও দোহার রীতি বিদ্যমান। একটা চরিত্রের মনোভাব গানে বা নৃত্যে রূপদান করাকে কোনোক্রমেই চরিত্রাভিনয় বলা যায় না, যদি তা চরিত্রের নিজস্ব পন্থায় না এসে লোকরীতির আশ্রয়ে রচিত হয়। তা ছাড়া লীলানাটকে রাধা বা কৃষ্ণের মুখের অর্ধসমাপ্ত গানের চরণ যখন পাছ দোহারের মুখে চলে যায় তখন তাকে কোন অর্থে চরিত্রাভিনয় বলা যাবে তা আমার বোধগম্য নয়। আসলে লীলা যাত্রা যখন একালে চরিত্রাভিনয়ের পায়ে দাঁড়ায় তখনও তা আমাদের সমৃদ্ধ বর্ণনাত্মক রীতির প্রভাবের বৃত্তেই থেকে যায়।

গ. বর্ণনাত্মক অভিনয়ের আয়োজন যেন সে রীতির আহার্যাভিনয়ের সুরে বাঁধা। এ রীতিতে গায়েন বা কথকের রূপজ্জা চরিত্র নিরপেক্ষ—তা কোনও বিশেষ পরিস্থিতি ঘটনা বা চরিত্রের রূপসজ্জা নয় বরং সমগ্র বিষয়ের জন্যে বিশেষ ধরনের আহার্য। কিন্তু তার আহার্য বিষয় নিরপেক্ষ নয়। যদিও গৃহাঙ্গনে পরিবেশিত নাটকে কথক নির্ভেজাল দৈনন্দিন পোশাকেই রূপকথা বা পৌরাণিক গল্প পরিবেশন করে থাকেন।

কথানাট্য বা অন্যবিধ শুদ্ধ বর্ণনাত্মক নাটকে গায়েন স্বীয় পরিচয়কে আড়াল করেন না বরং পোশাকে বসনে নানাবিধ আয়োজনে তিনি নিজের ব্যক্তিত্বকে পরিশোভিত করেন। তিনি হাকিম আলী গায়েন—গাজীর গানের সেরা গায়ক—আজ অভিনয় করবেন জামাল কামালের পালা অথবা তিনি তালুকনগরের সাত্তার গায়েন—তাকে দেখা মাত্র পরা উজ্জ্বল গোলাপি বরণ শাড়ি। চরিত্র নিরপেক্ষ আহার্য না হলে কথক বা গায়েন রীতির অভিনয় সম্ভব নয়।

আধুনিককালে সচেতনভাবে সম্ভবত ঢাকা থিয়েটার বর্ণনাত্মক নাট্যআঙ্গিক ও এই আঙ্গিকাশ্রয়ী বর্ণনাত্মক অভিনয়রীতিকে চরিত্রাভিনয়ের আবরণে মঞ্চে প্রয়োগ করার উদ্যোগ নেয়। কিত্তনখোলা, কেরামতমঙ্গল এবং হাতহদাইতে ঢাকা থিয়েটারের এই প্রয়াস লক্ষ করা যায়। বর্ণনাত্মক নাট্যআঙ্গিকই বর্ণনাত্মক অভিনয়ের প্রধান উৎস।

প্রায় একযুগ ধরে ঢাকা থিয়েটার বর্ণনাত্মক নাট্যআঙ্গিক ও অভিনয় বিষয়ে যা করেছে বা বলে আসছে তার সঙ্গে এদেশের লোকনাটকের অভিনয়ের রীতিকে মিলিয়ে শুধুমাত্র পাশ্চাত্যমুখী নয় এমন একটা প্রাকৃত—দেশজ অথচ সমকালীন এবং আধুনিক অভিনয় রীতির সূত্র-সংজ্ঞা তৈরি করা যেতে পারে। সেই সূত্র এবং সংজ্ঞার ভিত্তিতে অভিনয় প্রশিক্ষণের উদ্যোগ নিলে তা যে নিষ্ফল হবে না সে বিষয়ে আমরা দৃঢ় বিশ্বাস পোষণ করি। বর্তমানে ঢাকা থিয়েটারের সহযোগিতায় জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের নাটক ও নাট্যতত্ত্ব বিভাগ বর্ণনাত্মক অভিনয়রীতির সূত্রবদ্ধ অনশীলন বিষয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষায় ব্যাপৃত রয়েছে।

সেলিম আল দীন : বাংলাদেশের অন্যতম প্রধান নাট্যকার। প্রতিষ্ঠাতা-অধ্যাপক, নাটক ও নাট্যতত্ত্ব বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

নাটক লিখতে হলে

লিয়াকত আলী লাকী

নাটক করতে হলে নাট্যকারের প্রয়োজন আছে বলে কোন কোন নাট্য-নির্দেশক মনে করেন না। শুধুমাত্র একটি গল্পের জন্য নাট্যকারের প্রয়োজন হয় না। গল্প জীবন থেকে নেয়া যায়। ছোট্ট একটি কাহিনীর বিস্তার ঘটনো যায় অথবা গল্পকারের গল্পকারের গল্প থেকে নাটক তৈরি করতে পারেন নির্দেশক। নাট্যকারের প্রয়োজনীয়তাটা নাট্যকারকেই সৃষ্টি করতে হবে। যুগে যুগে তাই হয়ে এসেছে।

নাট্যকার নাটক লেখেন, নির্দেশক সে নাটক মঞ্চে উপস্থাপন করেন। কবির কবিতার ব্যাখ্যাসহ কণ্ঠে তার প্রকাশ ঘটান আবৃত্তিকার। নাট্যকার সাধারণত জানেন তার নাটকটি কীভাবে মঞ্চস্থ হতে পারে। শেক্সপিয়ার, মলিয়ের, রবীন্দ্রনাথ নিজেরাই নিজেদের নাটক উপস্থাপন করেছেন। এরকম আরো অনেক নাট্যকার আছেন। নাটকের সার্থকতা মঞ্চে অভিনীত হওয়ার মধ্যে। শুধুমাত্র সাহিত্য হিসেবে লাইব্রেরিতে সাজিয়ে রাখার মধ্যে নাটকের সাফল্য নির্ভর করে না। নাটক শিল্পসমূহের মধ্যে সবচেয়ে আধুনিক। কারণ নাটক এই মুহূর্তের। সামনে ৩০০, ৫০০, ১০০০ দর্শক। কিন্তু নাটক 'ওয়ান টাইম ইকোনো' নয়। তাকে বাঁচার চেষ্টা করতে হবে বছরের পর বছর যেমন বেঁচে আছে 'ইডিপাস', 'হ্যামলেট', 'বুর্জোয়া জেন্টল্‌ম্যান' বা 'রক্তকবরী'। নির্দেশক নাটকের গল্পটিকে ভালোবাসতে চান। গল্পটি বলতে চান বিভিন্ন নাট্য-মুহূর্ত তৈরি করে। তাকে সচেতন থাকতে হয় যাতে সেটা 'ডেডলী থিয়েটার' না হয়ে যায়। এ কাজটি করতে গিয়ে তাকে সামগ্রিক ডিজাইন করতে হয়। সেট, লাইট, মিউজিক, কসটিউম, প্রপস ইত্যাদির সঙ্গে উপস্থাপন রীতির সামঞ্জস্যপূর্ণ পরিকল্পনা তাকে গ্রহণ করতে হয়। এক্ষেত্রে ডিজাইনারদের সহায়তা তিনি নিতে পারেন। সেতার ও সরোদ বাদনে সকল তার সমূহ নির্দিষ্ট স্কেলে নির্দিষ্ট রাগ প্রকাশে বাদী সম্বাদী স্বর এঁটে আরোহণ-অবরোহণে সুরের মূর্ছনা তৈরি করতে হয়। এর ব্যত্যয় ঘটলে সেই নির্দিষ্ট রাগের বিকাশ ঘটবে না। নাটকের সকল প্রয়োগ-তারগুলো অর্থাৎ সেট, লাইট, মিউজিক, কসটিউম, প্রপস ইত্যাদি উপস্থাপন রীতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া দরকার—এ বিষয়টি চিন্তায় রাখতে হবে।

নাট্যকারকে তার ঐতিহ্য, নাটকের অতীত, নাটক উপস্থাপন করার ক্ষেত্রে যে রীতিসমূহ ইতোমধ্যে বিশ্বের নাট্যধারায় যুক্ত হয়েছে সেটা জেনে নিতে হবে বৈকি। নাটকের জন্মকাহিনীসহ গ্রিক ক্লাসিক নাটক সমূহের রচনাশৈলী নাটকের সংগে যুক্ত সকলকে আলোড়িত করে। অ্যারিস্টটলের পোয়েটিকস্ ও তার তিনটি ঐক্য সময় (Time), স্থান (Place), ও ঘটনা প্রবাহের (Action) ঐক্যের ধারণা আমাদের সকল সময়েই নাট্য নির্মাণে সাহায্য করেছে। শেক্সপিয়ার নতুন ধারণায় গিয়ে প্লট সাবপ্লট তৈরি

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

করেছেন। তারপরও ক্লাসিক ঐক্য রক্ষা করে নাটক লিখে তার বহুমুখী শক্তিমত্তা প্রকাশ করেছেন। ব্রেশটের থিয়েটার, মলিয়ের এর নাটকের গতি ও চলা, আয়োনেস্কোদের এ্যাবসার্ড থিয়েটার, গ্রটস্কীয় শারীরিক অভিনয় ধারণা আমাদের নতুন নাটক নির্মাণে সামনের দিকে এগিয়ে দিয়েছে। পিটার ব্রুকের 'এ্যাম্পটি স্পেস' নাট্য চিন্তায় যে বিপ্লব এনেছে তা প্রণিধানযোগ্য। নাটক নিয়ে বিশ্বব্যাপী যে নিরীক্ষা হয়, কিভাবে একটি নাটক রূপান্তরিত হয়ে যায় সেকাজগুলো আমাদের ভাবতে সাহায্য করতে পারে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর নাটকে দৃশ্যপটের বর্ণনা দেননি—কারণ, যিনি তাঁর নাটক নির্দেশনা দেবেন তাঁর কল্পনাশক্তির উপর তাঁর অগাধ বিশ্বাস। শুধু কাহিনীবিন্যাস, চরিত্রসৃষ্টি ও সংলাপ রচনা শৈলীর মধ্যে নাট্যকার গণ্ডীবদ্ধ থাকলেই হবে না। নাটকটি সর্বকালের ও সার্বজনীন কীভাবে হতে পারে সে ভাবনাটা থাকা দরকার।

লিয়াকত আলী লাকী : সেক্রেটারি জেনারেল, বাংলাদেশ গ্রুপ থিয়েটার ফেডারেশন, অভিনেতা ও নাট্য-নির্দেশক।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও